বিচিত্র সংলাপ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

নর্দার্ন বুক ক্লাব
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬৫

প্রকাশক :
সি. এল. দাস
নর্দার্ন বুক ক্লাব
৬৭বি, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৫

মুদ্রাকর :
সুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট :
বিশ্বনাথ মিত্র

প্রাপ্তিস্থান :
পুস্তক
৮।১বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

শ্রীঅমল হোম

প্রীতিভাজনেষু

ভূমিকা

রচনাগুলি কোন্ শ্রেণীর? গল্প নয়, প্রবন্ধ নয়, কথোপকথনের আকারে লিখিত হইলেও নাটক নয়। অন্য নামের অভাবে রম্যরচনা। সে নাম কারো পছন্দ না হইলে বলি নামে কি প্রয়োজন, বস্তুটা দেখিলেই চলিবে। এগুলি আর কিছুই নয়—আইডিয়া বা ভাবের বাহন।

নানা ধরণের রচনা আছে, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও আধুনিক। অনেক স্থানেই ঐতিহ্যের চিহ্নিত ধারাকে অনুসরণ করি নাই, ক্ষতি হইয়াছে মনে করি না। নানা সাময়িক পত্রে এগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে পুস্তকাকারে গ্রথিত হইল।

১২. ৬. ৫৮ **গ্রন্থকার**

সূচীপত্র

ঊষা ও পূষণ

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে উষা ও পূষণকে (সূর্য) চিরন্তন প্রণয়ীযুগল কল্পনা করা হইয়াছে। আর সেই কল্পনার ভিত্তিতে অনেক মনোরম কাহিনী রচিত হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান সংলাপটিতে সেই কল্পনার ধারাকে অনুসরণ করা হইয়াছে।

পূষণ ॥ উষা, দাঁড়াও, দাঁড়াও। এমন ক'রে অবিশ্রান্ত ছুটে চলেছ কেন?

উষা ॥ পূষণ আমি ভীত।

পূষণ ॥ ভীত! কার ভয়?

উষা ॥ নিজের।

পূষণ ॥ নিজের? বুঝিয়ে বলো।

উষা ॥ আমার নিজেকে ভয়, তাই পালাবার চেষ্টা করছি নিজের কাছ থেকে।

পূষণ ॥ তার উপায় কি এই?

উষা ॥ আর কোন উপায় জানিনে। শিশু অন্ধকারে ভয় পেলে চোখ বুঁজে ঘনতর অন্ধকার সৃষ্টি করে। শিশুও নিরুপায়, আমিও নিরুপায়।

পূষণ ॥ বুঝলাম মনে হয় না, তবু ধ'রে নিচ্ছি নিজেকে তোমার ভয়। এবার বলো ভয়টা কিসের?

উষা ॥ বুঝবে তুমি?

পূষণ ॥ দাও বুঝিয়ে।

উষা ॥ আমি বিগতশ্রী হ'তে চাই না।

পূষণ ॥ কে চায়?

উষা ॥ চায় না কেউ তবু চাওয়ার পথেই চলে।

পূষণ ॥ উষা তোমার বাক্যও তোমার মতো আলো-আঁধারি, দেখতে পাই, পারিনে বুঝতে।

উষা ॥ পূষণদেব তুমি সর্বতোভাস্বর, তুমি অখণ্ডজ্যোতি, কেমন করে বুঝবে তুমি আলো-আঁধারির রহস্য।

পূষণ ॥ সেই জন্যই তো তোমাকে চাই কাছে, তোমাকে চাই বাহুবন্ধনে, ঐ একটুখানি আলো-আঁধারির রহস্যের জন্য নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছে আমার হৃদয়। উষা তোমাকে আমি ভালবাসি।

উষা ॥ তা কি আমি জানিনে?

পূষণ ॥ জানো?

উষা ॥ কোন্ নারী না জানে! পুরুষ নিজে সচেতন হওয়ার আগে জানতে পারে নারী। ঝড়ের হাওয়া এসে পৌছবার আগে বসুন্ধরার কাছে তার বার্তা বহন ক'রে আনে উত্তাল তরঙ্গ।

পূষণ ॥ তবে?

উষা ॥ ভয় তো সেই জন্যেই।

পূষণ ॥ ভালবাসি ব'লে?

উষা ॥ হাঁ।

পূষণ ॥ উষা তুমি একাধারে সুন্দর ও কঠিন।

উষা ॥ কঠিন না হলে কি হীরক সুন্দর হ'তো?

পূষণ ॥ কেন, পদ্মের উপমা কি মনে এলো না?

উষা ॥ মৃণালে কি কণ্টক নেই?

পূষণ ॥ চন্দ্র?

উষা ॥ চন্দ্রে আছে রাহু।

পূষণ ॥ তবে রমণীর রূপ?

উষা ॥ রমণীর রূপে আছে বার্ধক্য।

পূষণ ॥ যার আছে তার আছে। তোমাতে নেই বার্ধক্যের আভাস, তোমাকে দেখছি অনন্তকাল।

উষা ॥ কেন নেই ভেবে দেখেছ?

পূষণ ॥ ভাববার সময় পাইনি, আমি মুগ্ধ।

উষা ॥ নারী স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেয় রূপ।

পূষণ ॥ স্বেচ্ছায়? এমন অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকার করে কোন মূল্যে?

উষা ॥ প্রেমের বদলে ত্যাগ করে রূপ।

পূষণ ॥ প্রেমের বদলে। কেন? এ দুই কি একত্রে সম্ভব নয়?

উষা ॥ না। প্রেম এলে রূপ যায়, বসন্তে গলে স্তম্ভিত তুষার।

পূষণ ॥ কেন, রূপ আর প্রেম তো একসঙ্গে দেখেছি অন্য নারীর মুখে।

উষা ॥ পূষণ, তুমি না আমাকে ভালোবাসো? তবে তুমি অন্য নারীর মুখাপেক্ষী কেন?

পূষণ ॥ ভুল বুঝো না উষা, আমি বিশ্বচক্ষু, সব কিছু আমাকে দেখতে হয়।

উষা ॥ ভালো। তবে এবার তোমার কথার উত্তর দিই। রূপ আর প্রেম একত্র দেখেছ, এই তো? বসন্তের প্রথম সূর্যকিরণ পড়তে দেখছ নিষ্কলঙ্ক তুষার শিখরীতে। ঐটুকুমাত্র দেখেছ, দেখনি প্রতিক্রিয়া, যখন গলিত-নীহার শিখরিণীর বেরিয়ে পড়েছে অস্থিপঞ্জর।

পূষণ ॥ আমি যে বিশ্বচক্ষু, দেখেছি বই কি! নেত্রাভিরাম নয় সে দৃশ্য।

উষা ॥ বিগতযৌবন নারীর মুখও তো নয় নেত্রাভিরাম।

পূষণ ॥ তবু তো সংসার তাকে বহন করে।

উষা ॥ ধরিত্রী কি বহন করে না প্রকটপঞ্জর শিখরিণীকে?

পূষণ ॥ অবশ্যই করে।

উষা ॥ কেন করে ভেবে দেখেছ?

পূষণ ॥ শিখরিণী যে আপনাকে বিগলিত ক'রে ঢেলে দিচ্ছে জীবন প্রবাহ।

উষা ॥ বিগতযৌবন নারীও কি করছে না তাই?

পূষণ ॥ তুমি তবে এমন ব্যতিক্রম সেজে রইলে কেন?

উষা ॥ তবে শোনো পূষণ, যৌবনশ্রীর অবক্ষয় আমি চাইনে।

পূষণ ॥ তার বদলে পাবে প্রেম।

উষা ॥ প্রেম তুষারখণ্ড, আঁচলে বেঁধে রাখলে গলে যায়।

পূষণ ॥ তাতে কি নারীর মনে নৈরাশ্য জাগে না?

উষা ॥ জানলে তো নৈরাশ্য জাগবে?

পূষণ ॥ জানে না? সে কেমন?

উষা ॥ আঁচলে বাঁধা আছে বলে নিশ্চিন্ত থাকে, ফিরেও তাকায় না।

পূষণ ॥ তবে কিসে পায় সান্ত্বনা?

উষা ॥ জরা, জড়তা আর অভ্যাস। যৌবনশ্রী আর প্রেমে খাদ্যখাদক সম্বন্ধ—এক পিঞ্জরে তাদের স্থান নয়।

পূষণ ॥ তাই তুমি একটিকে অস্বীকার ক'রে অপরটিকে রক্ষা করতে চাও।

উষা ॥ আলাদা খাঁচায় পুরে দুটিকেই রক্ষা করতে চাই।

পূষণ ॥ এরকম সঙ্কল্প জগতে আর তো দেখি না।

উষা ॥ জগতে উষা এক বই নয়।

পূষণ ॥ তবে কি এই ভাবেই চলবে—তুমি দেবে না ধরা, আমি ছুটবো পিছনে।

উষা ॥ এ আনন্দের কি শেষ আছে ?

পূষণ ॥ একে বলো আনন্দ ?

উষা ॥ নয় ? যৌবনশ্রী থাকবে অবিগলিত, প্রেম থাকবে অচপল। পূষণদেব, যৌবন গলিষ্ণু তার গায়ে প্রেমের তাপ লাগিও না। পূষণদেব প্রেম স্বভাবচঞ্চল তাকে বাঁধতে চেষ্টা করো না। পূষণদেব তুষারকে স্তম্ভিত থাকতে দাও, নদীকে প্রবাহিত হতে দাও। এতে সুখ নাই কিন্তু আনন্দ আছে।

পূষণ ॥ সুখ নাই, আনন্দ আছে !

উষা ॥ সুখ ঘড়ায় তোলা জল, ব্যবহারে ফুরিয়ে যায়, দিন শেষে কলুষিত হয়। আনন্দ সমুদ্র, না ফুরোয়, না মলিন হয়।

পূষণ ॥ সমুদ্র লবণাম্বু।

উষা ॥ আবার রত্নাকরও—আনন্দ এমন ব্যাপক যে তাতে সুখ দুঃখ দুয়েরই স্থান আছে।

পূষণ ॥ তুমি বলতে চাও তাই আনন্দ আছে—

উষা ॥ হাতে পাওয়ায় নয়, মনে চাওয়ায়।

পূষণ ॥ পাওয়া আর চাওয়া কি মিলবে না ?

উষা ॥ তৃণদলে যা মুক্তা, হাতে তুললে দেখবে এক ফোঁটা জল।

পূষণ ॥ তবে ?

উষা ॥ যেমন চলছে চলুক। আমি থাকি চির পলাতক, তুমি থাকো চির প্রধাবক, মাঝখানে তরঙ্গিত হ'তে থাক আনন্দের মহাম্বুধি।

পূষণ ॥ এ সূক্ষ্ম বঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। কোন্ মূল্যে সহ্য করব এ ক্ষতি ?

উষা ॥ আমি চির যৌবনময়ী, তুমি চির প্রেমময়। এই মূল্যের কি পরিমাণ আছে ?

পূষণ ॥ এ উক্তি নারীর যোগ্য নয়।

উষা ॥ কোন্ নারী চির যৌবনময়ী ?

পূষণ ॥ কোন্ নারী চিরপলাতক ?

উষা ॥ তোমার কাছে থেকে পালাতে জানে যে-নারী সে রক্ষা করে যৌবন, সে রক্ষা করে প্রেম।

পূষণ ॥ তাতে আমার কি লাভ ?

উষা ॥ তুমি থাকবে চিরভাস্বর। প্রেমাধীন চন্দ্রের মতো হ্রাসবৃদ্ধির দাস্য স্বীকার করতে হবে না তোমাকে।

পূষণ ॥ হায় বিধাতা, সৌন্দর্যকে এমন কঠিন ক'রে সৃষ্টি করো কেন ? এ তোমার কি বিচার ?

উষা ॥ পত্রপুট তো অমৃতের যোগ্য আধার নয়—তাকে রক্ষা করতে হয় স্ফটিকাধারে, তবে তো হবে চিরস্থায়ী।

পূষণ ॥ চিরস্থায়ী দুঃখ।

উষা ॥ চিরস্থায়ী সৌন্দর্য।

পূষণ ॥ আমি চাই চিরস্থায়ী প্রেম।

উষা ॥ সৌন্দর্য ও প্রেম এক বই নয়। যে শক্তি প্রকৃতিতে সৌন্দর্য নরনারীর জীবনে তাই প্রেম।

পূষণ ॥ তত্ত্ব চাইনে উষা, তোমাকে চাই, আমি তোমাকে ভালবাসি।

উষা ॥ এসো, তবে ধরো না।

পূষণ ॥ ও কি ছুটে পালাও কেন, দাঁড়াও।

উষা ॥ পূষণ তুমি দেবতা, তুমি সব জানো, কেবল জানো না যে নিজেকে বঞ্চনা ক'রে নিজেকে রক্ষা করতে হয়।

পূষণ ॥ এমন কি অমূল্য আছে যা রক্ষা করবো ?

উষা ॥ সৌন্দর্য।

পূষণ ॥ বন্ধ্যা নারী।

উষা ॥ প্রতিদিন প্রভাতে জগৎকে জন্মদান করি আমি।

পূষণ ॥ স্বৈরিণী।

উষা ॥ স্বাধীন ইচ্ছায় চলেছি এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে।

পূষণ ॥ ধরা দাও, উষা, ধরা দাও।

উষা ॥ এসো, ধরো।

পূষণ ॥ দাঁড়াও, উষা, দাঁড়াও।

উষা ॥ আমি ধরা দিলে, তুমি হবে জ্যোতির্নিঃস্ব, জগৎ হবে অন্ধকার।

পূষণ ॥ নিষ্ঠুরা।

বিষ্ণু ও অদিতি

দৈত্যরাজ বলি বাহুবলে স্বর্গ অধিকার করিয়া লইলে দেবগণ দীনভাবে অন্যত্র প্রচ্ছন্ন থাকেন। পুত্রগণের দুঃখে দেবমাতা অদিতি, বিষ্ণুর আরাধনা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বরদান করেন যে তাঁহার গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণে তিনি বলিকে পাতালে নির্বাসিত করিয়া দেবগণকে স্বর্গের অধিকার ফিরাইয়া দিবেন।

অদিতি॥ প্রভু, হতভাগিনীর প্রণতি গ্রহণ করো।

বিষ্ণু ॥ বৎসে, তোমার ভক্তিপ্রণোদিত কৃচ্ছ্রসাধনে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।

অদিতি॥ সে আমার ভক্তি নয়, ভক্তের প্রতি তোমার অহেতুক করুণা।

বিষ্ণু ॥ বৎসে, কেন তুমি সুকঠোর তপশ্চর্যায় প্রাণপাত করছ? কোন্ দুর্দৈব থেকে রক্ষা পেতে চাও কিম্বা কোন্ অভীষ্ট বস্তু আছে তোমার প্রকাশ করে বলো।

অদিতি॥ প্রভু, দেবজননী আমি, আমার পুত্রগণ স্বর্গের অধীশ্বর, আর কি অভীষ্ট আমার থাকতে পারে?

বিষ্ণু ॥ তবে কোন দুর্দৈব নিশ্চয় তোমাকে পীড়িত করছে।

অদিতি॥ অন্তর্যামীর অনবগত কিছুই নাই। কিন্তু সে দুর্দৈব আমার একার নয়।

বিষ্ণু ॥ তবে আরো শীঘ্র প্রকাশযোগ্য সে কথা।

অদিতি॥ প্রভু স্বর্গ আজ বিপন্ন তাই চরাচর বিপন্ন। স্বর্গ চরাচরের ললাট, সেখানে পড়েছে বিপদের পাংশুল ছায়া, সপ্তভুবন আজ শঙ্কিত।

বিষ্ণু ॥ কি এমন ঘটেছে?

অদিতি॥ দৈত্যরাজ বলি বাহুবলে স্বর্গ নিয়েছে অধিকার ক'রে, আমার পুত্রগণ দীনভাবে আত্মগোপন ক'রে কালযাপন করছে।

বিষ্ণু ॥ অমার্জনীয় স্পর্ধা দৈত্যরাজ বলির।

অদিতি॥ তার সহায় দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য।

বিষ্ণু ॥ নতুবা এমন শক্তিলাভ তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

অদিতি॥ প্রভু দেবগণকে নিয়ে গিয়েছিলাম পিতামহ ব্রহ্মার সমীপে।

বিষ্ণু ॥ কি বললেন তিনি ?

অদিতি ॥ বললেন দৈত্যগুরুসহায় দৈত্যরাজ দৈবশক্তি, ক্ষাত্রশক্তির অতীত। তখন জিজ্ঞাসা করলাম তবে স্বর্গ উদ্ধারের কি উপায় পিতামহ। তিনি বললেন, দেবজননী, উপায় জানেন স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু। বললেন, যাও তাঁর সমীপে। আমি শুধালাম তাঁর কাছে যাওয়ার পন্থা কি ? তিনি বললেন তপস্যা। আরো বললেন, কৃচ্ছ্র কঠোর আচরণের শুষ্ক রুক্ষ প্রস্তরখণ্ড বিছিয়ে দৃঢ়পিনদ্ধ পথ প্রস্তুত করতে হয়, নতুবা তার ষড়ৈশ্বর্যময় রথ আসবে কি করে ? যাও দেবজননী সেই পথ প্রস্তুত করোগে। আমি শুধালাম কবে আসবেন তিনি। পিতামহ বললেন, পথ প্রস্তুত হলেই আসবেন। কিন্তু এদিকে যে সৃষ্টি রসাতলে যায়। ব্রহ্মা বললেন, বৎসে, সে দায় সৃষ্টি-কর্তার। তোমার দায় তুমি সম্পন্ন করো, সৃষ্টির দায়ের জন্য তোমার উদ্বেগ নিরর্থক। শুনে চলে এলাম, বসলাম তপস্যায়।

বিষ্ণু ॥ পথ প্রস্তুত হয়েছে, আমি এসেছি।

অদিতি ॥ কিন্তু প্রভু, পিতামহের একটি উক্তির অর্থবোধ হচ্ছে না। তিনি বলেছিলেন যে ব্যক্তি নিজের ক্ষুদ্রতম কর্তব্য নিপুণতার সঙ্গে, আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পন্ন করছে, যতই অকিঞ্চিৎকর হোক তবু সে বিশ্বম্ভর, বিশ্বের ভার সে বহন করছে।

বিষ্ণু ॥ বহন করছে বই কি ? অট্টালিকার প্রত্যেক ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড কি বহন করছে না অট্টালিকার ভার ? ক্ষুদ্রতম কীটাণু জীবাণুর সহযোগিতাতেই বিধাতা বিশ্বকর্মা।

অদিতি ॥ তবে বিধাতা সর্বশক্তিমান, প্রাণিগণ দীনহীন কেন ?

বিষ্ণু ॥ কে বলল দীনহীন ! ও কেবল বুঝবার ভুল। প্রস্তরখণ্ড ক্ষুদ্র, অট্টালিকা বৃহৎ, তাতে কি প্রমাণ হয় ?

অদিতি ॥ প্রস্তরখণ্ডের সহযোগিতাতেই অট্টালিকা।

বিষ্ণু ॥ জীবের সহযোগিতাতে বিধাতা।

অদিতি ॥ জীব যদি ভুল করে।

বিষ্ণু ॥ অনভীষ্ট প্রস্তরখণ্ডকে টান মেরে ফেলে দেয় স্থপতি।

অদিতি ॥ বিশ্বের স্থপতি কে ?

বিষ্ণু ॥ বিধাতাপুরুষ। তিনি একাধারে স্থপতি ও স্থাপত্য।

অদিতি ॥ এ বড় আশ্চর্য।

বিষ্ণু ॥ কিছুই আশ্চর্য নয়। উর্ণনাভ যেমন একাধারে তন্তু ও তন্তুকার।

অদিতি ॥ এই যে দেববিদ্রোহী দৈত্যরাজ বলি, সে কি সহযোগিতা করছে বিধাতার ? সে কি অনভীষ্ট প্রস্তরখণ্ড নয় ?

বিষ্ণু ॥ সেইজন্যই স্থপতি এবার উৎকণ্ঠিত হ'য়েছে ; অবাধ্য প্রস্তরখণ্ডটাকে পরিত্যাগ করবার সময় সমাগত।

অদিতি ॥ জয় হোক বিধাতার। কিন্তু প্রভু, একটি প্রশ্ন মনকে আলোড়িত করছে। বিধাতা যদি সর্বশক্তিমান হন তবে হিরণ্যকশিপু, রাবণ, বলি প্রভৃতির সৃষ্টি করেন কেন ?

বিষ্ণু ॥ ইঁটের পাঁজায় ঝামা ইঁট বের হয় কেন ?

অদিতি ॥ কারিগরের ত্রুটিতে।

বিষ্ণু ॥ বিধাতাপুরুষও ত্রুটিহীন নন।

অদিতি ॥ বিধাতাপুরুষে ত্রুটি। কি সর্বনাশ !

বিষ্ণু ॥ বৎসে, এমন বিচলিত হলে কেন ? আগে বলেছি যে, বিধাতাপুরুষ একাধারে স্থপতি ও স্থাপত্য, একাধারে বিশ্ব ও বিশ্বকর্মা। এখন স্থপতিরূপে তিনি ত্রুটিহীন, স্থাপত্যরূপে ত্রুটিপূর্ণ ; বিশ্বরূপে তিনি ত্রুটিপূর্ণ, বিশ্বকর্মারূপে ত্রুটিহীন।

অদিতি ॥ তার অর্থ তিনি সর্বশক্তিমান নন।

বিষ্ণু ॥ বিশ্বরূপে অর্থাৎ যেরূপে তিনি বিশ্বের সমব্যাপক সে রূপে ত্রুটিহীন নন। কিন্তু যে-রূপে তিনি বিশ্বকে অতিক্রম ক'রে বিরাজমান সে-রূপে ত্রুটিহীন বই কি।

অদিতি ॥ এ যে নূতন কথা।

বিষ্ণু ॥ বিধাতাপুরুষের সমস্ত বিভূতি তোমার পরিজ্ঞাত হবে, এই কি আশা করেছিলে ?

অদিতি ॥ অধীনার আর একটা প্রশ্নের উত্তর দান ক'রে তার মনের অন্ধকার দূর করো।

বিষ্ণু ॥ কি বলো ?

অদিতি ॥ বিধাতাপুরুষ কি ইচ্ছামাত্রে রাবণ, হিরণ্যকশিপু, বলি প্রভৃতিকে সংযত করতে পারেন না? তাকে অবতীর্ণ হ'তে হয় কেন?

বিষ্ণু ॥ বিশ্বকে অতিক্রম ক'রে আছেন যিনি বিশ্বের নিয়মজাল স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে তিনি আপন শক্তিকে সীমাবদ্ধ ক'রে নেন।

অদিতি ॥ কেন?

বিষ্ণু ॥ অত্যাচারীর বিনাশকে নৈতিক সমর্থন দেওয়ার উদ্দেশ্যে। মনে করো পল্লীর অত্যাচারী লোকটা হঠাৎ নদীতে ডুবে মারা গেল। আবার তারই মৃত্যু হ'ল রাজাদেশে যথারীতি বিচারের পরে। দু'য়ের বাস্তব মূল্য এক হ'তে পারে কিন্তু নৈতিক মূল্য কি এক?

অদিতি ॥ নিশ্চয় নয়, রাজদণ্ডে মৃত্যু লোকশিক্ষার সহায়ক।

বিষ্ণু ॥ এ-ও সেইরকম। একদিন হঠাৎ দেখা গেল যে, রাবণ সিংহাসনের উপরে মৃগীরোগে ম'রে প'ড়ে রয়েছে। আর রামচন্দ্র সম্মুখ সমরে তাঁকে নিহত করলেন—এ দু'য়ে কি প্রভেদ নেই?

অদিতি ॥ অবশ্যই আছে। মৃগীরোগ লোকশিক্ষা সহায়ক নয়, রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ বধ লোকশিক্ষা সহায়ক।

বিষ্ণু ॥ এবার বুঝলে?

অদিতি ॥ আংশিক মাত্র। রামচন্দ্র যেমনি মানবজন্ম গ্রহণ করলেন অমনি স্থপতি থেকে হলেন স্থাপত্য, সর্বশক্তিমান হ'লেন সীমাবদ্ধ শক্তিমান। এমন হয় কেন?

বিষ্ণু ॥ সর্বশক্তিমানের দ্বারা সীমাবদ্ধ শক্তিমানের বিনাশ মানুষের পক্ষে পীড়াদায়ক, তার সম্পূর্ণ অর্থ সে গ্রহণ করতে পারে না। অনেকে সেটাকে বিধাতার অবিচার বলে মনে করলেও করতে পারে। কিন্তু রামচন্দ্র আর রাবণ দু'জনেই যখন সীমাবদ্ধ শক্তির সমতলে অবস্থিত, তখন রাবণ বধ আর বিধাতার অবিচার বলে অনুভূত হয় না, মনে হয় না অসমদ্বন্দ্ব, মনে হয়, সমদ্বন্দ্বের সাধনোচিত পরিণাম। কিন্তু শুধু তা-ই নয়। লোকশিক্ষাকে উজ্জ্বলতর করবার উদ্দেশ্যে অবতারগণ সর্ব ক্ষেত্রে নিজেকে এক ধাপ নীচে প্রতিষ্ঠিত করেন। দশানন বিংশতিবাহু, ত্রিদিববিজয়ী রাবণের প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্বল

মানবদেহধারী রামচন্দ্র। প্রবল প্রতাপশালী হিরণ্যকশিপুর নিহন্তা সামান্য নৃসিংহ-মূর্তি। কংসকে নিহত করলেন কিশোর বালক।

অদিতি॥ প্রভু এবারে কোন্ মূর্তিতে বলীকে সংযত করবেন জানতে অদম্য কৌতূহল অনুভব করছি।

বিষ্ণু ॥ মানবক বামনরূপে।

অদিতি॥ প্রভু অসহায় রমণী পরিহাসের যোগ্য পাত্র নয়।

বিষ্ণু ॥ পরিহাস নয় দেবজননী, যে যুদ্ধ আসন্ন, তাতে বামনের হাতে নিহত হবে দৈত্যসম অত্যাচারী।

অদিতি॥ কোন্ অস্ত্রে?

বিষ্ণু ॥ বিনা অস্ত্রে। বিনা অস্ত্রে এবং একক। অত্যাচারীর মধ্যেই আছে বিনাশের বীজ, অসহায় একক বামনরূপী মানব তারই সুযোগ করবে গ্রহণ।

অদিতি॥ আশ্চর্য।

বিষ্ণু ॥ আশ্চর্য হ'য়ো না বৎস, এবারে আসন্ন অসহায় একক নিরস্ত্র, অখ্যাত অজ্ঞাত মানবের যুগ। দশমুণ্ড, বিশ হাত, অমিতবীর্য, ত্রিদিববিজয়ীর দল অনেক যুদ্ধে চরাচর শাসন করেছে—ভবিষ্যৎটা এবারে দুই হাত, দুই চরণ, ক্ষণজীবী নামগোত্রহীন সামান্য মনুষ্যের।

অদিতি॥ ভগবান, কোন্ সৌভাগ্যবতীর গর্ভে বামনরূপে তুমি জন্মগ্রহণ করবে?

বিষ্ণু ॥ আয়ুষ্মতী, তোমার গর্ভে।

অদিতি॥ আজ আর বিস্ময়ের শেষ নাই। আমার গর্ভে?

বিষ্ণু ॥ হাঁ, দেবমাতা তুমি, তোমার গর্ভজাত দেবঅংশী মানবক এ যুগে রক্ষা করবে দেবগণকে অত্যাচারীর কবল থেকে। যাও বৎসে, এবারে তার আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত হও গে।

অদিতি॥ প্রভু, ধন্য আমার নারীজন্ম, যাতে একোদরে পেলাম দেব ও মানবকে আপনার আত্মজরূপে।

বিষ্ণু ॥ সেই সঙ্গে পেলে আমাকে।

অদিতি॥ প্রভু, অসীম তোমার করুণা।

ত্রিশঙ্কু ও নরকযাত্রী

পৌরাণিক নৃপতি ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গলাভের ইচ্ছায় বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলে তিনি তপোবলে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে প্রেরণ করেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন নিরুপায় ত্রিশঙ্কু স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যলোক যে শূন্য সেখানে দোদুল্যমান অবস্থায় রহিয়া গেলেন। নরকযাত্রীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকারের কল্পনাটি লেখকের।

ত্রিশঙ্কু ॥ কুয়াশায় আবৃতদেহ কে চলেছ তুমি ?

নরকযাত্রী ॥ পরিচয় শুনে কী লাভ, আমি নিতান্ত হতভাগ্য।

ত্রিশঙ্কু ॥ হতভাগ্য ! শুনে সমবেদনা অনুভব করছি।

নরকযাত্রী ॥ তুমি সহৃদয় বটে।

ত্রিশঙ্কু ॥ সহৃদয় ! সহৃদয়তাই বটে। তোমার ভাগ্যহীনতার প্রসঙ্গে নিজের কথা মনে পড়ে গেল !

নরকযাত্রী ॥ তুমিও কি হতভাগ্য !

ত্রিশঙ্কু ॥ চরাচরে এমন হতভাগ্য আর কে আছে ?

নরকযাত্রী ॥ আশ্চর্য ! আমার ধারণা ছিল, আমার চেয়ে বড় হতভাগ্য আর কেউ কোথাও নেই।

ত্রিশঙ্কু ॥ ভাগ্যহীনতার ঐটি যে লক্ষণ। সর্বদাই নিজেকে হতভাগ্যের সেরা মনে হয়।

নরকযাত্রী ॥ তা বটে। ভাগ্যবান লোকে যেমন নিজের সৌভাগ্যকে স্বীকার করতেই চায় না।

ত্রিশঙ্কু ॥ হাঁ, এ ঠিক তার বিপরীত। কিন্তু এখনও তোমার পরিচয় পেলাম না।

নরকযাত্রী ॥ ভাগ্যহীনতার আবার পরিচয় কী ? আর কেনই বা পরিচয়দান ?

ত্রিশঙ্কু ॥ মিলিয়ে দেখতে পারি, দুর্ভাগ্যের নিম্নতর ধাপে কার অবস্থান ?

নরকযাত্রী ॥ তবে শোন, আমি নরকযাত্রী !

ত্রিশঙ্কু ॥ আহা, শুনে লোভ হচ্ছে।

নরকযাত্রী ॥ মর্মান্তিক এই পরিহাস।

ত্রিশঙ্কু ॥ পরিহাস নয় বন্ধু, পরিহাস নয়, সত্যই শুনে ঈর্ষা অনুভব করছি।

নরকযাত্রী ॥ বিচিত্র তোমার মতিগতি। এই অস্বাভাবিক ঈর্ষার কারণ ?

ত্রিশঙ্কু ॥ তোমার বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পারছি। কিন্তু মনে রেখো, নরকের চেয়েও হীনতর স্থান সম্ভব।

নরকযাত্রী ॥ তেমন কোন স্থান থাকলেও আমার অগোচর। জানি মর্ত্যলোক, জানি সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত রসাতল, জানি সপ্ত লোক—নরকের চেয়ে হীনতর স্থান জানিনে।

ত্রিশঙ্কু ॥ যদি থাকে তবে সেখানকার অধিবাসীকে কী বলবে ?

নরকযাত্রী ॥ অসম্ভব আলোচনায় কী লাভ ? তার চেয়ে তোমার পরিচয় শুনি।

ত্রিশঙ্কু ॥ আমার জগতের পরিচয়েই আজ আমার পরিচয়।

নরকযাত্রী ॥ তবু যেমন করে হোক পরিচয়টাই শুনি।

ত্রিশঙ্কু ॥ সে-জগতের দেবার মত কোন পরিচয় নেই, কী বলে তোমাকে বোঝাব ?

নরকযাত্রী ॥ কেন ?

ত্রিশঙ্কু ॥ নইলে আর হতভাগ্যতম বলছি কেন।

নরকযাত্রী ॥ তবু যেমন করে হোক বুঝিয়ে দাও, আভাসে ইশারায় ত অনেক রহস্য বোঝান চলে।

ত্রিশঙ্কু ॥ তা চলে অবশ্য। তবে শোন। যেসব বস্তুকে মানুষের কল্পনা চরম কাম্য মনে করে স্বর্গ তাই দিয়ে গড়া। নরক ঠিক তার উল্টো, বর্জনীয়ের আবর্জনালোক নরক। আর মর্ত্য ভালমন্দর মিশালে তৈরি। কেউ বলে ভালটা বেশী, কেউ বলে মন্দটা।

নরকযাত্রী ॥ উত্তম বলেছ। কিন্তু এ ছাড়া আর কী থাকতে পারে জানিনে।

ত্রিশঙ্কু ॥ সেটাই যে বোঝান কঠিন, তবু চেষ্টা করা যাক। এ তিনের বাইরে আছে এক জগৎ যা অবাস্তবতার কুয়াশা দিয়ে তৈরি।

নরকযাত্রী ॥ অবাস্তবতার কুয়াশা। তোমার কথাটাই যে কুয়াশার মত। কুয়াশা দিয়ে কি কুয়াশা বোঝান যায় ?

ত্রিশঙ্কু ॥ তবেই বুঝে নাও সে-জগৎটা কেমন অবাস্তব, যার পরিচয় দেবার যোগ্য শব্দ নেই মানুষের ভাষায়।

নরকযাত্রী ॥ ইশারা ইঙ্গিত আছে।

ত্রিশঙ্কু ॥ কুয়াশা শব্দটি সেই ইশারা-ইঙ্গিতের অন্তর্গত।

নরকযাত্রী ॥ আর একটু স্পষ্ট কর।

ত্রিশঙ্কু ॥ কুয়াশা স্পষ্ট হলে কি আর কুয়াশা থাকে? অবাস্তবলোককে স্পষ্ট করতে গেলে তার মধ্যে বস্তু এসে পড়ে, তখনই তার স্বধর্ম যায় নষ্ট হয়ে।

নরকযাত্রী ॥ কোথায় এই অবাস্তবলোক?

ত্রিশঙ্কু ॥ বাইরে এবং ভিতরে দুই স্থানেই।

নরকযাত্রী ॥ আবার কুয়াশা।

ত্রিশঙ্কু ॥ বাইরে অন্তরীক্ষে, ভিতরে মনের মধ্যে।

নরকযাত্রী ॥ অন্তরীক্ষের কথা বলতে পারিনে, যাকে পাপ বলি তাকেই কি মনোলোকের অবাস্তবতা বলছ?

ত্রিশঙ্কু ॥ পাপ ত অবাস্তব নয়, পাপ বস্তুস্পর্শ-জড়িত।

নরকযাত্রী ॥ পুণ্য?

ত্রিশঙ্কু ॥ পুণ্যও বস্তুস্পর্শ-জড়িত।

নরকযাত্রী ॥ পাপও নয় পুণ্যও নয়, তবে আর কী হতে পারে?

ত্রিশঙ্কু ॥ পাপ পুণ্য কোনটারই চর্চা করেনি যে, কেবলই নিজের ছায়া নিয়ে ছিল মত্ত হয়ে, তাকে কী বলবে?

নরকযাত্রী ॥ আত্মপ্রেমে মুগ্ধ।

ত্রিশঙ্কু ॥ অবাস্তবতার প্রেমে মুগ্ধ।

নরকযাত্রী ॥ তবে আত্মতন্ত্রতাই কি অবাস্তবতা?

ত্রিশঙ্কু ॥ অনন্যতন্ত্র আত্মতন্ত্রতাই অবাস্তবতা।

নরকযাত্রী ॥ অনন্যতন্ত্রতা আর আত্মতন্ত্রতা কি স্বতোবিরোধী নয়?

ত্রিশঙ্কু ॥ স্বতোবিরোধী বলে জগতে কিছু নেই, ওটা দেখার ভুল। দুই চোখের তারায় ছায়া পড়ে দুটো, কিন্তু বস্তু প্রতিভাত হয় একটি —এই ত স্বাভাবিক। অনন্যতন্ত্রতা আর আত্মতন্ত্রতা সেই দুটো ছায়ার মত।

নরকযাত্রী ॥ কিন্তু প্রতিভাত বস্তু এক বই নয়।

ত্রিশঙ্কু ॥ নিশ্চয়।

নরকযাত্রী ॥ কী তার নাম ?

ত্রিশঙ্কু ॥ বিশ্বতন্ত্রতা।

নরকযাত্রী ॥ এবারে কুয়াশা ক্রমে গাঢ়তর হচ্ছে।

ত্রিশঙ্কু ॥ তবে বস্তুলোকের দিকে এগোচ্ছে। ঘনতর কুয়াশাকেই বলি মেঘ।

নরকযাত্রী ॥ মেঘের চেয়ে বৃষ্টির উপরে ভরসা বেশী—বেশ জলের মত পরিষ্কার করে দাও দেখি।

ত্রিশঙ্কু ॥ স্বর্গমর্ত্য নরকের সীমানার বাইরে অন্তরীক্ষের প্রত্যন্তের প্রান্তে যে অবাস্তবলোক আছে, অনন্যতন্ত্র বিশ্ববিমুখ আত্মতন্ত্রতার মন্থনজাত কুয়াশা দিয়ে যে-লোক তৈরি, যেখানে আলো নেই, অন্ধকার নেই, ঊর্ধ্ব নেই, অধঃ নেই, কাল নেই, দেশ নেই, যেখানে জ্ঞান নেই, ভক্তি নেই, কর্ম নেই; যেখানে কেবল অহং আছে বলে অহংটাও নেই—সেই দেশের একক অধীশ্বর আমি ত্রিশঙ্কু!

নরকযাত্রী ॥ তুমি ত্রিশঙ্কু! অযোধ্যার অধিপতি, পুরাণে শোনা আছে তোমার নাম। কী পাপে তোমার এই গতি হল মহারাজ।

ত্রিশঙ্কু ॥ অবাস্তবতার অভিশাপে।

নরকযাত্রী ॥ কে দিল এমন নিষ্ঠুর অভিশাপ ?

ত্রিশঙ্কু ॥ সব অভিসম্পাত যে দিয়ে থাকে।

নরকযাত্রী ॥ অদৃষ্ট ?

ত্রিশঙ্কু ॥ অভিশাপ মাত্রেই আত্মশাপ, অভিশপ্ত ব্যক্তিমাত্রেই আত্মশপ্ত।

নরকযাত্রী ॥ নিজেই নিজেকে শাপ দিয়েছ ?

ত্রিশঙ্কু ॥ নিজে শাপের কারণ ঘটিয়েছি, বাইরে থেকে এসেছে উপলক্ষ্য। ও একই কথা হল।

নরকযাত্রী ॥ কৌতূহল ক্রমে বাড়ছে, দাও তোমার আত্মাভিশাপের বিবরণ।

ত্রিশঙ্কু ॥ ছিলাম অযোধ্যার অধিপতি, দানে ধ্যানে ক্রিয়া-কর্মে অশেষ ছিল আমার খ্যাতি। অবশেষে জীবনের অপরাহ্ণে সশরীরে স্বর্গলাভের ইচ্ছা হল। দেবগণ স্বভাবতই প্রত্যাখ্যান করলেন আমার প্রার্থনা। তখন পড়লাম গিয়ে বিশ্বামিত্র ঋষির চরণে;

বললাম, তপোধন, আপনি তপোবলে আমাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করুন। ঋষির দয়ার শরীর, তিনি আমার আকুলতা দেখে মন্ত্রবলে প্রেরণ করলেন স্বর্গাভিমুখে। তখন বুঝতে পারিনি কী শোচনীয় পরিণাম অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। স্বর্গে উপস্থিত হওয়ামাত্র ইন্দ্র করলেন প্রত্যাখ্যান। তখন, হায়, তখনি প্রথম বুঝলাম যে, সর্বনাশ সাধন করেছি নিজের। বিশ্বামিত্রের মন্ত্র আর ইন্দ্রের প্রত্যাখ্যান—দুয়ে মিলে অধঃ উর্ধ্ব করল রুদ্ধ। আমার মর্ত্যও গেল সরে, স্বর্গও হল না আয়ত্ত। এখন আমি, তখন থেকে আমি, কতকাল হল বলতে পারিনে, অবাস্তবতার অন্তরীক্ষে বিশ্বের বিদ্রূপের মত দোদুল্যমান।

নরকযাত্রী ॥ শুনলাম তোমার ইতিহাস।

ত্রিশঙ্কু ॥ একে ইতিহাস বলছ? দেশকালের লীলায় ইতিহাসের সৃষ্টি। এখানে দেশ নেই, কালও নেই।

নরকযাত্রী ॥ সমস্তই সত্য, কিন্তু তুমি কোন পাপ করনি।

ত্রিশঙ্কু ॥ পাপ! এর চেয়ে পাপ ভাল, এই অবাস্তবতার চেয়ে পাপবোধ সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।

নরকযাত্রী ॥ এত খেদ কেন। তোমার অন্তরীক্ষ আর যাই হোক, নরক ত নয়।

ত্রিশঙ্কু ॥ এর চেয়ে নরক অনেক বরণীয়।

নরকযাত্রী ॥ কেন, কেন?

ত্রিশঙ্কু ॥ নরক বস্তু দিয়ে গড়া, সেখানকার দুঃসহ রৌরব অগ্নি, সেও ত বাস্তব বই নই। আর সেখানে কাল আছে, তাই কালের অবসান আছে, একদিন হবে তোমার মুক্তি। এখানে কাল নাই, তাই মুক্তির আশা নাই; দেশ নাই, তাই স্থানান্তর প্রাপ্তির আশা নাই। কেবলি অবাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করে মরছি। এ যে কী দুঃখ কেমন করে বোঝাব। অনন্ত কুয়াশার বদলে আমার আত্মা প্রার্থনা করছে একবিন্দু শিশির।

নরকযাত্রী ॥ এখনও বুঝতে পারলাম না, কী পাপে তোমার এই গতি!

ত্রিশঙ্কু ॥ সশরীরে স্বর্গগমন! আমি এমন কিছু প্রার্থনা করেছিলাম যা

একান্ত অবাস্তব। বস্তুপ্রকৃতিকে লঙ্ঘন করতে চেয়েছিলাম, বস্তুজগতের অভিসম্পাতে নিক্ষিপ্ত আমি অবাস্তবতার কুজ্ঝটিকা সমুদ্রে। যাই হোক, এ চরম দুঃখ তোমাকে বোঝাতে পারব না।

নরকযাত্রী ॥ রাজন্, তুমি কি নারকীর সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করতে সম্মত আছ ?

ত্রিশঙ্কু ॥ এখনই, এখনই। কিন্তু তুমি কি এত শোনবার পরেও আমার স্থলাভিষিক্ত হতে সম্মত ?

নরকযাত্রী ॥ নিশ্চয়—রৌরব অনলের ভয়ে আমি ভীত।

ত্রিশঙ্কু ॥ হায়, তুমি সম্মত থাকলেও আমার সাধ্য নাই যে স্থান পরিবর্তন করি।

নরকযাত্রী ॥ বাধা কী ?

ত্রিশঙ্কু ॥ বাধা আমি স্বয়ং—নইলে আর অবাস্তবতার শৃঙ্খল দুর্মোচ্য কেন ?

নরকযাত্রী ॥ এস না চেষ্টা করা যাক।

ত্রিশঙ্কু ॥ অসাধ্য, অসম্ভব।

নরকযাত্রী ॥ তবে ?

ত্রিশঙ্কু ॥ তবে আর কি, যাও। স্বর্গের তুলনায় নরক যত ভয়ঙ্কর, নরকের তুলনায় এ অবাস্তবলোক তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। তুমি হতভাগ্য, আমি হতভাগ্যতম।

নরকযাত্রী ॥ তবে চলি, মহারাজ।

ত্রিশঙ্কু ॥ যাও, কিন্তু মনে রেখ, মনে রেখ, অবাস্তবতার অন্তরীক্ষচারী ত্রিশঙ্কুকে, আর সকলকে বল, বুঝিয়ে বল স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের নাগালের বাইরে অবাস্তবতার দুস্তর দ্বীপে নির্বাসিত এই ত্রিশঙ্কুর দুঃখ—সে-দুঃখ ভাষার অতীত, বর্ণনা করে বোঝাই এমন সাধ্য নেই, যে বোঝে সে বোঝে! চরাচরে আর কাউকে কখনও যেন না বুঝতে হয়—এই মহত্তম দুঃখ। বিদায় বন্ধু বিদায়; আশা করি বিদায়ের আগে বুঝে গেলে, কেন সভ্য নরক-যাত্রীকেও আমার এমন ঈর্ষা।

হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ ও নৃসিংহমূর্তি

বিষ্ণুদ্বেষী হিরণ্যকশিপু কর্তৃক বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের নির্যাতন এবং অবশেষে নৃসিংহমূর্তিধারী বিষ্ণু কর্তৃক হিরণ্যকশিপু বধ সুপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক কাহিনী।

হিরণ্য ॥ এই সব কথা বুঝি তোমার গুরুমশায় শেখাচ্ছেন?

প্রহ্লাদ ॥ না, পিতা।

হিরণ্য ॥ তবে কোথা থেকে এসব পাও শুনি?

প্রহ্লাদ ॥ কোথা থেকে পাখী তার সঙ্গীত পায়?

হিরণ্য ॥ পাখী পায় পক্ষীমাতার কাছ থেকে। তোমার মাতা নিশ্চয়ই এ সব কথা শেখান না।

প্রহ্লাদ ॥ নিশ্চয়ই নয়।

হিরণ্য ॥ তবে?

প্রহ্লাদ ॥ কোথা থেকে নদী পায় মধুর সঙ্গীত?

হিরণ্য ॥ ঐ যে তার স্বভাব।

প্রহ্লাদ ॥ আমিও পেয়ে থাকি স্বভাব থেকে।

হিরণ্য ॥ তুমি পাও স্বভাব থেকে? তবে আমি পাইনে কেন?

প্রহ্লাদ ॥ পিতা, আপনার হৃদয় যেদিন ভক্তিতে বিগলিত হবে, উঠবে মধুর কলধ্বনি।

হিরণ্য ॥ অকালপক্ক বালক! তুমি শেখাতে চাও আমাকে ভক্তি।

প্রহ্লাদ ॥ এবার তবে তুষার গলবে, উঠবে মধুর সঙ্গীত।

হিরণ্য ॥ মধুর সঙ্গীত কাকে বলো জানি নে, কিন্তু ঐ পাপ নাম কখনো আমার মুখে উচ্চারিত হবে না।

প্রহ্লাদ ॥ কেন, মহারাজ, তিনি যে পিতার পিতা।

হিরণ্য ॥ আমার পিতার নাম মহারাজা……

প্রহ্লাদ ॥ আমার পিতামহের নাম কি আমি জানিনে? আমি যাঁর কথা বলছি তিনি যে সকলেরই পিতা।

হিরণ্য ॥ অর্থাৎ তোমারও পিতা, আমারও পিতা। নির্বোধ বালক।

প্রহ্লাদ ॥ সত্যই আমি নির্বোধ। তিনি যে আমাদের সকলেরই পিতা এ বোধ এখনো আমার জীবনে সত্য হ'য়ে ওঠেনি।

হিরণ্য ॥ নাঃ, তোমার ওই নিরেট গুরুটিকে বিদায় ক'রে দিতে হচ্ছে। মাসান্তে স্বর্ণ মুদ্রা গুনে নেবেন, প্রত্যহ ঘৃত দুগ্ধ দধির সর্বনাশ করবেন, আর আমার পুত্র শিখবে আমার শত্রুর নাম।

প্রহ্লাদ ॥ আগেই তো বলেছি পিতা, তিনি নির্দোষ, তিনি এ সব কথা শেখান না।

হিরণ্য ॥ তবে তিনি কি শিখিয়ে থাকেন ?

প্রহ্লাদ ॥ তিনি 'ক' শেখান আমি শুনি কৃষ্ণ, তিনি 'খ' বলেন আমি শুনি খলান্তক, তিনি 'গ' বলেন আমি শুনি গরুড়বাহন, তিনি 'ঘ' বলেন আমি শুনি ঘনশ্যাম, তিনি···

হিরণ্য ॥ থাক্ থাক্ যথেষ্ট হয়েছে। তিনি আর যাতে কিছু না বলতে পারেন তার ব্যবস্থা করছি। তাঁকে রাজপ্রহরী করবে একশত কশাঘাত।

প্রহ্লাদ ॥ সে দণ্ড আমার প্রাপ্য।

হিরণ্য ॥ তোমাকে নিক্ষেপ করব হস্তীপদতলে।

প্রহ্লাদ ॥ একবার তো নিক্ষেপ করেছিলেন অতল সমুদ্রে।

হিরণ্য ॥ তুমি সন্তরণ পটু।

প্রহ্লাদ ॥ ভুলে যাচ্ছেন পিতা আমার দেহে গুরুতর শিলাখণ্ড বেঁধে দেবার আদেশ দিয়েছিলেন।

হিরণ্য ॥ রাজানুচরগণ সে আদেশ অমান্য করেছে, কৌশলে করেছে তোমাকে রক্ষা।

প্রহ্লাদ ॥ তাদের এমন সাহস হবে সাধ্য কি ?

হিরণ্য ॥ তবে রক্ষা পেলে কেমন ক'রে শুনি ?

প্রহ্লাদ ॥ কূর্ম অবতারে সমুদ্রে যাঁর অবস্থিতি তিনিই আমার রক্ষক।

হিরণ্য ॥ কে তিনি ?

প্রহ্লাদ ॥ তিনি আমার রক্ষক, আমার প্রভু, আমার পিতা, আমার কৃষ্ণ।

হিরণ্য ॥ তোমার সেই বাপই বুঝি তোমাকে রক্ষা করেছিল বিষান্ন গ্রহণের সময়েও ?

প্রহ্লাদ ॥ ঠিক বলেছেন পিতা। রাজাদেশে জননী বিষান্ন প্রস্তুত ক'রে নীরবে রোদন করছেন, বলছেন বাছা কেন তোকে গর্ভে ধারণ

করেছিলাম ? বৃদ্ধা পিতৃষ্বসা কপালে করাঘাত করছেন, বলছেন কেন এতদিন আমার মৃত্যু হ'ল না, এমন সময়ে শত মাণিক্যের প্রভায় গৃহ হয়ে উঠল আলোকিত, কৃষ্ণ প্রবেশ করলেন, বললেন, প্রহ্লাদ দ্বিধা কেন ? অন্ন গ্রহণ করো। এই বলে তিনি স্বহস্তে অন্নগ্রাস তুলে দিলেন আমার মুখে! অমৃত, অমৃত, রাজগৃহের পরমান্নও এমন মধুর নয়।

হিরণ্য ॥ ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র। আমার গৃহে আমারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। আমার আদেশ পালিত হয় না, আমার সম্মান রক্ষিত হয় না। ঐ অন্নে বিষ কখনোই মিশ্রিত হয়নি।

প্রহ্লাদ ॥ ভুলে যাচ্ছেন পিতা, অন্নগ্রাসের পরীক্ষা হয়েছিল যে একটি কুকুরের উপরে।

হিরণ্য ॥ এবারে দণ্ডের সময়ে আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকবো।

প্রহ্লাদ ॥ ইতিপূর্বে উপস্থিত থাকতে পারেন নি কেন ?

হিরণ্য ॥ তুমি কি মনে করো শুনি ?

প্রহ্লাদ ॥ সে দৃশ্য দেখবার মতো কঠিন নয় আপনার হৃদয়।

হিরণ্য ॥ আমার হৃদয় পাষাণ।

প্রহ্লাদ ॥ পাষাণে কি ঝরণা থাকে না ?

হিরণ্য ॥ আমার হৃদয় বর্মে আবৃত।

প্রহ্লাদ ॥ বর্ম কি চিড় খায় না ?

হিরণ্য ॥ আমার হৃদয় বলে কিছু নেই।

প্রহ্লাদ ॥ তবে প্রভুর পাদপদ্মে অর্পিত হয়েছে।

হিরণ্য ॥ পাষণ্ড।

প্রহ্লাদ ॥ সত্যই পিতা আমি পাষণ্ড। কৃষ্ণনামে আপনাকে যতখানি উত্তেজিত করে আমাকে ততখানি বিগলিত করে না কেন ? সত্যই আমি পাষণ্ড। তিনি আপনাকেই করবেন আগে উদ্ধার।

হিরণ্য ॥ হাঃ হাঃ হাঃ! তোমার কৃষ্ণের দয়া তো কম নয় দেখছি, আমাকে করবেন আগে উদ্ধার, তারপরে তোমার মতো ভক্তকে। তবে তো তাকে নিরপেক্ষ বলা যায় না।

প্রহ্লাদ ॥ কে বলল তিনি নিরপেক্ষ ? তিনি যে আমার অপেক্ষা রাখেন। এ লীলার অনুরূপ আপনি কি দেখেন নি ? আমি দেখেছি কতবার। নদীর ঘাটে খেয়ারী খেয়া পারাপার করছে, যে পথিক আসছে তখনি তাকে নদী পার করে দিচ্ছে। আর তার ছেলেটিকে ঠায় বসিয়ে রেখেছে ঘাটের কাছে। কই তাকে তো পার করছে না। করবার তাড়া নেই। তাকে পার করে সেই শেষ খেয়ায় বাড়ীতে ফিরবার সময়ে। কে বলল যে তিনি নিরপেক্ষ ? আপন লোককে দয়া করেন তিনি সকলের পরে।

হিরণ্য ॥ তবে তো তাঁর পর হওয়াই ভালো।

প্রহ্লাদ ॥ হিসাব ক'রে কি কেউ ভালবাসে পিতা ? ত্বরায় উদ্ধারের আশা নেই জেনেও ভালবাসবার যে সে ভালবাসবে। এ-ও তাঁর এক লীলা।

হিরণ্য ॥ আর আমি যদি উদ্ধার পেতে না চাই ?

প্রহ্লাদ ॥ সেটি হবে না মহারাজ, অদ্য বা শতাব্দান্তে উদ্ধার পেতেই হবে। এপারের সমস্ত পথিক পার না হ'লে খেয়াপার বন্ধ হবে না।

হিরণ্য ॥ আমার মতো পাষণ্ডকে উদ্ধার করতে এতই যদি তাঁর শিরঃপীড়া তবে আমাকে ভক্ত করে গড়লেই পারতেন, পাষণ্ড ক'রে এমন জল ঘোলানো কেন ?

প্রহ্লাদ ॥ ঐ তো বললাম, সে তাঁর লীলা। ছেলেরা 'কানামাছি' খেলা করে। খেলুড়ে ধরাই যদি উদ্দেশ্য হতো তবে চোখ না বাঁধলেই তো সুবিধে ছিল।

হিরণ্য ॥ সে যে খেলা।

প্রহ্লাদ ॥ এ যে লীলা। যে খেলায় দুই পক্ষে মানুষ তাকে বলি খেলা, আর যে খেলায় একপক্ষে ভক্ত আর পক্ষে ভগবান তাকে বলি লীলা।

হিরণ্য ॥ এখানে ব'সে ব'সে তোমার ক্লৈব্যতত্ত্ব শুনবার অখণ্ড অবসরের আমার অভাব। তোমাকে সরলভাবে একটা প্রশ্ন করি, সরল-ভাবে উত্তর দাও।

প্রহ্লাদ ॥ ভক্তের উত্তর অসরল হয় না।

হিরণ্য ॥ তুমি এতক্ষণ যে সব কথা বললে সে-সব যদি প্রাঞ্জল বলো তবে

অবশ্য আলাদা কথা; সে কথা না হয় এখন থাক। তুমি এ রাজ্যের উত্তরাধিকারী কিনা?

প্রহ্লাদ ॥ মহারাজ যখন আমার পিতা……কিন্তু রাজত্ব করবার অভিপ্রায় আমার নেই।

হিরণ্য ॥ আরে আমার তো আছে।

প্রহ্লাদ ॥ আপনি সুখে রাজত্ব করুন।

হিরণ্য ॥ কিন্তু করতে দিচ্ছ কই?

প্রহ্লাদ ॥ কেন মহারাজ, আমি তো রাজদ্রোহী নই।

হিরণ্য ॥ তোমার চেয়ে বড় রাজদ্রোহী আর কোথাও জন্মেছে বলে তো জানিনে।

প্রহ্লাদ ॥ এবারে মহারাজ আমাকে বিস্মিত করলেন। আমার অপরাধ কি শুনতে পাই?

হিরণ্য ॥ তোমার ভগবদ্‌ভক্তি।

প্রহ্লাদ ॥ ভগবদ্‌ভক্তি রাজদ্রোহ?

হিরণ্য ॥ বিস্ময় এখনো কাটে নি দেখছি। তবে বুঝিয়ে বলি।

প্রহ্লাদ ॥ আমি অবহিত হয়েছি।

হিরণ্য ॥ রাজার ছেলেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে কি করে? বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাগান-বাড়ীতে মদ গাঁজা ভাঙ খায়, জুয়া খেলে মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করে। এ ছাড়া আর করবেই বা কি বলো, হাতে কাজ তো নেই। বাপ বেঁচে থাকতে সিংহাসনের কাছে তো আর ভিড়তে দেবে না। যাই হোক তারা কি ভাবে জীবন কাটায় রাজা থেকে রাখাল পর্যন্ত রাজ্যের ছোট বড় সবাই জানে। কেউ দোষ দেয় না, এই তো রাজপুরুষদের স্বভাব, বরঞ্চ ব্যতিক্রম ঘটলেই সবাই এ ওকে প্রশ্ন করে- এ কেমন ঘটল? বৎস, প্রহ্লাদ, তোমার ক্ষেত্রে সেই রকম প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে রাজ্যময়।

প্রহ্লাদ ॥ অন্য রাজপুত্রদের অনুসৃত পন্থা অবলম্বন করলে আপনি কি খুশি হতেন?

হিরণ্য ॥ রাজপুত্রের আর দশ জন রাজপুত্রের মতো আচরণ করাই তো উচিত। আচ্ছা, সে কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। তুমি গাঁজা

গুলি না খেয়ে দুটো ভগবানের নাম করো ক্ষতি কি! কিন্তু প্রকাশ্যে কেন? রাজপুত্রগণ তো প্রকাশ্যে বেলেল্লাপনা করে না—তুমিও না হয় গোপনেই ওসব কাজ করতে।

প্রহ্লাদ ॥ মদ্যপান আর নামগান দুই কি এক পর্যায়ের হ'ল?

হিরণ্য ॥ না, এক পর্যায়ের নয়। নামগান খানিকটা নীচের।

প্রহ্লাদ ॥ কি আশ্চর্য!

হিরণ্য ॥ তবে আবার বুঝিয়ে বলি। গোপনে নাম-গান চললেও চলতে পারে, কিন্তু প্রকাশ্যে অসম্ভব।

প্রহ্লাদ ॥ কেন?

হিরণ্য ॥ প্রজাপুঞ্জ সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে।

প্রহ্লাদ ॥ ক্ষতি কি?

হিরণ্য ॥ তাই যদি বুঝবে তবে আমার আজ এমন দুর্ভাগ্য হয়, রাজপুত্রকে রাজকর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হয়। তবে শোনো বালক, ভগবান মানলেই জীবন অত্যন্ত জটিল হ'য়ে ওঠে। তখনি সঙ্গে সঙ্গে আসে ন্যায়, ধর্ম, বিচার, বিবেক, শুভাশুভ, ভালো-মন্দ, ছোট-বড়, আরো অবান্তর কত যে কি তার ইয়ত্তা নেই।

প্রহ্লাদ ॥ সেটাই তো স্বাভাবিক, তাঁর শাসন ব্যাপক তো হবেই, তিনি যে রাজার রাজা।

হিরণ্য ॥ আরে বাপু, সেটা তো তোমার মতো অকালপক্ক ছোকরা ও হাড়-শুকনো, মাস-চিমড়ে বুনো ঋষিদের কল্পনা। এদিকে যার অস্তিত্বের জন্য প্রমাণ আবশ্যক হয় না সেই রাজার যে প্রাণান্ত!

প্রহ্লাদ ॥ কেন?

হিরণ্য ॥ কেন কি। আমার মতো ছোট রাজায় আর তোমার মতো বড় রাজায় লড়াই বেধে ওঠে।

প্রহ্লাদ ॥ তা যদি স্বীকার করেন, তবে তো বড় রাজার অস্তিত্ব প্রমাণ হয়ে যায়।

হিরণ্য ॥ প্রমাণ হয় তোমাদের মূঢ়তা। কারো যদি এমন অদ্ভুত ধারণা হয় যে পৃথিবীটা শূন্যে ঝুলছে অমনি কি প্রমাণ হ'য়ে যায় যে পৃথিবী সত্যই শূন্যে ঝুলছে, বাসুকির ফণার ওপরে নেই।

প্রহ্লাদ ॥ পিতা, আমি তো ভগবদ্‌-অস্তিত্বে আর রাজ-অস্তিত্বে বিরোধ দেখতে পাই নে।

হিরণ্য ॥ একজন মানুষ যদি দুই ভিন্ন রাজার আনুগত্য স্বীকার করে তবে কেমন হয়।

প্রহ্লাদ ॥ সেটা অসম্ভব, ওতে কাজ চলে না।

হিরণ্য ॥ রাজায় ও তোমার ভগবানেও ঠিক তেমনি বিরোধ। দ্বৈত আনুগত্য রাজার পরম শত্রু।

প্রহ্লাদ ॥ সে কেমন?

হিরণ্য ॥ বাপু হে, ভগবানও মানবে, রাজাও মানবে এমন হয় না।

প্রহ্লাদ ॥ না হবার কারণ?

হিরণ্য ॥ তাদের ধর্ম ভিন্ন, প্রকৃতি ভিন্ন, স্বভাব, দাবী, দায়িত্ব, সমস্তই ভিন্ন। তোমার তো সোজা কথা না বুঝবার মতো বুদ্ধির অভাব নেই। তাই আগে থেকেই বুঝিয়ে বলি। রাজা বলবেন এই কাজটি করো আমার আদেশ। যে-ব্যক্তি রাজা ছাড়া আর কিছু মানে না সে তৎক্ষণাৎ রাজাদেশ পালন করবে। আর যে মূঢ় ভগবান মানে, সে অমনি বিচার করতে বসবে এটা কি উচিত, এটা কি ন্যায়সঙ্গত, এটা কি ধর্মানুমোদিত? প্রথমে মনে হ'তে পারে—ঐ তো একটুখানি সূক্ষ্ম দ্বিধা! কিন্তু ঐ দ্বিধার ফাঁক দিয়েই যে বিদ্রোহের বন্যা মাথা গলাবার চেষ্টা করছে।

প্রহ্লাদ ॥ এ বড় নূতন কথা মহারাজ, সাধু সন্ত সন্ন্যাসীরা বিদ্রোহী।

হিরণ্য ॥ তারাই বিদ্রোহীর সেরা। অস্ত্র নিয়ে যারা রাজদ্রোহিতা করে তাদের পরাজিত করতে না পারলে দোষ ও দায়িত্ব রাজার কিন্তু যাদের ষড়যন্ত্র মন্ত্র নিয়ে আর মন নিয়ে তাদের দমিত করবার উপায় কি?

প্রহ্লাদ ॥ অস্ত্র।

হিরণ্য ॥ তোমাকে তো ঘাতকের হাতে দিয়েছিলাম।

প্রহ্লাদ ॥ অত্যাচার।

হিরণ্য ॥ তোমাকে তো হস্তীপদতলে ফেলে দিলাম।

প্রহ্লাদ ॥ কারাগার।

হিরণ্য ॥ তুমি তো কারাগারেও ছিলে।

প্রহ্লাদ ॥ অনাহার।

হিরণ্য ॥ তোমাকে তো অল্প সময় রাখি নি।

প্রহ্লাদ ॥ তবে কি উপায়?

হিরণ্য ॥ কোন উপায় নেই—আত্মসমর্পণ ছাড়া। শোনো বালক, পৃথিবীতে যত বিদ্রোহ ঘটেছে, যত সিংহাসন টলেছে, যত কারাগার খসেছে সব ঐ নামের জোরে, কখনো কৃষ্ণনাম, কখনো রামনাম, কখনো বা ঐ রকম অবান্তর আর একটা কিছু।

প্রহ্লাদ ॥ অস্ত্রের বিদ্রোহও তো কম ঘটে নি?

হিরণ্য ॥ সে-সব বিদ্রোহ সঙ্গে নিয়ে এসেছে উল্টো বিদ্রোহের বীজ, দশ হাত এগিয়ে গিয়ে কুড়ি হাত পিছিয়ে গিয়েছে। শোনো পুত্র, আমরা এমন বিশ পঁচিশ পুরুষের রাজা, নিজেও অনেকদিন রাজত্ব করছি, আমার অভিজ্ঞতা এই যে এ পর্যন্ত কোন রাজা, কোন সম্রাট্, কোন সেনাপতি, কোন মন্ত্রী, কোন স্বৈরতন্ত্রী ঐ নাম গানের প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারে নি। তাই মুখে তারা যতই দম্ভ করুক মনে মনে থাকে ভয়ে; নিজেদের যতই সুপ্রতিষ্ঠিত বলে তারা ভাব দেখাক আসলে তাঁরা রয়েছে বন্যার মুখে; শত লক্ষ কিরীচের দ্বারা সুরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তারা রয়েছে নিরস্ত্র নেংটিপরা একটা ফকিরের কৃপার উপরে; কম্পমান অশ্বত্থপত্রশীর্ষেও শিশিরবিন্দু এমন অসহায় নয়!

প্রহ্লাদ ॥ পিতা আপনি নিজেকে বৃথা অসহায় মনে করছেন।

হিরণ্য ॥ বৃথা!

প্রহ্লাদ ॥ কোথায় তাদের দুর্গ?

হিরণ্য ॥ দেশে যে লক্ষ লক্ষ মঠ মন্দির চৈত্য বিহার এগুলো তবে কি?

প্রহ্লাদ ॥ কোথায় তাদের অস্ত্র?

হিরণ্য ॥ যে অস্ত্র নিরাকার তার সংখ্যা গণনা করবে কে?

প্রহ্লাদ ॥ কোথায় তাদের সৈনিক?

হিরণ্য ॥ সাধু সন্ন্যাসী সন্ত মহাপুরুষ—এরা তবে কি? অধিক কথায় কাজ কি! প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে অজাত-সদ্যজাত অবস্থায় সৈনিকরা লালিত হয়ে উঠছে।

প্রহ্লাদ ॥ তবে ধ্বংস করুন তাদের।

হিরণ্য ॥ তাই করবো, কিন্তু তার আগে ধ্বংস করবো বিদ্রোহের সেই বীজটিকে আমার অভ্রভেদী রাজপ্রাসাদের চূড়ায় যা উড়িয়েছে ধর্মের ধ্বজা।

প্রহ্লাদ ॥ চেষ্টার তো ত্রুটি করেন নি।

হিরণ্য ॥ এবার আর পরোক্ষে নয়, স্বহস্তে।

প্রহ্লাদ ॥ আপনার মনে কি এতটুকু দয়ামায়া নেই?

হিরণ্য ॥ রাজনীতি নৈর্ব্যক্তিক, তাতে দয়াও যেমন নেই তেমনি নিষ্ঠুরতাও নেই। ঝড় বন্যা ভূকম্পন সদয়ও নয়, নিষ্ঠুরও নয়।

প্রহ্লাদ ॥ এ অদ্ভুত আপনার রাজনীতি ভগবানের বিরুদ্ধে।

হিরণ্য ॥ এইমাত্র তাকে রাজা ব'লে স্বীকার করেছ, তবে রাজনীতি শব্দটা অপ্রযোজ্য কেন? আর তিনিও তো নিষ্ক্রিয় নন, ধর্ম, নীতি, বিবেক, সত্য প্রভৃতির প্যাঁচ মেরে মানুষে মনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন আমার কবল থেকে তাঁর দিকে। নাও, প্রস্তুত হও।

প্রহ্লাদ ॥ ভগবদ্‌ভক্ত কখনোই অপ্রস্তুত নয়।

হিরণ্য ॥ আমার ভক্ত বিপন্ন হ'লে আমি রক্ষা ক'রে থাকি, আর তাঁর ভক্তকে রক্ষা করবেন কে?

প্রহ্লাদ ॥ তিনিই।

হিরণ্য ॥ কোথায় তাঁর সেপাই-শান্ত্রী?

প্রহ্লাদ ॥ ওইখানেই তো প্রভেদ আপনার সঙ্গে। আপনি পাঠান সেপাই-শান্ত্রী—আর তিনি আসেন স্বয়ং।

হিরণ্য ॥ কোথায় তিনি?

প্রহ্লাদ ॥ সর্বত্র।

হিরণ্য ॥ নমদা তার থেকে কঠিন শ্বেতমর্মর এনে এই যে অজেয় জয়স্তম্ভ নির্মাণ করেছি, তবে এর মধ্যেও তিনি আছেন?

প্রহ্লাদ ॥ এর চেয়েও কঠিন আপনার হৃদয়ের মধ্যেও তিনি আছেন।

হিরণ্য ॥ বটে, তবে তিনি তোকে রক্ষা করুন, এই অসি গ্রহণ করলাম।··· এ কি, এ কি···জয়স্তম্ভ নড়ে কেন, কাঁপে কেন, ফাটে কেন, ভাঙলো কেন? একি ভয়াল মূর্তি!

প্রহ্লাদ ॥ একি দয়াল মূর্তি !

হিরণ্য ॥ প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদ, পুত্র, আমি যে নিহত হলাম।

প্রহ্লাদ ॥ প্রভু, প্রভু, পিতাকে রক্ষা করুন।

নৃসিংহ ॥ রাজনীতিতে দয়াও নেই, নিষ্ঠুরতাও নেই, আছে শুধু নিষ্কাম কর্তব্য পালন।

যম ও কাক

রাবণের ভয়ে দেবগণ একবার ছদ্মবেশ ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন যমরাজ কাকের ছদ্মবেশে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যম কৃতজ্ঞতাবশে কাককে বরদানে উদ্যত হইলে নিম্নোক্তরূপ কথোপকথন হইয়াছিল বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

যম ॥ বৎস বায়স, তুমি বর প্রার্থনা করো।

কাক ॥ প্রভু, আমি কি এমন দৈব কার্য সম্পন্ন করেছি যাতে বর প্রার্থনার অধিকারী হলাম ?

যম ॥ তা বটে, তুমি তো অন্তর্যামী নও, এবং ঘটনাস্থলেও উপস্থিত ছিলে না, তোমার জানবার কথা নয় বটে।

কাক ॥ আমাকে সব নিবেদন করুন প্রভু।

যম ॥ নৃপতি মরুত্ত মাহেশ্বর যজ্ঞ করছিলেন, আমরা দেবতারা দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময়ে দুর্বৃত্ত রাবণ যজ্ঞনাশের আশায় এসে উপস্থিত হল। তখন যজ্ঞস্থলে যুদ্ধ ঘটলে জয় পরাজয় যাই হোক না কেন যজ্ঞনাশ হবে আশঙ্কায় আমরা তির্যগযোনিরূপে আত্মগোপন করলাম। ইন্দ্র হলেন ময়ূর, বরুণ হলেন হংস, কুবের হলেন কৃকলাস

আর আমি বায়স রূপ ধারণ করলাম। কাজেই আমি তোমার কাছে ঋণী।

কাক ॥ এ অতি সামান্য বিষয়, বিশেষ দেবগণ কামচর, ইচ্ছামাত্রে যে কোন রূপ গ্রহণ করতে পারেন, আমার কৃতিত্ব কোথায়?

যম ॥ বিষয় সামান্য নয়। মানীগণের মান প্রাণের চেয়েও মূল্যবান। সেই মানরক্ষা হ'ল তোমার দেহ ধারণে—কাজেই তুমি বর প্রার্থনার অধিকারী হয়েছ।

কাক ॥ ধর্মরাজ, আপনি যদি সত্যই সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে আমাকে অমরত্ব বর দান করুন।

যম ॥ অমরত্ব কেন চাও বৎস?

কাক ॥ প্রভু, রোগে শোকে অনাহারে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি-ভৌতিক ত্রিতাপে প্রাণিগণ নিত্য তোমার আলয়ে উপস্থিত হচ্ছে। ক্ষুদ্রায়ত জীবন, মৃত্যু নিশ্চিত, ত্রিতাপ নিত্য প্রবল, এমন অবস্থায় প্রাণিগণ সতত উদ্বিগ্ন, জীবনরস তার রসনায় কটুস্বাদ। অমরত্বই তার একমাত্র প্রতিকার।

যম ॥ তোমার অভিমত মিথ্যা নয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি অমরত্বলাভ করলেই প্রাণিগণ সুখী হবে?

কাক ॥ দেবগণ কি সুখী নয়?

যম ॥ না, তারা অমর কিন্তু সুখী নয়?

কাক ॥ সে কি কথা প্রভু?

যম ॥ দৈত্য ভয়ে তারা ভীত,বারংবার দৈত্যগণ কর্তৃক স্বর্গ থেকে বিতাড়িত। দীর্ঘকাল তারা কাটিয়েছে প্রচ্ছন্নরূপে, ছদ্মবেশে, পাতালে এবং ভূতলে। অমরতাই যদি সুখের নিধি হবে তবে কেন আমরা তির্যক-যোনিরূপ গ্রহণ করতে গেলাম? রাবণের হাতে প্রাণনাশের আশঙ্কা তো ছিল না?

কাক ॥ সে তো আপনিই বলেছেন মান নাশ।

যম ॥ তবেই দেখো অমর হলেই মান নাশের ভয় যায় না।

কাক ॥ সামান্য কাকের আবার মান!

যম ॥ সামান্যতর কুলীর কর্তৃক আক্রান্ত হ'লে কাক তবে কেন লড়াই করে প্রাণনাশের আশঙ্কা অবশ্যই থাকে না।

কাক ॥ স্বীকার করলাম অমর হলেই সকল আশঙ্কার কারণ দূরীভূত হয় না কিন্তু তাই বলে অমরত্ব অবাঞ্ছিত মনে করবার হেতু নেই।

যম ॥ হয় তো তা-ও আছে।

কাক ॥ এ কথা দেবতার মনে হওয়ার হেতু ?

যম ॥ দেবগণ অমর না হলে বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ হয় তো সুষ্ঠুতর হত।

কাক ॥ এ কি অশাস্ত্রীয় কথা ?

যম ॥ অশাস্ত্রীয় তথাপি অবাস্তব নয়, বিশ্বপথ ও শাস্ত্রপথ তির্যগগতি।

কাক ॥ ধর্মরাজ, আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি বিশদ করে বলুন।

যম ॥ দেবগণ মৃত্যুর বশীভূত হলে মুমূর্ষু প্রাণিগণের দুঃখ বুঝতে সক্ষম হতেন।

কাক ॥ এখন কি অক্ষম ?

যম ॥ আরো অধিক বুঝতেন, সমবেদনার সমব্যাপকতাই কাম্য, আংশিক মনবেদনার মূল্য কি ?

কাক ॥ প্রভু, অজ্ঞের প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করবেন, কিন্তু বিশ্ববিধাতার এই মৌলিক ত্রুটি নিরাকরণের উপায় কি নেই।

যম ॥ কি উপায় বলো ?

কাক ॥ প্রাণিগণকেও অমরত্ব দান। দেবগণ ও প্রাণিগণ সকলে অমর হলে মন-বেদনার সমব্যাপকতা ঘটবে।

যম ॥ তখন অবস্থা হবে আরো শোচনীয়।

কাক ॥ কেন ?

যম ॥ সমবেদনার সমূলে বিসর্জন হবে।

কাক ॥ কেন ?

যম ॥ কেউ কারো দুঃখ বুঝবে না। স্বর্গলোকে আর সবই আছে, সমব্যথী নেই, সেখানে সবাই উদাসীন।

কাক ॥ কি আশ্চর্য।

যম ॥ আশ্চর্য নয়—এই স্বাভাবিক।

কাক ॥ কেন এমন হয় স্বর্গে ?

যম ॥ মৃত্যুর অদৃশ্য আশঙ্কাসূত্র প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীকে যুক্ত করে রেখেছে বেদনার বন্ধনে। সে সূত্রের যে অভাব স্বর্গলোকে।

কাক ॥ স্বর্গ তবে শুধু দূর থেকেই মনোরম !

যম ॥ স্বর্গ ছুটির দিনের অপরাহ্ণের মতো ক্লান্ত অবসাদে পূর্ণ।

কাক ॥ আর পৃথিবী ?

যম ॥ ছুটির আগের দিনের অপরাহ্ণের মতো প্রত্যাশাময় সম্ভাবনায় পূর্ণ।

কাক ॥ এই প্রভেদের কারণ কি একস্থানে মৃত্যু নেই, অপর স্থানে মৃত্যু আছে —এইটুকু মাত্র !

যম ॥ এইটুকু নয়—এই হচ্ছে সব, এর বেশি আর কিছু সম্ভব নয়।

কাক ॥ তবে মৃত্যুতে প্রাণীর ভয় কেন ?

যম ॥ রাজদণ্ডে মানুষের ভয় কেন ?

কাক ॥ কার উপরে কখন পতিত হবে কেউ জানে না।

যম ॥ মৃত্যু রাজদণ্ডের মতো অনিশ্চিত।

কাক ॥ মৃত্যু অনিশ্চিত ! মৃত্যুর চেয়ে সুনিশ্চিত আর কি হতে পারে ?

যম ॥ সুনিশ্চিত যখন অনিশ্চিত হয়, তখনই তো যথার্থ ভয়াবহ হয়ে ওঠে, বৎস, সকলেই যদি আয়ুর শতকপূর্ণ করে মরতো, তবে কি মৃত্যু ভয়ঙ্কর হত ? ও কখন আসবে কেউ জানে না বলেই—

কাক ॥ কম্পমান—

যম ॥ প্রিয়জনের বাহু বন্ধনে।

কাক ॥ কিন্তু সেও কি কম্পমান নয় ?

যম ॥ তাতেই তো মাধুর্য, পরস্পরের চিত্তদোলায় পরস্পরে দোদুল্যমান। বৎস, চঞ্চল জীবনের দোলা দৃঢ়গ্রন্থিতে বদ্ধ অচঞ্চল শাখায়।

কাক ॥ কি সেই অচঞ্চল শাখা ?

যম ॥ প্রেম। বৎস, বিধাতা মানুষকে অমরতা দেন নি; তার বদলে দিয়েছিলেন প্রেম।

কাক ॥ আর দেবতাকে ?

যম ॥ প্রেমের বদলে দিয়েছেন অমরত্ব।

কাক ॥ কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ ?

যম ॥ জিজ্ঞাসা করো অমরত্বের চিরনির্বাসিত বন্দীকে, জিজ্ঞাসা করো প্রত্যেক দেবতাকে !

কাক ॥ কি বলবে তারা ?

যম ॥ পড়ো নি পুরাণে? দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে নলের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেবগণের আবির্ভাবের কাহিনী!

কাক ॥ কিন্তু স্বর্গে তো রয়েছে মেনকা, উর্বশী, রম্ভা—

যম ॥ হায়, হায়, ওরা অমরী হ'লেও নারী, ওদের মতো প্রেমের কাঙাল আর কে? বারে বারে ওরা ধরা দিয়েছে পুরূরবা, বিশ্বামিত্রের কাছে, লাঞ্ছিত ধিক্কৃত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে অর্জুনের কাছে। কেন? না, মুমূর্ষু মানবহৃদয়ের এতটুকু স্পর্শ চায়! আমার কি মনে হয় বৎস জানো, স্বর্গের সুধার ভাণ্ড ভিতরে ভিতরে বিষিয়ে উঠেছে মৃত্যুর লালসায়! দেখনি সুধাকরের কলাবিপর্যয়! বারে বারে অমাবস্যার অতল কালো জলধিতে নিমজ্জন! নিশ্চয় জেনো কৃষ্ণা তিথির কলামাত্র সহায় মুমূর্ষু চাঁদ অনেক বেশি সুখী পূর্ণিমার রূপডম্বর পূর্ণতার চেয়ে! কেন জানো, ও যে সুধাকর, সুধার শাপে বিষিয়ে উঠেছে ওর জীবন, দুই হাতে কলা উন্মোচন করে ছড়াতে ছড়াতে পাগলের মতো মরীয়া হয়ে ও ছুটেছে অমাবস্যার নশ্বরতার মুখে। অমরত্বে সুখ নেই বৎস, সুখ প্রেমে।

কাক ॥ কিন্তু জীবন যে ক্ষণস্থায়ী!

যম ॥ তাতেই বাড়ে প্রেমের মহার্ঘতা।

কাক ॥ ক্ষণস্থায়ী জীবনে চিরস্থায়ী প্রেম। বিচিত্র।

যম ॥ চুম্বন ক্ষণিক বলেই তা অমূল্য। চিরস্থায়ী আলিঙ্গন তো নাগপাশ!

কাক ॥ হায়, পর্ণপুটে স্বর্গের দিব্যমধু নিয়ে কি করবো?

যম ॥ পান করো।

কাক ॥ কতক্ষণ?

যম ॥ যতক্ষণ জীবন থাকে। কাজেই বৎস, অন্য বর প্রার্থনা করো। তোমাকে যে অমরত্ব দান করলাম না তাতে আমাকে নিষ্ঠুর মনে করো না, মনে কোরো যে আমি তোমার প্রতি সদয়। অমর হলে অত্যন্ত প্রিয়জনের মুখেও মানুষ একবারের অধিক তাকিয়ে দেখতো না, দৃষ্টির জরা বিশ্ব থেকে সৌন্দর্য, মানুষের জীবন থেকে প্রেম ও আপনার মন থেকে আনন্দ শোষণ করে নিত। মরুভূমির রুক্ষ

পাহাড়টার মতো মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতো নিরানন্দ, নিষ্প্রেম সৌন্দর্যহীন বিশ্বে। অন্য বর প্রার্থনা করো বৎস।

কাক ॥ অমরতার বিকল্প যদি কিছু থাকে তবে তাই দান করো আমাকে প্রভু।

যম ॥ উত্তম। তুমি নিরাময়, নীরোগ জীবন লাভ করবে, আর মানুষের হাতে নিহত না হলে কখনো মরবে না।

কাক ॥ প্রভু, এর চেয়ে বেশি আর কি প্রার্থনা করতে পারি! নামান্তরে ও তো অমরতাই হল। মানুষে খামোকা আমাকে মারতে যাবে কেন?

যম ॥ বৎস, তোমার কাছে আমি উপকৃত, কোন মিথ্যা মোহ তোমাকে পেয়ে বসুক তা আমার অভিপ্রেত নয়।

কাক ॥ হঠাৎ এ কথা উঠল কেন দেব?

যম ॥ তুমি না বললে যে মানুষে খামোকা আমাকে মারতে যাবে কেন?

কাক ॥ সত্যই তো, মানুষে অকারণে আমাকে মারবে কেন?

যম ॥ মানুষ সম্বন্ধে কোন মোহ রেখো না মনের মধ্যে।

কাক ॥ মানুষ সম্বন্ধে এ সতর্কবাণীর অর্থ!

যম ॥ মানুষের সঙ্গে আচরণ ক'রে দেখো! বিস্তারিত এখন বললে উপন্যাস মনে হবে—ক্রমে বুঝতে পারবে! কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা সত্য যে, অন্যান্য জীবের তুলনায় তোমার জীবন দীর্ঘ ও অনেক বেশি নিরাপদ হবে। অমরতার দিকে ঐটুকুই অগ্রসর হওয়া সম্ভব—আর ঐটুকু অগ্রসর হওয়াই নিরাপদ।

কাক ॥ প্রভু আমি কৃতার্থ, আমার প্রণিপাত গ্রহণ করো।

রামচন্দ্র ও জাবালি

পিতৃসত্য রক্ষার্থ বনগমনকালে রামচন্দ্রের সঙ্গে জাবালি ঋষির সাক্ষাৎকার ঘটে। জাবালি পিতৃসত্য রক্ষার্থ বনগমনের অসার্থকতা ঘোষণা করিলে রামচন্দ্র ও তাঁহার মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত হয়। বাল্মীকি রামচন্দ্রকে Idealist বা আদর্শবাদী এবং জাবালিকে Skeptic বা সংশয়বাদীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। এখানেও সেই ধারা অনুসৃত হইয়াছে।

জাবালি ॥ রামচন্দ্র, ভরত, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গিয়েছেন, এবারে তোমাকে একটা কথা বলি।

রামচন্দ্র ॥ বলুন ঋষিবর।

জাবালি ॥ রামচন্দ্র, তুমি একটা আস্ত গর্দভ।

রামচন্দ্র ॥ আস্ত কি প্রভু ?

জাবালি ॥ আস্ত গর্দভ।

রামচন্দ্র ॥ গর্দভ ? এমন কথা আগে আমাকে কেউ বলে নি।

জাবালি ॥ তাতেই তো তুমি মরেছ।

রামচন্দ্র ॥ কেন এমন আশ্চর্য অভিধা আমার প্রতি প্রযোগ করলেন ?

জাবালি ॥ অবশ্যই তা বলব। প্রথমে দেখো গর্দভ অযথা ভারবাহী, গর্দভ নির্বোধ, গর্দভ আত্মরক্ষায় অক্ষম, গর্দভ অপরের বাক্যে চালিত হয়।

রামচন্দ্র ॥ আপনি কি বলতে চান, এই সব গুণ আমার চরিত্রে আছে ?

জাবালি ॥ তোমার কি মনে হয় না ?

রামচন্দ্র ॥ আমি অবশ্য সামান্য ব্যক্তি, কিন্তু এরূপ হীন নই।

জাবালি ॥ বেশ, তবে সেই আলোচনাই করা যাক। তুমি বনে চলেছ কেন ?

রামচন্দ্র ॥ আপনি তো জানেন প্রভু, পিতৃসত্য রক্ষা করবার জন্যে।

জাবালি ॥ পিতৃসত্য! উত্তম। এবারে বিচার করা যাক, পিতাই বা কে আর সত্যই বা কি ?

রামচন্দ্র ॥ পিতা জন্মদাতা।

জাবালি ॥ আর সত্য ?

রামচন্দ্র ॥ বস্তু বা ঘটনার অন্তর্নিহিত স্থায়ী রূপ।

জাবালি ॥ গর্দভের যোগ্য উত্তর হয়েছে বটে।

রামচন্দ্র ॥ কেন ?

জাবালি ॥ প্রত্যেক জীবেরই একজন জন্মদাতা আছে, এ তো একটি নৈসর্গিক ব্যাপার। কিন্তু জন্মদাতা ও জন্মগ্রহীতার অর্থাৎ পিতা ও পুত্রের মধ্যে যে সম্বন্ধের কল্পনা করছ তা অনৈসর্গিক বা কল্পনা মাত্র।

রামচন্দ্র ॥ সংসারে বাস্তব আর কতটুকু! অধিকাংশই তো কল্পনা, পৃথিবীর এক পাদকে বেষ্টন ক'রে যেমন রয়েছে ত্রিপাদ জলময় সমুদ্র।

জাবালি। কিন্তু ভুলে যাও কেন যে, ঐ একপাদ ভূমিটুকুই মানুষের পরম আশ্রয়। আর তা ছাড়া সৃষ্টি মানেই হচ্ছে সমুদ্রগর্ভ থেকে ভূমির উদ্ভব।

রামচন্দ্র ॥ তাই ব'লে সমুদ্র তো মায়াময় নয়।

জাবালি ॥ কে বলেছে মায়াময়! আমি বলছি ঐ মায়ার সার্থকতা বাসযোগ্য ভূমির জন্মদানে। অনৈসর্গিক থেকে নৈসর্গিকের, কল্পনা থেকে বাস্তবের সৃষ্টি হচ্ছে। আর তুমি সেই বাস্তবকেই অবহেলা করছ!

রামচন্দ্র ॥ আপনি চান যে আমি কল্পনাকে অবহেলা করব ?

জাবালি ॥ আমি চাই যে তুমি বাস্তবের যথাযোগ্য মূল্য দেবে।

রামচন্দ্র ॥ অর্থাৎ ?

জাবালি ॥ অর্থাৎ জন্মদাতাকে পিতা বলে যদি স্বীকার করতে চাও করো, কিন্তু তাকে সম্মান দেখাবার জন্যে চাল-চুলো ছেড়ে বনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

রামচন্দ্র ॥ কিন্তু সত্যরক্ষা ?

জাবালি ॥ গর্দভ আর কাকে বলে ? যা নেই, তাকে রক্ষা করবে কি ভাবে ?

রামচন্দ্র। সত্য নেই ? তত্ত্বজ্ঞেরা বলে থাকেন, একমাত্র সত্যই আছে।

জাবালি ॥ আচ্ছা, সেই তত্ত্বজ্ঞেরাই কি বলেন না যে, জগৎ অনিত্য ?

রামচন্দ্র ॥ বলেন বটে।

জাবালি ॥ জগৎ যদি অনিত্য অর্থাৎ পরিবর্তনধর্মী হয়, তবে তোমার সত্যও পরিবর্তনধর্মী। এমন বস্তুকে সত্য বলো কিরূপে ?

রামচন্দ্র ॥ জগৎ পরিবর্তনধর্মী বটে, কিন্তু সত্য সমস্ত পরিবর্তনের উর্ধ্বে।

জাবালি ॥ তা হ'লে তোমার সত্য পরিবর্তনের উর্ধ্বে?

রামচন্দ্র ॥ এ কথা শাস্ত্রসম্মত। জগৎ যেন ফুল, সত্য যেন বৃন্ত।

জাবালি ॥ উত্তম বলেছ। কুঁড়ি ফুল হচ্ছে, ফুল ফল হচ্ছে, ফল শুকিয়ে ঝরে পড়ছে—এই ক্রিয়াকেই তো লোকে বলে পরিবর্তন।

রামচন্দ্র । যথার্থ বলেছেন।

জাবালি ॥ কিন্তু বাপু, চির নবীন ও অপরিবর্তিত থেকে যাচ্ছে এমন বৃন্ত একটি দেখিয়ে দাও তো।

রামচন্দ্র ॥ আপনি বলতে চান যে সত্যও পরিবর্তনের অধীন?

জাবালি ॥ সে তোমার সত্যের ইচ্ছা। সত্যের যদি পরিবর্তনশীল জগতে থাকবার ইচ্ছা হয়ে থাকে তবে তাকে জগতের নিয়মের অধীন হয়েই থাকতে হবে।

রামচন্দ্র । আর ধরুন, সত্য যদি জগতের উর্ধ্বে ও অতীত হয়?

জাবালি ॥ তবে তেমন সত্যের প্রয়োজনও নেই, প্রমাণও নেই।

রামচন্দ্র ॥ আর যদি সত্য জগতের নিয়মাধীন হয়?

জাবালি ॥ তবে তোমার সত্য সম্পর্কিত সংজ্ঞার পরিবর্তন আবশ্যক। জগৎও বদলাচ্ছে, সেই সঙ্গে সত্যও বদলাচ্ছে। কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতো।

রামচন্দ্র । বুঝিয়ে দিন।

জাবালি ॥ এই ধরো যেমন তোমার পিতা তোমার বিমাতা কৈকেয়ীকে এক সময়ে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। সেদিন সেই মুহূর্তে সেটা সত্য ছিল। কিন্তু তার পরে বহুকাল গত হয়েছে, ইতিমধ্যে জগতের অনেক পরিবর্তন হয়েছে আর সেই সঙ্গে জগতের নিয়মাধীন সত্যেরও অবশ্য বদল হয়েছে। আজ তুমি কোন্ ভূতের বেগার খাটবার জন্যে বনে রওনা হয়েছ?

রামচন্দ্র ॥ ঋষিবর, আপনি যদি ভেবে থাকেন যে আপনার কথায় মতি পরিবর্তন করে আমি অযোধ্যায় ফিরে যাবো তা হলে ভুল করবেন।

জাবালি ॥ নইলে আর গর্দভ বলেছি কেন?

রামচন্দ্র ॥ আমি যদি পিতৃসত্য লঙ্ঘন করি তবে পরলোকে নিরয়গামী হব।

জাবালি ॥ যদি পরলোক থাকে।

রামচন্দ্র ॥ পরলোক নেই? তবে লোকে যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ত্যাগ প্রভৃতি করে কেন?

জাবালি ॥ লোকে অন্ধকারে রজ্জু দেখে ভয়ে চীৎকার করে ওঠে কেন?

রামচন্দ্র ॥ তার মূলে লোকের মনে সর্পের সংস্কার বর্তমান।

জাবালি ॥ এখানেও সংস্কার বর্তমান।

রামচন্দ্র ॥ কি সেটা?

জাবালি ॥ অযথা ঐহিক। আত্মনিরোধজনিত ব্যর্থতাবোধ।

রামচন্দ্র ॥ আর একটু বুঝিয়ে বলুন।

জাবালি ॥ একেবারেই গর্দভ! আচ্ছা শোন। যে এখানে খেতে পায় না, সে ভাবছে কৃচ্ছ্রসাধন করতে পারলে পরলোকে গিয়ে পেট ভ'রে খেতে পাবে। যে ভোগ করতে পারছে না, সে ভাবছে এখানে ব্রহ্মচর্য সাধন করতে পারলে ওখানে গিয়ে উর্বশী ঘৃতাচী রম্ভা নিয়ে ফুর্তি করতে পারবে। এই রকম চলছে।

রামচন্দ্র ॥ এ রকম চলবার মূলে আছে অযথা আত্মনিরোধের সংস্কার?

জাবালি ॥ তা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইন্দ্রিয় হচ্ছে মনুষ্যজীবনের সার্থকতা-লাভের মূলধন। কিন্তু মানুষ এমনি মূঢ় যে তার ব্যবহার করতে জানে না, ফলে দেউলে হয়ে যখন মারা পড়ে তথম মূলধনে মরচে পড়ে গিয়েছে।

রামচন্দ্র ॥ তবে জীবনের উদ্দেশ্য কি?

জাবালি ॥ সে আলোচনা আর একদিন হবে। এখন এইটুকু জেনে রাখো যে জীবনের নিতান্তই যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে তবে তা জীবনের মধ্যেই আছে, কোন অবাস্তব পরলোকের অসম্ভব শাখায় তা ঝুলে নেই।

রামচন্দ্র ॥ তবে দান, যজ্ঞ, ত্যাগ প্রভৃতি নিরর্থক?

জাবালি ॥ একটা লৌকিক সার্থকতা থাকা অসম্ভব নয়।

রামচন্দ্র ॥ কেমন?

জাবালি ॥ ওগুলো ধনবণ্টনের উপায়। ধরো তোমার নগরের গোয়ালাদের

প্রচুর ঘি উৎপন্ন করছে। তোমার প্রচুর টাকা আছে। তুমি যজ্ঞোপলক্ষ্যে সেই ঘি কিনে নিলে। গোয়ালারা দাম পেলো, ব্রাহ্মণেরা ঘিয়ের কিছু ভাগ পেলো, আর তুমিও মনে মনে তথাকথিত এক প্রকার শান্তি পেলে। ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, গোধন, বস্ত্র, তৈজস, শস্য প্রভৃতি যে সব বস্তু যজ্ঞাদি উপলক্ষ্যে উৎসর্গ করবার বিধি সমস্তই ধনবণ্টনের নিয়মসঙ্গত। এখন তুমি যদি প্রচুর ঘি না কেনো, তবে গোয়ালারা আর ঘৃত উৎপন্ন করবে না, ঘৃত উৎপন্ন করা ছেড়ে দিলে গোধনের আর তেমন আদর থাকবে না, গোধনের অনাদর হ'লে কৃষিকার্যের অবনতি অনিবার্য। আর যেহেতু আর্য সমাজ মূলতঃ কৃষক সমাজ, সেই জন্যেই গোজাত দ্রব্যাদি শাস্ত্রীয় কার্যের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেওয়া হয়েছে। এখন বুঝেছ বৎস যে, যজ্ঞের সঙ্গে পরলোকের সম্বন্ধ নিতান্তই কাল্পনিক, যা বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ তা হচ্ছে ঐহিক উন্নতি।

রামচন্দ্র ॥ এ কথা নূতন বটে। তা হ'লে আপনার মতে পিতাও নেই, সত্যও নেই, পরলোকও নেই। তবে আছে কি ?

জাবালি ॥ তুমি আছ, আমি আছি, যা প্রত্যক্ষ, যা বাস্তব, যা ইন্দ্রিয়গোচর মাত্র তাই-ই আছে।

রামচন্দ্র ॥ আমি এই মাত্র পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করলাম। তবে সেটাও নিরর্থক ?

জাবালি ॥ নিশ্চয়। মরা গরুতে কখনও ঘাস খায় ?

রামচন্দ্র ॥ শাস্ত্র ?

জাবালি ॥ চতুর ব্রাহ্মণেরা স্বার্থসিদ্ধির আশায় ও-সব রচনা করেছে।

রামচন্দ্র ॥ বেদ ?

জাবালি ॥ সোমপায়ীদের প্রলাপ।

রামচন্দ্র ॥ ঈশ্বর ?

জাবালি ॥ এবারে হাসালে। শাস্ত্র, সত্য, বেদ, পরলোক, দান ধ্যান তপস্যা, যজ্ঞ প্রভৃতি হচ্ছে ঈশ্বর-অস্তিত্বের বনিয়াদ, এখন বনিয়াদটা যদি মিথ্যা হয় তবে অট্টালিকার অস্তিত্ব আর সম্ভব হয় কি ক'রে ?

রামচন্দ্র ॥ আপনি বেদবিরোধী এবং নাস্তিক।

জাবালি ॥ তা হ'তে পারে, তুমি বাপু গর্দভ। নইলে এতক্ষণ মৃত পিতাকে

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বিমাতাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে আর ভরতকে কারাগারে নিক্ষেপ ক'রে সিংহাসনে গিয়ে বসতে।

রামচন্দ্র ॥ এমন পাপবাক্য শ্রবণ করাও পাপ।

জাবালি ॥ পাপ ? পাপ পুণ্যের অপেক্ষা রাখে, পুণ্যটা কি বোঝাও দেখি ?

রামচন্দ্র ॥ যা ধর্মসঙ্গত।

জাবালি ॥ বেদ না থাকলে ধর্ম থাকে কি ক'রে ?

রামচন্দ্র ॥ যা বিবেকসঙ্গত।

জাবালি ॥ একের বিবেক অপরের বিবেক থেকে ভিন্ন হতে পারে। এই তো তোমার বিবেক বলছে, বনে গিয়ে শুকিয়ে মরাই ধর্ম। আমার বিবেক বলছে, বৃদ্ধ লম্পট দশরথ নিতান্ত কামাতুর অবস্থায় পত্নীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। এখন কার বিবেকের ইঙ্গিত শুনবে ?

রামচন্দ্র ॥ আমি অবহিত হচ্ছি, জগৎ সম্বন্ধে আপনার ধারণা বিবৃত করুন।

জাবালি ॥ তবে শোনো—জগতে শাশ্বত বা স্থির কিছু থাকতে পারে, তাকেই বোধ করি তোমরা সত্য বলো, এমন কল্পনা করেছে সেই সব অর্ধ-সত্য মানুষ যাদের ধারণা ছিল জগৎ চিরকালের জন্য নিশ্চিতভাবে, অপরিবর্তনীয়ভাবে স্থষ্টি হয়ে গিয়েছে। জগৎ ব্যাপার যদি স্থির থাকে তবে তার মধ্যে শাশ্বত বা স্থির কিছু থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু যেখানে জগৎ প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে, পরিবর্ধিত হচ্ছে, প্রগত হচ্ছে, সেখানে স্থির কিছু থাকে কি ক'রে ? স্রোত যদি চঞ্চল হয়, তবে তার উপরে ভাসমান খড়কুটোও চঞ্চল হতে বাধ্য।

রামচন্দ্র ॥ কিন্তু স্রোত চঞ্চল ব'লেই তো নদী চঞ্চল নয়, এই মুহূর্তের জল-গণ্ডুষ স্রোতের টানে বিলীন হয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু তাই ব'লে সমস্ত নদীটাও তো পিছু পিছু ছুটে চলে নি। আজকের নদী আগামী কাল এখানেই থাকবে। সরযূ নদী কি মহারাজ ইক্ষ্বাকুর সময়ে আর কোথাও ছিল ?

জাবালি ॥ নদীটা আর কোথাও অন্তর্হিত হয় নি সত্য, কিন্তু তার আপেক্ষিক স্থানের পরিবর্তন হয়েছে, যেমন ধাবমান ব্যক্তির গায়ে যদি একটা তিল থাকে, সে তিল দেহের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করে না

বটে, কিন্তু দেহটা স্থান পরিবর্তন করবার ফলে তিলের স্থান পরিবর্তিত হয়েছে বললে ভুল হবে না।

রামচন্দ্র ॥ আপনি বলতে চান, চঞ্চলতাই জগতের ধর্ম ?

জাবালি ॥ ওভাবে বললে কম ক'রে বলা হবে। আমি বলতে চাই একটা প্রকারহীন উৎস-উদ্দেশ্যহীন চঞ্চলতার মানার নামই জগৎ। এখন এহেন জগতে সত্য ব'লে যদি কিছু থাকে তবে সেটাও চঞ্চল হতে বাধ্য। আর শুধু তাই নয়, যেহেতু জগৎ নিয়ত বিবর্তমান, সত্যও বিবর্তিত হচ্ছে। আবার যেহেতু জগৎ নিত্য প্রগত ও পূর্ণতর হচ্ছে, সত্যেরও নিত্য প্রগতি ও পূর্ণতা হচ্ছে। এখন এমন লক্ষণযুক্ত সত্যকে শাশ্বত বলবে কিনা সে তোমার বিচার্য বিষয়।

রামচন্দ্র ॥ আপনি যা বললেন তা ঠিক। আমার সত্য অনাদি এবং অনন্ত, তাতে চঞ্চলতা নেই, বিকার নেই, পরিবর্তনের পক্ষে তা অসূচীভেদ্য—আর তা পূর্ণতার স্বরূপ।

জাবালি ॥ অনাদি অনন্ত ব'লে কিছু থাকতে পারে না।

রামচন্দ্র ॥ কিন্তু আপনি এখনই তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

জাবালি ॥ কেমন ?

রামচন্দ্র ॥ আপনি বলেছেন, জগৎপ্রবাহের ধর্ম প্রগতি এবং তার উৎস ও উদ্দেশ্য নেই। বেশ। এখন জগৎপ্রবাহের কোন উদ্দেশ্য অর্থাৎ লক্ষ্য যদি না থাকে তবে তার গতিরও অন্ত থাকে না। এই তো অনন্ত এসে পড়ল। আর অনন্ত স্বীকার করলেই অনাদিত্বও স্বীকার করতে হয়। আবার যদি অনাদি ও অনন্তের দায় এড়াবার জন্যে স্বীকার করেন যে, জগৎব্যাপার উৎস ও উদ্দেশ্য-সমন্বিত, তা হ'লে কি দাঁড়ায় দেখা যাক। যে বস্তুর উৎস ও উদ্দেশ্য আছে তা সসীম হতে বাধ্য এবং যা সসীম তার পূর্ণতাও অনিবার্য। এখন জগৎব্যাপারকে যদি উৎসউদ্দেশ্যহীন মনে করেন তা হ'লেও অনাদি-অনন্ত এসে পড়ে, সেই সঙ্গে আসে সত্য। আর যদি জগৎব্যাপারকে উৎস-উদ্দেশ্যসমন্বিত মনে করেন তা হ'লেও পূর্ণতা এসে পড়ে, সেই সঙ্গে আসে সত্য।

মোট কথা, আপনি যে পথ দিয়েই এগোন কোন না কোন সময়ে সত্যের মুখোমুখি গিয়ে পড়তে হবে। জগতে যা সবচেয়ে নিশ্চিত তার হাত এড়াবেন কি উপায়ে?

জাবালি ॥ গর্দভ, আমি সত্যের মুখোমুখি হই বা না হই, তুমি বনে গিয়ে কোন্ দিন রাক্ষসের মুখোমুখি নিশ্চয় হবে। জগতে সবচেয়ে কি নিশ্চিত জানি নে, অরণ্যে সবচেয়ে নিশ্চিত শ্বাপদ এবং রাক্ষস। কোন্‌দিন একটা কেঁদো বাঘে তোমাকে নিহত করবে, কোন্ দিন বিকট এক রাক্ষসে সীতাকে হরণ করবে আর ঐ যে যুবতীপত্নী পরিত্যাগকারী ভাই লক্ষ্মণ ওখানে ব'সে মনে মনে আমার মুণ্ডপাত করছে, সে বনে বনে 'কোথায় দাদা, কোথায় বউঠাকুরাণী' ব'লে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াবে। এই হচ্ছে তোমার সত্যরক্ষার পরিণাম।

রামচন্দ্র ॥ যদি বা তাই হয়, তবু ইতিহাসে আমাদের নাম কীর্তিত হবে।

জাবালি ॥ মূর্খ আর কাকে বলে? খানকতক শুকনো ভূর্জপাতায় কালির আঁচড়ে নাম লিখিত হবার ব্যর্থ আশায় এমন কষ্টভোগ করতে যাচ্ছ?

রামচন্দ্র ॥ ব্যর্থ আশা কেন বললেন?

জাবালি ॥ কি ক'রে নিশ্চয় জানলে যে ইতিহাসের পাতায় তোমরা স্থান পাবে?

রামচন্দ্র ॥ পাব না এমন আশঙ্কারই বা কারণ কি?

জাবালি ॥ প্রগত জগতের ইতিহাস প্রগত পদ্ধতিতেই লিখিত হয়ে থাকে, খুব সম্ভব সে পদ্ধতি তোমার তথাকথিত কীর্তির অনুকূল নয়।

রামচন্দ্র ॥ ইতিহাস রচনায় আবার প্রগত পদ্ধতি কি?

জাবালি ॥ তোমাকে দেখছি সব কথাই অ আ থেকে বোঝাতে হয়। ছেলেবেলায় কি পাঠশালায় যাও নি, না সে সময়টা দণ্ডগোলক খেলে কাটিয়েছ? মন দিয়ে শোনো, এ খুব দুরূহ তত্ত্ব।

সরযূ নদীর দৃষ্টান্ত নিয়েই আলোচনা করা যাক। সরযূ নদীর স্রোত দক্ষিণবাহী, কিন্তু নদীর মাঝে মাঝে ছোট বড় আবর্ত দেখতে পাবে যার গতি বিপরীতমুখী। কিন্তু তাদের বিপরীত-

ক্ষুথিতার ফলে নদীর স্রোত কি বিপরীত গতি অবলম্বন করছে, না, আবর্তগুলোই স্থায়িত্বলাভ করছে? নদী যেমন চলছিল চলছে, আবর্তগুলো ক্ষণকালের প্রগতি-বিরোধিতার লীলা সাঙ্গ ক'রে জলের বুদ্বুদ জলে মিশিয়ে যাচ্ছে। তা-ই না কি? এখন ইতিহাসের ধারাতেও এমনিতর সব লীলা দেখতে পাবে, যার মূলে রয়েছে অপপ্রগতি। এবারে তুমিই বল যে-ব্যক্তি ইতিহাস লিখতে বসেছে অর্থাৎ মূলধারার গতি বর্ণনা করতে বসেছে তার কর্তব্য কি? ইতিহাস রচনার আসল রহস্য তো ওখানেই, বেছে বেছে প্রগতি-বিরোধী অংশগুলোকে বর্জন করায়। আর যে ব্যক্তি এ কাজ নিপুণভাবে সম্পন্ন করতে পারে তাকেই বলি প্রতিভাবান ঐতিহাসিক।

রামচন্দ্র ॥ এবারে প্রগতি-বিরোধী দু'চারটে ঘটনার উদাহরণ দিন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যা স্থান পাবে না।

জাবালি ॥ উত্তম। তোমাকে দিয়েই সুরু করা যাক। তোমার এই কাণ্ডটি যার এমন গৌরব এখন তুমি করছ, এটি ইতিহাস থেকে বাদ পড়ে যাবে। তবে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের কয়েকটি কীর্তি কালির আঁচড়ে টিকে যাবে বটে!

রামচন্দ্র ॥ সেগুলো কি?

জাবালি ॥ বালীবধ, শম্বুকবধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি। এ সব ঘটনা তোমার জীবনে এখনো অঘটিত, কিন্তু ঘটবে। আবার দেখ, দ্বাপরযুগে যুধিষ্ঠিরের ধর্মবুদ্ধি আর একটি অপ্রগত ব্যাপার, ওর স্থায়িত্বের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই, তবে তার ইতিগজ উক্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জোনাকীর মত দেদীপ্যমান থাকবে সন্দেহ নেই। আবার ধর, কলিযুগে বুদ্ধের অহিংসা-বাণী ইতিহাসবিরুদ্ধ একটা বিষয়, ওটা জলের উপরে নখের আঁচড়। কালক্রমে যথার্থ মর্যাদা পাবে বুদ্ধের জ্ঞাতিভ্রাতা দেবদত্ত, যিনি বুদ্ধকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন।

রামচন্দ্র ॥ ধরুন আপনার কথিত ধারার যদি কখনো পরিবর্তন হয়, তবে আবার ইতিহাসগ্রন্থের পরিবর্তন করতে হবে।

জাবালি ॥ আমার কথিত ধারার পরিবর্তন অবশ্যই সম্ভব নয়। তবু ধর, সত্যই যদি কখন তেমন ঘটে তবে অবশ্যই ইতিহাসগ্রন্থের পরিবর্তন করতে হবে, একেই বলে ইতিহাসকে ঢেলে সাজা।

রামচন্দ্র ॥ আপনার কথিত ধারার পরিবর্তন কেন সম্ভব নয় জানতে পারি কি?

জাবালি ॥ ওটা একটা অমোঘ বৈজ্ঞানিক নিয়ম।

রামচন্দ্র ॥ তবু ভাল যে এই নিত্য পরিবর্তনশীল জগতে একটা কিছু অপরিবর্তনীয় আছে।

জাবালি ॥ অপরিবর্তনীয় বলি নি, বলেছি—অমোঘ।

রামচন্দ্র ॥ ঐ একই কথা হ'ল, নামে কি আসে যায়?

জাবালি ॥ বল কি বৎস, নামেই তো সব। নামের টানেই মানুষ গাধা হচ্ছে আবার নামের টানেই গাধা মানুষ হচ্ছে।

রামচন্দ্র ॥ তবে বলতে চান, আস্তিক নাস্তিকে আসল ভেদ নামে, বস্তুতে ভেদ নেই?

জাবালি ॥ আদৌ নয়।

রামচন্দ্র ॥ তাই বুঝি আপনি আমার পিতাকে বেদসম্মত, শাসনসম্মত আস্তিক্যবুদ্ধিসম্মত উপদেশ দিয়েছিলেন? আর নাম বদলে আমাকে দিচ্ছেন অশাস্ত্রীয়, গ্রহণীয় উপদেশ! ধিক!

জাবালি ॥ রাম তুমি ভুল বুঝেছ। আমি আস্তিকও নই, নাস্তিকও নই, আমি বেদবিরোধীও নই, বেদানুগামীও নই, আমি পাষণ্ড নই, ধার্মিকও নই, আমি শাস্ত্রানুরাগীও নই, শাস্ত্রবিদ্বেষীও নই।

রামচন্দ্র ॥ তবে আপনি কি?

জাবালি ॥ আমি সুবিধাবাদী, আমি সময় বুঝে আস্তিক বা নাস্তিক হই।

রামচন্দ্র ॥ তবে বুঝতে হবে এতক্ষণ যে সব অশ্রদ্ধেয় কথা বললেন সে সমস্তই মিথ্যা?

জাবালি ॥ মিথ্যা স্বীকার করলেই সত্যকে স্বীকার করতে হয়, একটা আর একটার অপেক্ষা রাখে।

রামচন্দ্র ॥ তবে কি আপনি সত্য মিথ্যা কিছুই স্বীকার করেন না?

জাবালি ॥ ঐ যে বললাম---আমি সুবিধাবাদী। সুবিধা হ'লে সবই স্বীকার করি, অসুবিধা দেখলে কিছুই স্বীকার করি নে।

রামচন্দ্র ॥ এ কোন্ দর্শন ?

জাবালি ॥ এর নাম আত্মদর্শন, সব দর্শনের সেরা।

রামচন্দ্র ॥ তবে তো আপনি জীবাত্মা, পরমাত্মা মানেন দেখছি !

জাবালি ॥ সুবিধা হ'লে মানি তাহ'লে।

রামচন্দ্র ॥ সোহংবাদও মানেন ?

জাবালি ॥ অবশ্যই মানি। তবে আমার 'সঃ' তোমাদের 'সঃ' নয়।

রামচন্দ্র ॥ 'সঃ' কি আবার দুটি ?

জাবালি ॥ আমাদের কাছে একটিই।

রামচন্দ্র ॥ তিনিই কি পরব্রহ্ম ?

জাবালি ॥ আমাদের কাছে তা-ই বটে।

রামচন্দ্র ॥ তাঁর সম্বন্ধে আর একটু বলুন।

জাবালি ॥ তিনি কাছেও বটে, তিনি দূরেও বটে, তিনি আদিতেও বটে, তিনি অন্তেও বটে ; তিনি অণুর চেয়েও অণু, তিনি মহতের চেয়েও মহৎ। তাঁর ভয়েই সূর্য চন্দ্র জীব জড়, মনুষ্য ও উদ্ভিদ, এমন কি, স্বয়ং মৃত্যু অবধি চালিত নিযন্ত্রিত।

রামচন্দ্র ॥ এই তো আমাদের বেদোক্ত ব্রহ্ম।

জাবালি ॥ তবে ঐটুকু জেনেই খুশী থাকো।

রামচন্দ্র ॥ প্রভু, এবারে আর একটু বিশদভাবে বলুন, আপনি কে ?

জাবালি ॥ ধনীর গৃহচূড়ায় বিন্যস্ত ধাতুময় কপোত দেখেছ কি ?

রামচন্দ্র ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

জাবালি ॥ আমি সেই গৃহচূড়াবিন্যস্ত প্রসারিতপক্ষ, ব্যাদিতচঞ্চু ধাতুময় কপোত, কারিগরের নির্মাণ-কৌশলে সজীববৎ কিন্তু আসলে প্রাণহীন। প্রাণহীন কিন্তু তাই বলে গতিহীন নয়, সুবিধাবাদের মৃদুতম বায়ু-তরঙ্গটিরও সুযোগ গ্রহণ করতে পারে আমার প্রসারিত পক্ষ, অব্যর্থ তার শিক্ষা। কখনো আমি উত্তরমুখী, কখনো দক্ষিণমুখী, কখনো পূর্বমুখী, কখনো পশ্চিমমুখী। তাতে কি আসে যায় ? আসলে আমি আত্মমুখী। এই মুহূর্তে যে সুরে আমি

কূজন করছি, পর-মুহূর্তে সে সুর পাল্টাতে আমার কিছুমাত্র কুণ্ঠা নাই—বরঞ্চ সেটাই আমার ধর্মসঙ্গত, কারণ আমার ধর্মই হচ্ছে সুবিধাবাদ। সেই জন্যই আমার দেশ নাই, মিত্র নাই, ধর্ম নাই, শাস্ত্র নাই, নীতি নাই, বিবেক নাই, এমন কি পদতলের ভূমিটুকু শুদ্ধ নাই।

রামচন্দ্র ॥ তবে দাঁড়িয়ে আছেন কোথায়?

জাবালি ॥ নিজের মাথার উপরে। তাই আমার চোখে সমস্ত জগৎটাই বিপরীতরূপে পরিদৃশ্যমান।

রামচন্দ্র ॥ এ ভাবে আর কতকাল থাকবেন? অপরের কথা ছেড়ে দিন, নিজেরও তো অসুবিধা হয়!

জাবালি ॥ সুবিধাবাদের প্রথমতম হাওয়াতেই সব পরিবর্তনই যে জীবনের লক্ষণ।

রামচন্দ্র ॥ তার মানে যখন-যেমন তখন তেমন?

জাবালি ॥ তাছাড়া আর কি? সেইজন্যে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দশরথকে এক রকম উপদেশ দিয়েছিলাম, আবার চীরাজিনধারী তার পুত্রকে আর এক রকম উপদেশ দিলাম "অবস্থা পূজাতে রাজন ন শরীরী কদ চন"। তোমাকে বনে যেতে দেখে গর্দভ মনে ক'রে গর্দভের প্রাপ্য উপদেশ দিয়েছিলাম, কথাবার্তা ব'লে তোমার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছি, এখন তাই মানুষের যোগ্য উপদেশ দিচ্ছি।

রামচন্দ্র ॥ আপনি তো আমার সব রকম পরিচয়ই পেলেন, আপনাকে কি ব'লে গ্রহণ করবো এখনো বুঝতে পারি নি।

জাবালি ॥ ঐ তো বলেছি, আমি ধাতুময় কপোত। আরও যদি শুনতে চাও তবে শোনো। আমি এ যুগের ত্রিশঙ্কু। স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝখানে চিরশূন্যতার অন্তরীক্ষে মস্ত একটা জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মতো, তৃষিত লেলিহান একটা জিহ্বার মতো আমাতে আমি দোদুল্যমান।

রামচন্দ্র ॥ এমন ত্রিশঙ্কু-জন্মের চেয়ে নিরীহ একটা গর্দভ-জন্ম বোধ করি অনেক গুণে শ্রেয়।

জাবালি ॥ অনেক গুণে, অনেক গুণে। আর যে-গর্দভ বুঝতে পারে না সে

গর্দভ, সে তো মনুষ্যদেহে দেবতা। রামচন্দ্র, ঈর্ষার বশেই তোমাকে গর্দভ বলে অভিহিত করেছি, নিন্দার জন্যে নয়।

রামচন্দ্র ॥ তবে আশীর্বাদ করুন, আমি যেন আপন ব্যক্তিত্বের অবাধ ক্ষেত্রে সারা জীবন গর্দভরূপে বিচরণ ক'রে মরতে পারি।

জাবালি ॥ তারও চেয়ে বড় আশীর্বাদ করছি, তোমার ক্ষুধার খাদ্য, তোমার তৃষ্ণার জল আপন ব্যক্তিত্বের অবাধ ক্ষেত্র থেকেই চিরদিন যেন তুমি সংগ্রহ করতে সক্ষম হও, আমার মতো শূন্যপানে হাঁ করে চেয়ে কখনো যেন তোমাকে থাকতে না হয়। কায়মনোবাক্যে এই আশীর্বাদ করছি। যাও তুমি বনে।

বসুদেব ও নারদ

কংস কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইলে দেবর্ষি নারদ সেখানে আগমন করেন। তখন বাসুদেব ও নারদের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল শ্রীমদ্‌ভাগবতে তাহার উল্লেখ আছে।

বসুদেব ॥ দেবর্ষি, আজ এই অন্ধ কারাগার তোমার পদধূলিতে ধন্য হল।

নারদ ॥ এ কথা যথার্থ নয়।

বসুদেব ॥ কেন?

নারদ ॥ এই অন্ধ কারাগারের ধূলি সংগ্রহ করে ধন্য হবার জন্যই আমি এসেছি।

বসুদেব ॥ এখানকার ধূলিতে ধন্য হবেন দেবর্ষি? এ কি শুনি!

নারদ ॥ দেবর্ষি তো সামান্য। কোন্ দেবতা না ধন্য হবেন এখানকার এই ধূলির স্পর্শ পেলে?

বসুদেব ॥ দেবতারা ধন্য হবেন!

নারদ ॥ ধন্য হবেন এবং মুক্ত হবেন।

বসুদেব ॥ দেবর্ষির বাক্য অবশ্যই সত্য, কিন্তু আমি সামান্যবুদ্ধি, এ রহস্য বুঝতে অক্ষম।

নারদ ॥ তুমি সত্যই বলেছ যে এ রহস্য! সেই রহস্য প্রকাশ করবার জন্যই পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে প্রেরণ করেছেন।

বসুদেব ॥ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, প্রকাশ করে বলুন।

নারদ ॥ স্বয়ং ভগবান ভূমিষ্ঠ হবেন এখানে।

বসুদেব ॥ এই কারাগারের ধূলিতে!

নারদ ॥ এ তাঁর এক অতি বিচিত্র লীলা।

বসুদেব ॥ স্বয়ং মুক্তিদাতা জন্ম নেবেন কারাগারে? কি আশ্চর্য!

নারদ ॥ বিস্মিত হচ্ছ কেন বসুদেব। মুক্তিদাতা তো চিরকাল কারাগারেই জন্ম নিয়ে থাকেন।

বসুদেব ॥ এ কি লীলা?

নারদ ॥ লীলা বই কি? যেখানে বন্ধন, সেখানে মুক্তি। বন্ধনের রজ্জুকে তিনি খেলার ডোরে পরিণত ক'রে থাকেন।

বসুদেব ॥ দেবর্ষি, আমি সামান্য মানুষ, আপনার বাক্যের গূঢ়ার্থ গ্রহণে অসমর্থ।

নারদ ॥ অসমর্থ! কেন দেখনি কি যে অমাবস্যার অন্ধকার-গোমুখী থেকে শুক্ল চন্দ্রের কিরণ ধীরে ধীরে ক্ষরিত হ'তে থাকে?

বসুদেব ॥ সে তো প্রত্যক্ষ।

নারদ ॥ দেখনি কি যে নিশান্তের গাঢ়তম অন্ধকার বিদীর্ণ হয়ে উষার কিশলয় দেখা দেয়?

বসুদেব ॥ এ সব তো নৈসর্গিক বিধান।

নারদ ॥ মুক্তিদাতার জন্মগ্রহণের প্রশস্ততর স্থান আর কোথায়—কারাগারের চেয়ে?

বসুদেব ॥ সেটাই তো বুদ্ধির অগম্য।

নারদ ॥ কেন অগম্য? বন্ধনের অভিজ্ঞতা থাকলে তবেই তো মুক্তিদান সম্ভব॥

বসুদেব ॥ কিন্তু যিনি সর্বশক্তিমান, তাঁর এ বন্ধন দশা স্বীকার কেন? তাঁর ইচ্ছামাত্রেই তো মুক্তি সম্ভব।

নারদ ॥ নিজের বিধানকে অগ্রাহ্য করবেন তিনি কেন? তিনি লীলাময় সত্য, কিন্তু তাই বলে খেয়ালী পুরুষ তো তিনি নন।

বসুদেব ॥ কি আশ্চর্য!

নারদ ॥ সত্যই এ আশ্চর্য। কেন না, যে-ব্যক্তি বন্ধনে বাঁধছে তার মধ্যেও যে তাঁরই বিভূতি বর্তমান।

বসুদেব ॥ বন্ধনেও তিনি, মুক্তিতেও তিনি?

নারদ ॥ বাম হাতে বাঁধছেন, দক্ষিণ হাতে খুলছেন, তবে তো লীলা জমে উঠছে!

বসুদেব ॥ তবে কি বলতে চান যে রাবণেও তিনি, রামচন্দ্রেও তিনি?

নারদ ॥ তা বই কি! তবে প্রভেদ এই যে, রাবণে যে তিনি তা রাহুগ্রস্ত সূর্য, আর রামচন্দ্রে যে তিনি তা কলঙ্কহীন ভাস্বর সূর্য।

বসুদেব ॥ রাহুগ্রস্ত কেন?

নারদ ॥ নইলে বন্ধন ঘটবে কিসে?

বসুদেব ॥ বন্ধনের আদৌ প্রয়োজন কি?

নারদ ॥ নইলে লীলা অর্থহীন হয়।

বসুদেব ॥ তাঁর লীলার জন্য মানুষে দুঃখ ভোগ করবে কেন?

নারদ ॥ মানুষের দিক থেকে দেখলে তাই দাঁড়ায় বটে।

বসুদেব ॥ আর কোন্ দিক থেকে দেখা সম্ভব?

নারদ ॥ তাঁর দিক থেকে দেখোনা কেন?

বসুদেব ॥ তাঁর দিক থেকে?

নারদ ॥ শকটের চক্রে অনেকগুলো অর আছে—কিন্তু সবগুলোই মিলেছে গিয়ে ধুরের গর্ভে, তাই তো চক্র ঘোরে।

বসুদেব ॥ বন্ধনও যদি তাঁর লীলার অঙ্গ হয় তবে বন্ধনকারীকে দুষি কেন?

নারদ ॥ দোষগুণের কথা নয়, কোন্ পক্ষ অবলম্বন করবে সেই কথা, রাহুগ্রস্ত সূর্যের পক্ষ না ভাস্বর সূর্যের পক্ষ?

বসুদেব ॥ এতে কি সূক্ষ্ম বিবেচনার স্থান আছে? কিন্তু সন্দেহ কিছুতে

যাচ্ছে না। না হয় বুঝলাম যে মুক্তিদাতা কারাগারেই জন্মগ্রহণ ক'রে থাকেন, কিন্তু বিশেষ ক'রে আমার ঘরে কেন?

নারদ ॥ যে ঘরে তিনি জন্ম নেবেন সেই-ঘর সম্বন্ধেই তো ঐ তর্ক উঠ্তে পারে।

বসুদেব ॥ আমরা এমন কি পুণ্য করেছি?

নারদ ॥ বিধাতাকে কোলে স্থান দিতে পারে এমন পুণ্য কার পক্ষে সম্ভব?

বসুদেব ॥ তবে?

নারদ ॥ পৃথিবীর প্রয়োজন তাঁর অবতরণে।

বসুদেব ॥ কৌতূহল বাড়ছে, খুলে বলুন।

নারদ ॥ ন্যায় মর্যাদা লঙ্ঘনকারী, রাজবেশধারী রাষ্ট্রপ্রধানগণের এবং তাঁদের অসংখ্য সৈন্য সামন্তের অনাচারে আর ধ্বংস সম্ভাবনাময় অস্ত্রশস্ত্রের ভারে পৃথিবী পীড়িতা হয়ে উঠলে একদিন তিনি গোরূপ ধারণ ক'রে ব্রহ্মার সমীপে গিয়ে সমস্ত অবস্থা নিবেদন করলেন।

বসুদেব ॥ ব্রহ্মা কি বল্লেন?

নারদ ॥ ব্রহ্মা বল্লেন, "যাও বৎসে, কোন ভয় নেই, শীঘ্রই ভগবান্ মানবরূপ পরিগ্রহ ক'রে তোমার ভার লাঘব করবেন।"

বসুদেব ॥ এই অকারণ অনুগ্রহের জন্য আমাদের জীবন ধন্য।

নারদ ॥ একেবারে অকারণ নয়—তোমাদের পূর্ব পূর্বজন্মে কিছু কারণ নিহিত হ'য়ে আছে।

বসুদেব ॥ বিস্মৃত সেই কারণ বিবৃত করুন।

নারদ ॥ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবকী পৃশ্নিনামে আর তুমি সুতপা নামে পরিচিত ছিলে। তখন তোমরা কঠোর তপস্যা ক'রেছিলে। শ্রীহরি সন্তুষ্ট হ'য়ে বরদান করতে উদ্যত হ'লে তোমরা তাঁকে পুত্ররূপে লাভ করবার ইচ্ছা জানিয়েছিলে। তিনি তোমাদের ঘরে পৃশ্নিপুত্র নামে জন্ম নিয়েছিলেন। আবার পরজন্মে তোমরাই ছিলে কশ্যপ আর অদিতি, তখন তিনি তোমাদের ঘরে বামনরূপে জন্ম নিয়েছিলেন। এজন্মে তোমরা বসুদেব আর দেবকী, আবার তিনি উদ্যত হ'য়েছেন তোমাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করতে, এবার তাঁর নাম হবে শ্রীকৃষ্ণ।

বসুদেব ॥ বিধাতার কি আশ্চর্য লীলা—আর কি ভক্তবাৎসল্য! প্রভু, কখন্ তিনি জন্মগ্রহণ করবেন?

নারদ ॥ বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে ভাদ্রমাসে 'বিজয়' বেলায় রোহিণী নক্ষত্রে বুধবার কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে তিনি মানব শিশুরূপে অবতীর্ণ হবেন।

বসুদেব ॥ সেই শুভক্ষণ কি ক'রে বুঝ্‌বো?

নারদ ॥ তখন দিক্‌সমূহ প্রসন্ন হবে, নদীসমূহ নির্মল হবে, পৃথিবীর যাবতীয় নগর ও গোষ্ঠ আনন্দময় হবে। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরীর বর্ষাকালীন আবিলতা দূর হবে, হ্রদ এবং দীর্ঘিকাসমূহ পদ্মসনাথ হয়ে উজ্জ্বল মূর্তি ধরবে। বনরাজি পুষ্পনিচয়ে ও ভ্রমর গুঞ্জনে মধুময় হ'য়ে উঠবে, বায়ু সুখস্পর্শ হবে—আর চরাচর ও মানুষের মন অকারণ, অলৌকিক এক আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠবে, সাধু ও ভক্তগণের হৃদয় পূর্ণচন্দ্রোদয়ে উদ্বেল সিন্ধুর ন্যায় ভক্তিতে উপছে পড়বে, বহির্জগৎ আর অন্তর্জগতের বাঁধ বন্ধন অকস্মাৎ একাকার হ'য়ে যাবে—জান্‌বে যে তখনই প্রভুর অবতরণের লগ্ন।

বসুদেব ॥ কিন্তু দেবর্ষি, একটি বিষয় কিছুতেই বুঝতে পারছি না। জগতে এত রাজবংশ থাকতে দীনহীনের ঘরে ভগবানের আবির্ভাব কেন?

নারদ ॥ যিনি রাজার রাজা জগদীশ্বর, কোন্ রাজবংশ তাঁর যোগ্য?

বসুদেব ॥ তবে কি নীচকুলই তাঁর যোগ্য?

নারদ ॥ দেখনি নীচ মাটি ভেদ ক'রে উৎস উৎসারিত হয়?

বসুদেব ॥ সে মৃত্তিকাও আবার কারাগারের মৃত্তিকা!

নারদ ॥ বীজের কঠিন আবরণের মধ্যেই তো থাকে প্রাণের অঙ্কুর!

বসুদেব ॥ যিনি মুক্তিস্বরূপ, তিনি ধরা দেবেন কি না কারাগারের বন্ধনে?

নারদ ॥ আজ জগতে মুক্ত কে? আজ জগতে মুক্তি কোন্ স্থানটায়?

বসুদেব ॥ তা বটে!

নারদ ॥ তোমার এই গৃহ কারাগার। মথুরা নগরী বৃহত্তর কারাগার। ন্যায়ধর্ম বিবর্জিত রাষ্ট্রনায়কগণের অত্যাচারে সমগ্র পৃথিবী আজ অতি বৃহৎ কারাগার।

বসুদেব ॥ অতি সত্য, অতি সত্য।

নারদ ॥ মুক্তির বিধাতা তাই আজ কারাগারের শিশু।

বসুদেব ॥ বিচিত্র, বিচিত্র!

নারদ ॥ কারাগারকে লৌহ প্রাচীরে বেষ্টিত ক'রে, শত শত সৈন্য শাস্ত্রীতে সুরক্ষিত ক'রে অত্যাচারী আজ নিশ্চিন্ত ভাবছে ও স্থানটা নিরাপদ, বিচিত্র যাঁর রীতি সেই ভগবান সেখানেই ভূমিষ্ঠ হ'য়ে দেখাতে চান, ওরে মূর্খ, ওরে অত্যাচারী, ওরে কারারক্ষক দেখ, চেয়ে দেখ, কোন স্থানই নিরাপদ নয়, দেখ্ চেয়ে দেখ্ পাষাণ প্রাচীরের দুর্ভেদ্য সন্ধিতে শিশু অশ্বত্থ বৃক্ষের শিকড় বিস্তার। ঐ কোমল দুর্ব্বল অসহায় শিশু বৃক্ষই তোর পাষাণ নিষেধের দুরন্ত মুষ্টিকে দেবে শিথিল ক'রে! তিনি বলতে চান, বন্ধন যত দৃঢ়তর মুক্তি তত বেশি আসন্ন! একটা কারাগার শিথিল হ'লে জগতের সমস্ত কারাবাসীর মন আশ্বাসে পূর্ণ হয়ে উঠবে! একটা কারাগার শিথিল হ'লে জগতের সমস্ত কারারক্ষক বিচলিত হ'য়ে উঠবে। ভয় নেই বসুদেব, ভয় নেই, ধৈর্য ধরো, মুক্তির শুভলগ্ন সমাসন্ন।

বসুদেব ॥ আশ্বস্ত হ'লাম দেবর্ষি!

নারদ ॥ তুমি জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে আমার অপ্রত্যাশিত আগমনের কারণ। আমি দিকে দিকে, দেশে দেশে, রাজ্যে রাজ্যে, আশ্বাসবাণী প্রচার করতে এসেছি 'বন্দী আশ্বস্ত হও বিধাতা তোমাকে ভোলেননি,' 'অত্যাচারিত আশায় বুক বাঁধো, বিধাতা তোমাকে মনে রেখেছেন,' 'উপদ্রুত অবসন্ন হ'য়ো না, তোমার অঙ্গের আঘাত বিধাতার হৃদয়ে গিয়ে বেজেছে,' 'ভগ্নআশ আনন্দ করো—মুক্তির দণ্ড আজ সমুদ্যত।'

বসুদেব ॥ প্রভু, পুরাণ পাঠে জানতে পারি যে কোন কোন যুগে অত্যাচার হঠাৎ বেড়ে যায়, এমন হয় কেন?

নারদ ॥ চরিতার্থতা লাভের সহজ পথের সন্ধানেই এমন বিপরীত কাণ্ড ঘটে।

বসুদেব ॥ কেমন?

নারদ ॥ মানুষে শান্তি চায়, ভাবে নিষ্ক্রিয়তাই শান্তি লাভের সহজতম পন্থা; মানুষে রাজ্য চায়, ভাবে অস্ত্র প্রয়োগই রাজ্যলাভের সহজতম

পন্থা ; মানুষে দলবৃদ্ধি চায়, ভাবে অস্ত্র ক্রীতদাস করণেই দলবৃদ্ধির সহজতম পন্থা ; মানুষে উন্নতি চায়, ভাবে নিজের মতবাদ প্রচারই উন্নতির সহজতম পন্থা ; মানুষে মনুষ্যত্ব চায়, ভাবে আর সকলকে অক্ষ গুটিকায় পরিণত করাই মনুষ্যত্বলাভের সহজতম পন্থা! বসুদেব, কোন চরিতার্থতাই সহজসাধ্য নয়।

বসুদেব ॥ দেবর্ষি, আপনি তো চরাচরে ভ্রমণ ক'রে বেড়ান, সর্ব্বত্র কি একই অবস্থা ?

নারদ ॥ একই অবস্থা কিন্তু এক নামে নয়। কোন রাজ্যে কারাগারের নাম মঠ মন্দির, কোন রাজ্যে শিক্ষায়তন, কোন রাজ্যে আরোগ্যশালা, যন্ত্রশালা, কোন রাজ্যে শোধনাগার, আবার কোন রাজ্যে বা বিশ্রামাগার।

বসুদেব ॥ এ কি বিচিত্র রীতি ?

নারদ ॥ সবচেয়ে বিচিত্র এই যে, অধিকাংশ রাজ্যে বন্দীরাই কারা ব্যবস্থার সবচেয়ে বেশি সমর্থক।

বসুদেব ॥ কি আশ্চর্য !

নারদ ॥ আশ্চর্য নয়। মানুষের ধারণা নামের উপরে বস্তুর স্বরূপ নির্ভর করে। তাই বুদ্ধিমান কারাব্যবসায়ীগণ নাম বদলে দিয়ে কারাজীবনের রঙ বদলে দিয়েছে। মুক্তিদাতার কাজ এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। বসুদেব এমন হয় তো অসম্ভব নয় যে, মুক্তিদাতাকে কেবল কারাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নয়, বন্দীর বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হবে। আজ সেইজন্য মানুষের দুর্ভাগ্যের চরম। আর সেইজন্যই এবারে আর অবতার প্রেরণ ক'রে নিশ্চিন্ত না থাকতে পেরে স্বয়ং অবতারীকেই ভূমিষ্ঠ হ'তে হচ্ছে।

বসুদেব ॥ জয় হোক অবতারীর।

নারদ ॥ আর বলো—কল্যাণ হোক্ মানবের।

———

মেনকা ও বিশ্বামিত্র

বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের উদ্দেশ্যে মেনকা প্রেরিত হইলে উভয়ের মধ্যে নিম্নোক্তরূপ কথোপকথন হয় বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মেনকার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদের সন্তান শকুন্তলা।

মেনকা ॥ হে তরুণ ঋষিকুমার, কোন্ অপরিমেয় দুঃখে কঠোর তপস্যায় তুমি সুললিত দেহ ক্ষয় করতে উদ্যত হ'য়েছ।

বিশ্বামিত্র ॥ হে বরাননে, তপস্যার গূঢ় উদ্দেশ্য তোমার শ্রুতিযোগ্য নয়।

মেনকা ॥ কেন তপোধন, আমি নিতান্ত কৌতূহলী।

বিশ্বামিত্র ॥ অস্বাভাবিক এই কৌতূহল।

মেনকা ॥ অস্বাভাবিকতার প্রশ্নই যদি উঠল তবে জিজ্ঞাসা করি এমন মহার্ঘ্য যৌবন ও তরুণ দেহ ক্ষয়টাই কি স্বাভাবিক?

বিশ্বামিত্র ॥ যৌবন ও দেহ কি চিরন্তন?

মেনকা ॥ চিরন্তন নয় বলেই তো তার মূল্য সমধিক।

বিশ্বামিত্র ॥ সে মূল্যে কি পাবো?

মেনকা ॥ সুখ।

বিশ্বামিত্র ॥ সুখটাই কি চিরন্তন?

মেনকা ॥ যা ক্ষণিক তার বিনিময়ে অবশ্যই ক্ষণস্থায়ী বস্তু প্রাপ্য। তার বেশি আশা করা সমীচীন নয়।

বিশ্বামিত্র ॥ আর যদি ক্ষণিকের বিনিময়ে চিরন্তন মিলে?

মেনকা ॥ কি সেই বস্তু?

বিশ্বামিত্র ॥ সিদ্ধি, দুর্লভ রত্ন।

মেনকা ॥ সিদ্ধি, দুর্লভ রত্ন! কিন্তু সিদ্ধিলাভ যে হবেই তার কোন স্থির আছে? মাঝে থেকে হাতে যা আছে তাও যাবে। সেটা কম দুর্লভ নয়।

বিশ্বামিত্র ॥ কি সেই দুর্লভ বস্তু?

মেনকা ॥ তরুণ দেহ, অমূল্য যৌবন।

বিশ্বামিত্র ॥ তার বিনিময়ে কি পাবো?

মেনকা ॥ সুখ।

বিশ্বামিত্র ॥ আবার সেই সুখ। আমি সুখ চাই না।

মেনকা ॥ তপোধন তুমি জানোনা তোমার মন। সুখ না চায় কে?

বিশ্বামিত্র ॥ চায় বালকে অজ্ঞে এবং তোমার মতো প্রগল্‌ভা নারীতে।

মেনকা ॥ এবং তোমার মতো একরোখা তপস্বীতে। সুখ না চায় কে?

বিশ্বামিত্র ॥ সুখ কি?

মেনকা ॥ এবারে হাসালে তপস্বী। তুমি বালক, অজ্ঞ ও প্রগল্‌ভের মতো প্রশ্ন করলে এবারে—সুখ কি?

বিশ্বামিত্র ॥ তুমি না হয় প্রাজ্ঞের মতো উত্তর দাও।

মেনকা ॥ অনেক বস্তু আছে যার সংজ্ঞা দেওয়ার চেয়ে উপলব্ধি সহজতর। এই আকাশভরা আলো, বুকভরা নিঃশ্বাস, চরাচরভরা সৌন্দর্যের কি সংজ্ঞা আছে? সৌন্দর্যকে দর্শন মানেই সৌন্দর্যের উপলব্ধি। তাই নয় কি?

বিশ্বামিত্র ॥ লৌকিক সৌন্দর্যের চেয়েও বেশি যদি কিছু থাকে?

মেনকা ॥ তবে তার নাম সৌন্দর্য নয়।

বিশ্বামিত্র ॥ কি তার নাম?

মেনকা ॥ যা জানিনে তার নাম জানবার আগ্রহই বা কেন থাকবে?

বিশ্বামিত্র ॥ তবে শোন, তার নাম মুক্তি।

মেনকা ॥ কোন্ বন্ধন থেকে মুক্তি?

বিশ্বামিত্র ॥ দেহের বন্ধন থেকে, বাসনার বন্ধন থেকে, মৃত্যুর বন্ধন থেকে।

মেনকা ॥ এদের বন্ধন কেন অকাম্য?

বিশ্বামিত্র ॥ এগুলোই অসুখের মূল।

মেনকা ॥ তবেই তুমি সুখ চাও।

বিশ্বামিত্র ॥ সুখ না চায় কে?

মেনকা ॥ আমি তো সেই কথাই বোঝাতে এসেছি।

বিশ্বামিত্র ॥ তোমার অভীষ্ট সুখ ক্ষুদ্র।

মেনকা ॥ তুমি বৃহত্তর সুখ চাও। তাহলে তুমি আমার চেয়েও অধিকতর সুখপ্রয়াসী।

বিশ্বামিত্র ॥ ও দুই এক বস্তু নয়।

মেনকা ॥ বস্তু একই, কেবল তোমার লোভ অপরিসীম।

বিশ্বামিত্র ॥ আমি লোভী !

মেনকা ॥ লোভী বই কি।

বিশ্বামিত্র ॥ লোভী কি এমন কৃচ্ছ্রসাধনে প্রস্তুত থাকে ?

মেনকা ॥ এর চেয়েও বেশি কৃচ্ছ্রসাধন করতে যে দেখেছি। শিশুর মুখ থেকে দুধের কড়ি কেড়ে নিয়ে জমায় কৃপণ, সপরিবারে অনাহারে থেকে জমায় তিলে তিলে—সে কি তোমার চেয়ে কম কৃচ্ছ্রসাধন-তৎপর !

বিশ্বামিত্র ॥ কৃপণ কি সুখী ?

মেনকা ॥ জিজ্ঞাসা করো কৃপণকে। সঞ্চিত ভাণ্ডার দেখে স্বর্গসুখ অনুভব করে সে।

বিশ্বামিত্র ॥ সে ভাণ্ডার তো চিরস্থায়ী নয়।

মেনকা ॥ কে বলল চিরস্থায়ী ? সুখ ক্ষণিক ব'লেই সুখদায়ক। হীরকখণ্ড ক্ষুদ্রই হ'য়ে থাকে।

বিশ্বামিত্র ॥ তপস্যার সিদ্ধির ফলে যদি সেই হীরকের খনিটা আবিষ্কার করতে সমর্থ হই।

মেনকা ॥ তবে দেখবে তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডে পূর্ণ। ক্ষুদ্র হীরক রমণীর রত্নাভরণ তৈরী করে, হীরের চাঙড় মুটের বোঝা।

বিশ্বামিত্র ॥ অবোধ নারী কেমন ক'রে বোঝাবো তোমাকে সিদ্ধির রহস্য।

মেনকা ॥ সুখের রহস্য দুরূহ নয়, এসো তোমাকে বুঝিয়ে দিই।

বিশ্বামিত্র ॥ বলো কি বলবার আছে।

মেনকা ॥ যৌবন অমূল্য কেননা তা জীবনে একবার মাত্র আসে। দেহ বিস্ময়ের আকর, চরাচরের রহস্য তাতে ঘনীভূত। সৌন্দর্য মনের নেত্র, প্রেম ইন্দ্রিয়ের অধিপতি। সমস্তই পরম বিস্ময়ে পূর্ণ। দেহ রথ, যৌবন অশ্ব, সৌন্দর্য সারথি, প্রেম রথী। অপূর্ব নয় কি ?

বিশ্বামিত্র। অপূর্ব তোমার অলঙ্কার, তোমার দেহের ঐ স্বর্ণালঙ্কারের চেয়েও। কিন্তু কি উদ্দেশ্য এই রথ-সজ্জার, কোন্ লক্ষ্যমুখে এই রথগতি ?

মেনকা ॥ সুখ-মৃগয়ায়।

বিশ্বামিত্র ॥ চমৎকার বলেছ ! সুখ-মৃগয়া ! কিন্তু মৃগয়ায় মৃগ যে মিলবেই তা কে বলল ?

মেনকা ॥ কে বলল মিলবেই। মৃগবধ সুনিশ্চিত হ'লে মৃগয়া হ'তো না, হ'তো কশাইবৃত্তি।

বিশ্বামিত্র ॥ তবে ?

মেনকা ॥ তবে আর কি ? মৃগয়ার সুখ তো মৃগপ্রাপ্তিতে নয়, মৃগের সন্ধানে, মৃগের পশ্চাদ্ধাবনে।

বিশ্বামিত্র ॥ তবে তোমার মৃগয়া মৃগতৃষ্ণিকার অনুসন্ধান—কি বলো ?

মেনকা ॥ আমি আর কি বলবো, তুমিই তো বললে।

বিশ্বামিত্র ॥ তবে সুখ কোথায় ?

মেনকা ॥ সুখের প্রাপ্তিতে সুখ নয়, সুখের আশাতে সুখ, সুখের ছলনাতে সুখ, সুখ আর সুখেচ্ছুর মধ্যে নিরন্তর যে দ্বন্দ্ব চলছে সুখ সেখানে।

বিশ্বামিত্র ॥ আর আমার তপঃকৃচ্ছ্রতার পথে সুখ সুনিশ্চিত।

মেনকা ॥ তবে ও তোমার তপস্যা নয়, ব্যবসায়।

বিশ্বামিত্র ॥ ব্যবসায়! বলো কি ?

মেনকা ॥ তা ছাড়া আর কি ? এতটা দিলে তার বদলে এতখানি পেলে—এই তো ব্যবসায়।

বিশ্বামিত্র ॥ আর তোমার ?

মেনকা ॥ আমি সর্বস্ব দিলাম—কি পাবো অনিশ্চিত। একদিকে অনিশ্চয়তা আর একদিকে পরম প্রাপ্তির সম্ভাবনা, এই তো সুখ।

বিশ্বামিত্র ॥ ও তো জুয়াড়ীর সুখ।

মেনকা ॥ তুমি সিদ্ধি ব্যবসায়ী, তুমি কেমন করে বুঝবে জুয়াড়ীর সুখ।

বিশ্বামিত্র ॥ কোন্ পণে তোমার জুয়াখেলা ?

মেনকা ॥ সর্বস্ব পণে! জীবন যৌবন 'তন্ মন ধন' সব বাজি রেখে এ খেলায় নামতে হয়। এসো তপস্বী, এসো।

বিশ্বামিত্র ॥ তবে শোনো সুন্দরী, আমি তপস্যায় বসেছি নূতন জগৎ সৃষ্টি করব আশা নিয়ে।

মেনকা ॥ আবার আর একটা জগৎ! সে তো হবে এই জগৎটারই অনুরূপ আর-একটা কিছু।

বিশ্বামিত্র ॥ হ'লই বা।

মেনকা ॥ এ জগৎ যদি সুখদায়ক না হয় তবে তার অনুরূপ কি হবে সুখদায়ক ?

বিশ্বামিত্র ॥ হয়তো না হতে পারে।

মেনকা ॥ তবে এ বৃথা চেষ্টা কেন ? তখন কি সর্বস্ব খুইয়ে দেউলে ব্যবসায়ী —হায় হায় ক'রে ঘুরে মরবে না ?

বিশ্বামিত্র ॥ এ সব তো ভেবে দেখিনি।

মেনকা ॥ এখনো কি ভাববার সময় হয়নি, ভেবে দেখো সন্ন্যাসী, ভেবে দেখো।

বিশ্বামিত্র ॥ কি ভাববো ?

মেনকা ॥ বৃথা জীবন যৌবন অবক্ষয়ে সুখ নাই, নূতন জগৎ সৃষ্টিতে সুখ নাই। সুখের পথ স্বতন্ত্র।

বিশ্বামিত্র ॥ কে জানে সে পথ ?

মেনকা ॥ আমার সঙ্গে এসো।

বিশ্বামিত্র ॥ কি দিতে পারো তুমি ? সুখ ?

মেনকা ॥ তার চেয়েও বেশি—অমরত্ব।

বিশ্বামিত্র ॥ অমরত্ব ? এ জীবন এই দেহ যে নশ্বর কে না জানে ?

মেনকা ॥ এ জীবন এই দেহকে নূতন ক'রে লাভ করো।

বিশ্বামিত্র ॥ কার মধ্যে ?

মেনকা ॥ তোমার সন্তানের মধ্যে।

বিশ্বামিত্র ॥ তাতেই কি সুখ ?

মেনকা ॥ তাতেই সুখের সন্ধান। সুখ-মৃগয়া এক জীবনে পরিসমাপ্ত হওয়ার নয়, তাই মানুষ উত্তরপুরুষের মধ্যে দেহান্তর লাভ ক'রে জন্মজন্মান্তর ধরে সেই মৃগয়া চালায়।

বিশ্বামিত্র ॥ পায় ?

মেনকা ॥ আগেই তো বলেছি মৃগয়ার সুখ মৃগপ্রাপ্তিতে নয়, মৃগের সন্ধানে। সে সন্ধান চলে পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে, দেহ থেকে দেহান্তরে, জন্মজন্মান্তরের ঘন অরণ্যের প্রচ্ছন্ন বীথিকায়। এসো ব্রাহ্মণ, উঠে এসো, তপস্যার আসন তোমার নয়।

বিশ্বামিত্র ॥ কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে ?

মেনকা ॥ শৈবালহ্রদের তীরে নির্জন কুটীরে।

বিশ্বামিত্র ॥ তারপরে ?

মেনকা ॥ তারপরে শুধু তুমি আর আমি—এবং তারও পরে আমাদের সন্তান।

বিশ্বামিত্র ॥ অমরতা ?

মেনকা ॥ সন্তান পরম্পরায় চলতে থাকবো আমরা—সেই তো অমরতা—অমরতার একমাত্র রূপ।

বিশ্বামিত্র ॥ দেবতার অমরতা ?

মেনকা ॥ দেবতারা কি অমর ? তাঁরা অমরতার স্মৃতি-স্তম্ভ—নির্জীব, নিশ্চল, স্থাণু। মুমূর্ষু মানুষেই জানে শুধু অমরতার পথ—উত্তর-পুরুষের মধ্যে কায়ান্তর-গ্রহণ।

বিশ্বামিত্র ॥ আর সুখ !

মেনকা ॥ নব নব জন্মে তার সন্ধান নিরন্তর চলতেই থাকবে—

বিশ্বামিত্র ॥ হয়তো পাবো না কোন কালে—

মেনকা ॥ সেইজন্যে সমাপ্তিও হবে না সন্ধানের—

বিশ্বামিত্র ॥ যদি কখনো হাতে পাই।

মেনকা ॥ দেখবে মলিন ম্লান ছুটির দিনের অপরাহ্নের মতো বিরস নীরস বিস্বাদ।

বিশ্বামিত্র ॥ তবে ?

মেনকা ॥ উঠে এসো, চলো দু'জনে যাই অমরত্বের পথে, অনায়ত্তের সন্ধানে।

বিশ্বামিত্র ॥ তবে তাই হোক সুন্দরী—চলো।

বক ও যুধিষ্ঠির

মহাভারতের বনপর্বে বকরূপী ধর্মের সহিত যুধিষ্ঠিরের তর্ক ও মীমাংসা অতি প্রসিদ্ধ কাহিনী। সেই কাহিনী বর্তমান সংলাপের উপজীব্য।

যুধিষ্ঠির ॥ হে বক এবারে তোমার শেষ প্রশ্নটির উত্তর অবধান করো।

বক ॥ মহারাজ, আমি অবহিত।

যুধিষ্ঠির ॥ "অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরম্
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।"

বক ॥ সাধু মহারাজ সাধু। এবারে ব্যাখ্যা ক'রে শোনাও।

যুধিষ্ঠির ॥ প্রতিনিয়ত প্রাণী সব মরছে, তবু কিনা জীবিতরা আশা পোষণ করে যে তারা চিরকাল বেঁচে থাকবে।

বক ॥ মরণধর্মী প্রাণীদের চিরকাল জীবিত থাকবার ইচ্ছা বাতুলতা মাত্র! এই তো তোমার অভিপ্রায়।

যুধিষ্ঠির ॥ আমি তো তাই বুঝি।

বক ॥ মহারাজ তোমার উক্তিটির সঙ্গে আমি একমত—যদিচ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ভিন্ন মত পোষণ করি।

যুধিষ্ঠির ॥ আর কি ভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভব তা তো জানিনে।

বক ॥ মহারাজ আমার ব্যাখ্যা শ্রবণ করো, পরে অভিমত ব্যক্ত করো। নিত্যনিয়ত প্রাণী সব যমালয়ে যাচ্ছে, কে না দেখছে, তাকেও অবশ্য একদিন যেতে হবে কে না জানে, জীবের ধর্মই মৃত্যু, কার বা অজ্ঞাত, তবু, এই নিত্যপ্রকট অকাট্য প্রমাণ সত্ত্বেও জীব চিরজীবী হ'বার আশা করে কেন? কিন্তু করে দেখতেই পাচ্ছি, তাই 'কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!'

যুধিষ্ঠির ॥ হে বক তোমার ব্যাখ্যায় ও আমার ব্যাখ্যায় প্রভেদ বুঝতে আমি অক্ষম।

বক ॥ আক্ষরিক অর্থে প্রভেদ নেই, কিন্তু আন্তরিক অর্থে অবশ্যই আছে। তোমার মত মানুষের চিরজীবী হবার আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত মূঢ়তা মাত্র; আমার মতে মানুষের চিরজীবী হ'বার আকাঙ্ক্ষা চিরঞ্জীব আশার উদ্যম। মহারাজ, প্রাণী সব এমন মূঢ় নয় যে জীবনের পরিণাম জানে না, তবু 'স্থিরত্বমিচ্ছন্তি' কেন? সর্বজয়ী আশা আছে তাদের মনে।

যুধিষ্ঠির ॥ এই অকারণ আশাকেই তো বলি মূঢ়তা।

বক ॥ আশা অকারণ নয়। অস্তিত্বের মূল কারণই যে আশা। আশার কারণসমুদ্রোদ্ভূত এই ব্রহ্মাণ্ড।

যুধিষ্ঠির ॥ তবে জীবসমূহের চিরজীবী হবার আকাঙ্ক্ষাকে কি ভাবে গ্রহণ করবো? চোখের উপরে তাদের মরতে দেখছি।

বক ॥ তবু কি মৃত্যু অজেয়? আমি তো দেখতে পাচ্ছি জীবপ্রবাহই অজেয়। মৃত্যু তাকে শেষ করতে পারছে কই?

যুধিষ্ঠির ॥ একথা সত্য বটে জীব মৃত্যুধর্মী, জীবপ্রবাহ অমর।

বক ॥ প্রত্যেকটি প্রাণী নিজেকে জীবপ্রবাহের অঙ্গীভূতরূপে যদি অমর কল্পনা করে তবে বাধা কোথায়?

যুধিষ্ঠির ॥ তুমি বলতে চাও প্রত্যেক জীব যুগপৎ মরণশীল ও অমর।

বক ॥ বস্তুতঃ তাই নয় কি?

যুধিষ্ঠির ॥ কিন্তু তাতে তার সান্ত্বনা কতটুকু।

বক ॥ সান্ত্বনা এই যে মৃত্যুর কবলিত হওয়ার মুহূর্তেও সে অমরত্বের আশা করতে সমর্থ হচ্ছে।

যুধিষ্ঠির ॥ তাই আশ্চর্য!

বক ॥ আশ্চর্য নয়! মৃত্যু যখন তাকে সহস্রশীর্ষে দংশন করছে তখনো সে নির্ভীক চিত্তে তার ব্যাদিত ফণার কাছে বলছে মৃত্যু আমি অমর। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি সম্ভব জানিনে।

যুধিষ্ঠির ॥ নীতিশাস্ত্রীরা একেই বলবেন মূঢ়তা।

বক ॥ প্রকৃত জ্ঞানী একেই বলেন, 'কিমাশ্চর্যমতঃপরম।' মহারাজ তুমি প্রকৃত জ্ঞানী।

যুধিষ্ঠির ॥ হে বক তোমার প্রশংসা ব্যাজস্তুতির মতো শোনাচ্ছে, যেহেতু আমার মতের অসমীচীনতাই প্রকট ক'রে দিয়েছ।

বক ॥ না মহারাজ, মানুষের উক্তি আর ব্যাখ্যা, দিব্য কল্পনা আর সজ্ঞান চিন্তা অনেক সময়েই ভিন্ন পথগামী। ব্যাখ্যা যদি ভ্রান্তপথ অবলম্বন করে তবে তার দায়িত্ব উক্তি বহন করবে কেন? তোমার উক্তি অভ্রান্ত।

যুধিষ্ঠির। কিন্তু আমি ভাবছি জীবের এই দুর্জয় আশার হেতু কি?

বক ॥ আশাই সব কার্যের হেতু কাজেই ও প্রশ্ন নিরর্থক, এ প্রসঙ্গের আলোচনা তো আগেই হ'য়েছে।

যুধিষ্ঠির ॥ তবু মনের মধ্যে সংশয়ের অঙ্কুর আঘাত করছে।

বক ॥ তোমার সংশয় নিরসন করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো মহারাজ— ব্যক্তির প্রতি জীববিশেষের প্রতি প্রকৃতির দয়ামায়া নাই, প্রকৃতি নির্মম হস্তে নির্দিষ্ট সময়াবসানে বিশেষকে উন্মূলিত করছে, কিন্তু সেই প্রকৃতিরই যত্নের অন্ত নাই, সতর্কস্নেহের অন্ত নাই জীব-প্রবাহকে রক্ষা করবার জন্যে। প্রকৃতি বিশেষের প্রতি উদাসীন নিবিশেষের প্রতি আসক্ত।

যুধিষ্ঠির ॥ তোমার কথা বাস্তব সমর্থিত সন্দেহ নাই।

বক ॥ মানুষ, মানুষের দৃষ্টান্তই গ্রহণ করা যাক্, মানুষ একাধারে বিশেষ ও নির্বিশেষ, বিশেষ জীব ও জীবপ্রবাহের অংশ, তোমার কথাতেই মহারাজ যুগপৎ মরণশীল ও অমর। এখন যে-অংশে সে বিশেষ সে-অংশে তার চিরজীবী হ'বার আশা বাতুলতামাত্র, কিন্তু যে-অংশে সে নির্বিশেষ সে অংশে সে অমর বইকি। কাজেই স্থিরত্বের ইচ্ছা আদৌ আশ্চর্য নয়।

যুধিষ্ঠির ॥ তবে 'কিমাশ্চর্য অতঃপরম্' কেন?

বক ॥ এই জন্যে যে আমাদের চোখে মানুষের বিশেষ অংশটাই প্রকট, যে অংশটা মৃত্যুধর্মী, তাই হঠাৎ তার আকাঙ্ক্ষাকে আশ্চর্য বলে মনে হয়।

যুধিষ্ঠির ॥ এই অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে অনেকে মূঢ়তা মনে করবে এ তো আগেই বলেছি।

বক ॥ মহারাজ এই আকাঙ্ক্ষা মূঢ়তা নয়। মূঢ়তা হচ্ছে বিশেষ অংশটাকে একমাত্র সত্য মনে করা। আর এর চেয়ে অন্ধমূঢ়তা কল্পনা করতেই পারি না।

যুধিষ্ঠির ॥ কিন্তু এটাই কি স্বাভাবিক নয়।

বক ॥ অন্য প্রাণীর পক্ষে যেমনই হোক মানুষের পক্ষে স্বাভাবিকতাই একমাত্র বাঞ্ছনীয় লক্ষ্য নয়। বস্তুতঃ স্বাভাবিকতার বিপরীতটাই যেন মনুষ্যত্ব। মানুষের খাদ্য-বস্ত্র অশন-ভূষণ জ্ঞান-বিজ্ঞান

কোনটাই তো স্বাভাবিকতার পরিপোষক নয়। আর মহারাজ স্বাভাবিক শব্দটার প্রতি মোহগ্রস্ত হ'য়ে ওটাকে যদি রক্ষা করতে চাও তবে বলবো যে নিজের মধ্যের বিশেষ ও নির্বিশেষকে যুগপৎ উপলব্ধিই স্বাভাবিক, একতরের অস্বীকৃতিই অস্বাভাবিক।

যুধিষ্ঠির ॥ হে বক, তুমি পরম জ্ঞানী, আর একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করো।

বক ॥ শাস্ত্র বলেছেন যে, মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে, তবে অমৃতে পৌছতে হয়। তার মানে কি? অমৃত সত্য কিন্তু মৃত্যুটাও মিথ্যা নয়। এক্ষেত্রে নির্বিশেষ সত্য কিন্তু বিশেষটাও মিথ্যা নয়। বিশেষকে অতিক্রম ক'রে নির্বিশেষে পৌছতে হয়। নির্বিশেষ অমর, বিশেষ মরণশীল।

যুধিষ্ঠির ॥ বক আরও অগ্রসর হও।

বক ॥ মৃত্যু ভয়াবহ। কেন? না তাতে জীবনের ইতি। কিন্তু কোন্ জীবনের? না বিশেষ অংশের। এখন জ্ঞানী পুরুষ নির্বিশেষ অংশকে আপনার মধ্যে উপলব্ধি করেন তাই তাঁর পক্ষে মৃত্যু জীবনের ইতি নয়, কাজেই ভয়াবহ নয়। এক শাখা ছেদিত হলে শাখান্তর অবলম্বন ক'রে বৃক্ষচারী কীট যেমন জীবিত থাকে অনেকটা সেইরূপ। মহারাজ, তোমার জ্ঞানে ও বিনয়ে আমি সন্তুষ্ট হ'য়েছি এইবারে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করো।

যুধিষ্ঠির ॥ হে মনস্বী বক আমার গতপ্রাণ ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে সঞ্জীবিত ক'রে দাও, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

বক ॥ মৃতব্যক্তি কি পুনর্জীবন লাভ করে? তুমি অন্য বর প্রার্থনা করো, সসাগরা পৃথিবী কামনা করো।

যুধিষ্ঠির ॥ আমার অন্য কামনা নাই, যদি আমার উপরে তুমি সন্তুষ্ট হ'য়ে থাকো তবে আমার ভাই চার জনের জীবনদান করো।

বক ॥ সাধু মহারাজ সাধু। তুমি কেবল জ্ঞানী নও, তুমি নির্লোভ, তুমি ভ্রাতৃপরায়ণ তুমি মনুষ্যত্বের আদর্শ। এখনি তোমার চার ভাই জীবিত হ'য়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হবে। তুমি নিজেকে ভ্রাতৃগণের মধ্যে উপলব্ধি ক'রে অমৃতের পথে অগ্রসর হও—এই আমার আশীর্বাদ মহারাজ।

উর্বশী ও অর্জুন

বনবাসপর্ব, মহাভারত

মহাভারতের বনপর্বে কথিত আছে যে অস্ত্রশিক্ষার্থ অর্জুন স্বর্গে গমন করিলে তাহার সম্বর্ধনার উদ্দেশ্যে দেবসভায় একদিন উর্বশীর নৃত্য হয়। অর্জুনের মুখ দেখিয়া উর্বশীর ধারণা হইল যে বীরশ্রেষ্ঠ তাহার সঙ্গ কামনা করে। তখন সে রাত্রিবেলায় অর্জুন সমীপে গমন করিয়া আত্মদান অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে অর্জুন সবিনয়ে তাহা প্রত্যাখ্যান করে। নিম্নোক্ত কথোপকথন সেই উপলক্ষ্য সঞ্জাত।

উর্বশী ॥ পার্থ, তুমি নিতান্ত মিথ্যাবাদী।

পার্থ ॥ মিথ্যাবাদী? পার্থ!

উর্বশী ॥ মিথ্যাবাদী এবং কপটাচারী।

পার্থ ॥ মিথ্যাবাদী এবং কপটাচারী!

উর্বশী ॥ মিথ্যাবাদী, কপটাচারী এবং নপুংসক।

পার্থ ॥ সুন্দরী, তুমি অকারণে রুষ্ট হয়েছ।

উর্বশী ॥ অকারণে! অকারণেই বটে। তুমি যদি সুপুরুষ হতে, কুণ্ঠিত কাপুরুষ না হ'তে তা হ'লে অনায়াসে আমার রোষের কারণ বুঝতে সক্ষম হ'তে।

অর্জুন ॥ আমি এখনো অক্ষম।

উর্বশী ॥ অক্ষম সন্দেহ কি! তুমি কেন অভিলাষিণী রমণীকে প্রত্যাখ্যান করলে? এই কি সুপুরুষের যোগ্য?

অর্জুন ॥ অভিমানিনী, পুরুষের যোগ্যতা বহুমুখী, সে তর্ক থাক। কিন্তু নারীর অভিলাষের দায়িত্ব কি আমার?

উর্বশী ॥ তোমার নয়? সাপুড়ে যেমন সর্পের গতিবিধি জানে, পুরুষের দৃষ্টি সম্বন্ধে আমিও তেমনি বিশেষজ্ঞ। উর্বশী কখনো পুরুষের দৃষ্টি বুঝতে ভুল করে না।

অর্জুন ॥ পুরুষে পুরুষে ভেদ আছে।

উর্বশী ॥ পুরুষে কাপুরুষে ভেদ আছে বই কি।

অর্জুন ॥ সে ভেদের কারণ বস্তুতে নেই, আছে রমণীর দৃষ্টিতে।

উর্বশী ॥ স্বর্গবেশ্যা উর্বশী সাধারণী নারী নয়।

অর্জুন ॥ অর্জুনও অসাধারণ।

উর্বশী ॥ তা বটে। পুরুষে ক্লীবত্ব অসাধারণই বটে।

অর্জুন ॥ এ অন্যায় অপবাদের আমি কি যোগ্য ?

উর্বশী ॥ যোগ্য নও ? বড় আশ্বস্ত হলাম। তবে তোমার কাছে আমার আগমন ব্যর্থ হবে না।

অর্জুন ॥ বিনা আহ্বানে আগমন কি উচিত ?

উর্বশী ॥ আহ্বান কি কেবল কণ্ঠস্বরেই সম্ভব ? সহস্র বিলাসিনীর মর্মজ্ঞ পার্থের দৃষ্টি কি আহ্বান জানাতে পারে না ?

অর্জুন ॥ উর্বশী, তুমি দেবগণের অভিলষিতা, সামান্য মানুষের দৃষ্টিকে তুমি ভুল বুঝেছ।

উর্বশী ॥ ভুল বুঝেছি ? একি অনভীষ্ট রঙ্গ। সভা মধ্যে আমি যখন নৃত্যমানা ছিলাম, তোমার দৃষ্টি কেন আর সকল অপ্সরীকে পরিত্যাগ করে আমাকেই অনুবর্তন করছিল দক্ষিণ বায়ুচঞ্চল কামিনী কুসুমের কাছে দুর্নিবার ভ্রমরের মতো ? উর্বশী ভুল বোঝেনি পার্থ। ঘূর্ণাবেগে উড্ডীন ওড়না যখন ক্ষণে ক্ষণে আমার বক্ষের উচ্চাবচ সৌন্দর্যকে প্রকাশ করছিল তখন তোমার দৃষ্টি কেন সেই রূপ লাবণ্যে বারংবার নিমজ্জিত ভাসমান হচ্ছিল তরঙ্গবন্ধুর সমুদ্রে মুক্তালোভী দুর্ধর্ষ ডুবুরীর মতো ? উর্বশী ভুল করেনি, পার্থ।

অর্জুন ॥ উর্বশীর দৃষ্টি ভুল করে নি সত্য, ভুল করেছে তার মন।

উর্বশী ॥ কি রকম ?

অর্জুন ॥ আমার দৃষ্টিকে তুমি দেখেছ ঠিকই, কেবল তার অর্থবোধে ভুল হয়েছে।

উর্বশী ॥ এমন ভুলে উর্বশী তো অভ্যস্ত নয়।

অর্জুন ॥ তার কারণ দেবতাদের দৃষ্টিতেই উর্বশী অভ্যস্ত, আর দেবতাদের মন তাদের দৃষ্টিতেই।

উর্বশী ॥ মানুষের মন যে তার দৃষ্টিতে নয়, এ কথা নূতন শুনলাম।

অর্জুন ॥ সমুদ্রের তরঙ্গলীলার নীচে যেমন মুক্তা থাকে, মানুষের হাবভাব বিলাস কলা চাতুর্যের অনেক নীচে থাকে তার মন।

উর্বশী ॥ তবে পার্থের সেই মনের কথাই না হয় শুনি।

অর্জুন ॥ বরাঙ্গিনী, আমি ব্রহ্মচারী।

উর্বশী ॥ ব্রহ্মচারী না মিথ্যাচারী।

অর্জুন ॥ এ অপবাদ কেন ?

উর্বশী ॥ প্রশংসাকে অপবাদ ব'লে ভুল করছ কেন ? কেবল উর্বশীর নয়, পার্থেরও ভুল হয়ে থাকে।

অর্জুন ॥ প্রশংসারই বা হেতু কি ?

উর্বশী ॥ ব্রহ্মচর্য মহাগুণ, এই গুণের বলেই তুমি চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা, উলুপীকে লাভ করেছ। আর যারা খুচরো আছে তাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

অর্জুন ॥ স্বর্গে আমি শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থীর অনুচিত আচরণ কর্তব্য নয়।

উর্বশী ॥ ইন্দ্র এবং চন্দ্রও এককালে শিক্ষার্থী ছিল। তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে অন্ততঃ অনুচিত হবে না!

অর্জুন ॥ মানিনী, ক্রোধবশে অন্যায় নিন্দা করছ ইন্দ্র এবং চন্দ্রের।

উর্বশী ॥ ন্যায় কি অন্যায় উর্বশীর চেয়ে বেশী কেউ জানে না।

অর্জুন ॥ অন্ততঃ আমাকে ক্ষমা করো।

উর্বশী ॥ একদিকে জোয়ারের টান মেরে বুকে তোলপাড় জাগিয়ে দেবে আর অবশেষে চন্দ্র পৃথিবীকে বলবে আমাকে ক্ষমা করো। একদিকে সমুদ্র দুই হাতে নদীর আঁচল ধরে টানবে আর অন্যদিকে মুখে বলবে ক্ষান্ত হও। পৃথিবীতে ক্ষমা সুলভ হ'তে পারে স্বর্গে অত্যন্ত দুর্লভ।

অর্জুন ॥ অঙ্গীকার ক'রে বলছি উর্বশী, আমি কখনো তোমার সঙ্গ কামনা করিনি।

উর্বশী ॥ তবে কেন দেবরাজ দূত মুখে আমাকে ব'লে পাঠালেন যে পার্থ তোমাতে আসক্ত।

অর্জুন ॥ দেবরাজ ভুল বুঝেছিলেন।

উর্বশী ॥ দেবতারা অন্তর্যামী।

অর্জুন ॥ নিজ মনের চিন্তা অপরের উপরে আরোপ করাকেই বলে অন্তর্যামিতা।

উর্বশী ॥ তবে নিজ মুখেই না হয় মনের চিন্তা ব্যক্ত করো।

অর্জুন ॥ তবে সত্য বলি চিরন্তনী। স্বর্গে যেদিন প্রথম তোমাকে দেখলাম, মনে হল মানুষের দৃষ্টি প্রথম পড়লো প্রকৃতির উপরে, মনে হ'ল তুমি কেবল নবীন নও, নবীনতা মূর্তিমতী। বুঝতে পারলাম প্রথম উষার আবির্ভাব দেখে আদিম মানুষের বিস্ময়। নৃত্যপরা তোমার বসনের ছন্দচাঞ্চল্য মনে এনে দিল সমুদ্র তরঙ্গের তালে তালে ওঠা পড়া ; তোমার চরণের লঘু গতি-ভঙ্গী মনে এনে দিল দক্ষিণ সমীরে আকম্পিত পম্পাসরোবরশায়ী রক্তপদ্মের বেপথু ; তোমার আন্দোলিত সুঠাম বাহুবল্লরী অদৃশ্য কোন দয়িতের সঙ্গে হোলি খেলায় উন্মত্ত ; তোমার উদ্ধত পীন পয়োধর তরুণ কবির কণ্ঠ নিঃসৃত মৃত্যুহীন স্তনিত বন্দনা ; হে অমোঘ-যৌবনা, নর্তমান তোমার তনুদেহটি কোন তরুণ দেবতার বেদনার আনন্দময় সঙ্গীত ; আমার বিস্ময়ের অন্ত রইলো না। অথচ তুমি পুরাতনী। বিশ্বের আদি রহস্যের সঙ্গে তোমার জন্ম, লক্ষ্মী যেদিন সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠেছিলেন, তাঁর বাম পার্শ্বে ছিল মন্দার, দক্ষিণে ছিলে তুমি ; তোমার দক্ষিণ হাতে ছিল সুধা, বাম হাতে ছিল হলাহল। সে কি আজকের কথা, মানুষ তখন কোথায় ছিল? আমরা মানুষ, মৃত্যুর দাস ; কাল-তরঙ্গের এক চূড়ায় আমাদের উদয়, কাল-তরঙ্গের অন্য গর্ভে আমাদের বিলয় ; অনন্তের আমরা কি জানি! অনন্ত আমাদের ধারণার অতীত। স্বপ্নের চোখেও বুঝি তাকে দেখা যায় না। সেই অনন্তকে দেখলাম তোমার রূপে। যদি তোমাকে মুগ্ধ নেত্রে দেখেই থাকি সে কি অপরাধ! আমরা যে অনন্তের ভিখারী ; তার দুয়ারে আসি কয়েকটি দণ্ডপলের মুষ্টি ভিক্ষা মেলে, তার পরে আবার সব অন্ধকার। প্রহরান্তের পূর্বেই মানুষের তরুণ ললাট বয়সের বলিচিহ্নে ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে যায় ; তার চোখের দৃষ্টিতে নেমে আসে অকাল সন্ধ্যার ছায়া ; অনন্ত গণ্ডুষে পান ক'রে নেয় আমাদের জীবন যৌবন। অথচ তোমার ললাটে কাল-বলাকার লঘুতম পক্ষছায়াটিও পড়েনি ; তোমার মুখরুচি আজো যমুনার নতুন জাগা চরের মতো শুভ্র সুকুমার ; গ্রহ তারার নিত্যসঙ্গী গৌরীশৃঙ্গ

শিখরের মতো অনন্তের প্রতিস্পর্ধী তোমার স্তন নিষ্কলঙ্ক। অনন্তের আকিঞ্চনের পক্ষে এর চেয়ে বিস্ময়, এর চেয়ে রহস্যময় আর কি হতে পারে। হে চিরসৌন্দর্যময়ী, মানুষ অমরত্ব চায়, নিত্যযৌবন চায়, চিরন্তনতা মানুষের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। তাই তুমি মানুষের সর্বকালের আগ্রহ।

উর্বশী ॥ সেই চিরযৌবনের পূর্ণ পাত্র আজ তোমার সম্মুখে, ভোগ করো।

অর্জুন ॥ ভোগ করা লাভ করা নয়।

উর্বশী ॥ কেন?

অর্জুন ॥ ভোগ করা শুধু বহন করা, লাভ করা হচ্ছে আত্মসাৎ করা।

উর্বশী ॥ আত্মসাৎ! সে হবার নয়।

অর্জুন ॥ কেন?

উর্বশী ॥ এ যে স্বর্গ। এখানে ভোগের পথ অবারিত, আত্মসাতের পথ এখানে রুদ্ধ।

অর্জুন ॥ কেন?

উর্বশী ॥ আত্মসাতে ক্ষয়, পৃথিবীতে প্রণয়ী প্রণয়িনীকে আত্মসাৎ করে, তাই তাদের প্রণয় এবং যৌবন দুই-ই ক্ষয়ের বশীভূত। স্বর্গ এরকম ক্ষতি সহ্য করবে না। এখানে ভোগের দানসত্র, যত ইচ্ছা ভোগ করো, রূপ যৌবন সৌন্দর্য ঐশ্বর্য যথেচ্ছ ভোগ করো তবু স্বর্গ চিরপূর্ণ থাকবে, তবু স্বর্গ চিরপূর্ণ আছে। উর্বশী, মন্দার, অমৃত তেমনি পূর্ণ আছে, প্রথম অভ্যুদয়ের প্রভাতে ঠিক যেমনটি ছিল।

অর্জুন ॥ স্বর্গই সুখী।

উর্বশী ॥ সুখী! এমনি ক'রেই একে অপরকে ভুল বোঝে!

অর্জুন ॥ কেন?

উর্বশী ॥ স্বর্গে সুখ আছে, তৃপ্তি নাই। যার সুখ যত বেশি তার তৃপ্তি তত কম; স্বর্গে সুখের চূড়ান্ত।

অর্জুন ॥ তবে আর কি চাও? তোমার কাম্য সুখ।

উর্বশী ॥ যে-উর্বশী স্বর্গ-বেশ্যা সুখ তার কাম্য সন্দেহ নাই। কিন্তু তার অনন্ত রূপ যৌবনের মধ্যে কোথায় যেন এতটুকু এক কণা অতৃপ্তি আছে, তাই উর্বশীর সুখশয্যা আজ তার শরশয্যা।

অর্জুন ॥ কি চাও তুমি ?

উর্বশী ॥ আমি মৃত্যুশীল মানবের স্পর্শ চাই।

অর্জুন। তুমি না অমর !

উর্বশী ॥ ধিক্ আমার অমরত্বে। স্বর্গের অমরত্বের পরিবর্তে যদি একদিনের মর্ত্যজীবন পেতাম !

অর্জুন ॥ আমরাও যে ঠিক ঐ কথাই বলি উল্টে, সমস্ত মর্ত্যজীবনের বদলে যদি স্বর্গের একটিমাত্র দিন পেতাম।

উর্বশী ॥ কেন ? অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা, চিরন্তনতার লোভ ? তবে কেন জাহ্নবী ধূর্জটির জটা পরিত্যাগ ক'রে হিমালয় শৃঙ্গে নামলেন, হিমালয় শৃঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে পৃথিবীতে নামলেন, মর্ত্যজনের কুটীরের দ্বারে দ্বারে এলেন বিগলিত হ'য়ে। ধূর্জটি অমর, হিমালয় চিরন্তন, আর মানুষ মুমূর্ষু। ধনঞ্জয়, উর্বশীর বক্ষ নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছে একটি মানবের দ্বারা আলিঙ্গিত হ'বার আশায়।

অর্জুন ॥ উর্বশী, অর্জুনের বক্ষ ব্যাকুল অমরত্বের লোভে।

উর্বশী ॥ সেই লোভ পূর্ণ হোক, ভোগ করো আমাকে।

অর্জুন ॥ ভোগ করা শুধু বহন করা, তাতে কি হৃদয় পূর্ণ হয় ?

উর্বশী ॥ কপট, মিথ্যাবাদী, ক্লীব, নপুংসক।

অর্জুন ॥ তুমি সুন্দরী, তুমি চিরন্তনী, তুমি অমোঘ-যৌবনা।

উর্বশী ॥ বিশ্ব বিজয়ী পার্থ তুমি কাপুরুষ।

অর্জুন ॥ উর্বশী এই রোষের মুহূর্তে তুমি অপরূপ, যেন লোহিত সমুদ্রের উপরে উষার অভ্যুদয়।

উর্বশী ॥ পার্থ তুমি ক্ষুধিত সিংহিনী দেখেছ ? ব্যর্থ অভিসারিকা রমণী তার চেয়েও ভীষণ, তার চেয়েও হিংস্র !

অর্জুন ॥ উর্বশী তোমার জীবন পূর্ণ হোক।

উর্বশী ॥ পূর্ণতা নিজের উপলব্ধির জন্য চায় নিঃস্ব হ'তে। আমি নিঃস্ব হ'তে চাই ; ঢেলে দিলাম তোমার পায়ে উপুড় ক'রে চির যৌবনের পাত্র। অর্জুন, গ্রহণ করো, দয়া করো, কৃপা করো, ক্ষণিকের মানব স্পর্শ দিয়ে দেবতার জীবন ধন্য করো।

অর্জুন ॥ সুন্দরী আমি অশক্ত।

উর্বশী ॥ অশক্ত! তুমি ক্লীব, তুমি নপুংসক। উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করবার অপরাধে তোমাকে রমণী সমাজে নপুংসকরূপে বিচরণ করতে হবে।

অর্জুন॥ অভিশাপকে আশীর্বাদ ক'রে তুলবার সাধনায় প্রবৃত্ত হ'ব।

উর্বশী ॥ আবার বলছি তুমি ক্লীব, তুমি নপুংসক, বিশ্ববিজয়ী পার্থ তুমি কাপুরুষ।

অর্জুন॥ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত।

উর্বশী ॥ ধিক উর্বশীর জীবনে যৌবনে, ছলাকলাময় সৌন্দর্যে। একটা মুমূর্ষু মানুষকে মুগ্ধ করতে তুমি অক্ষম, সহস্রবার ধিক্ তোমার দেবত্বে উর্বশী।

সৈরিন্ধ্রী (দ্রৌপদী) ও বল্লব (ভীমসেন)

এই সংলাপটিতে বিরাটরাজ গৃহে ছদ্মবেশে থাকাকালীন ভীম ও দ্রৌপদীর কীচক বধ সম্পর্কিত পরামর্শের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

সৈরিন্ধ্রী॥ ভীমসেন, ভীমসেন, বল্লব, জাগো, জাগো।

বল্লব ॥ কে? সৈরিন্ধ্রী, দ্রৌপদী। এত রাত্রে, এখানে?

সৈরিন্ধ্রী॥ স্বামীর কাছে আসতে দিনক্ষণ বিচার করতে হবে?

বল্লব ॥ তা বটে, ভুলেই গিয়েছিলাম।

সৈরিন্ধ্রী॥ আমিও সেই রকম আশঙ্কাই করেছিলাম যে হয়তো বা ভুলেই গিয়েছ।

বল্লব ॥ কি ভুলে গিয়েছি?

সৈরিন্ধ্রী॥ যে এই রাজপুরীতে তোমাদের অরক্ষিত পত্নী রয়েছে।

বল্লব ॥ অরক্ষিত? পঞ্চ স্বামী বর্তমানে?

সৈরিন্ধ্রী॥ অসহায়।

বল্লব ॥ পঞ্চ স্বামীর পত্নী অসহায়?

সৈরিন্ধ্রী॥ না, স্বামীরাই অসহায়।

বল্লব ॥ কেন ?

সৈরিন্ধ্রী ॥ নতুবা পত্নী নিত্য অপমানিত হয় কেন ?

বল্লব ॥ কে অপমান করেছে ?

সৈরিন্ধ্রী ॥ ভীমসেন এখনো তোমার ঘুমের ঘোর ভাঙেনি।

বল্লব ॥ এই তো উঠে বসেছি।

সৈরিন্ধ্রী ॥ তবে মোহের ঘোর কাটেনি ?

বল্লব ॥ বুঝলে কি করে ?

সৈরিন্ধ্রী ॥ নতুবা বিস্মৃতি কেন—যে আজ দ্রৌপদীকে সভামধ্যে কীচক পদাঘাত করলো, কেশাকর্ষণ করলো, তখন ধর্মরাজ ও তুমি দু'জনেই উপস্থিত ছিলে। পত্নীকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে তিনি না বললেন একটি কথা, তুমি না তুললে একটি অঙ্গুলি। অরক্ষিত নয় ? অসহায় নয় ? অপমান আর কাকে বলে ? অপমানের জ্বালা কমে আসে যদি তার উপরে সান্ত্বনার বৃষ্টি পড়ে। দ্রৌপদীর অপমান সত্যই সূচীভেদ্য।

বল্লব ॥ দ্রৌপদী, দ্রৌপদী।

সৈরিন্ধ্রী ॥ ও নাম আর মুখে এনো না। আমি রাজকন্যা রাজগৃহিণী অথচ এমন অসহ্য দুর্ভাগ্য বোধ করি কোন দরিদ্রের পত্নীকেও সহ্য করতে হয়নি। কৌরব রাজসভায় দুঃশাসন বস্ত্রাকর্ষণ করলো, দুর্যোধন উরু প্রদর্শন করলো, তোমরা সবাই নিস্তব্ধভাবে দেখলে। পাশা খেলায় লোকে সর্বস্ব হারায় শুনেছি, কিন্তু কে কবে শুনেছে যে পত্নীকে পণ রেখে পাশা খেলে। ধর্মরাজ! আমার স্বামী অন্যায়কে সহ্য করেন না। এখানে আবার সেই অপমানের পুনরুক্তি ঘটলো! বীর স্বামী! আমার এক স্বামী ভীমসেন ইচ্ছামাত্রে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করতে পারেন। আর এক স্বামী ধনঞ্জয় ইচ্ছামাত্রে স্বর্গ মর্ত্য জয় করতে পারেন! কাপুরুষের পত্নীরা এত অপমান কেউ সহ্য করেছে ? কা'কে জিজ্ঞাসা করবো তাই ভাবছি! ধর্মরাজ! বীর স্বামী!

বল্লব ॥ যাজ্ঞসেনী থামো, থামো, ব্রণের উপরে আর আঘাত ক'রো না। আমি কিছুই বিস্মৃত হই নি, শুধু বিস্মৃতির ভাণ ক'রে আছি।

সৈরিন্ধ্রী ॥ বিস্মৃতির ভাণ করে আছ ?

বল্লব ॥ নতুবা বাঁচবো কেমন করে ?

সৈরিন্ধ্রী ॥ এ অহেতুক ধৈর্য কেন ?

বল্লব ॥ ধৈর্য অহেতুক নয়, সমস্ত সার্থকতার হেতু। আমাদের চেয়ে ধর্মরাজ শ্রেষ্ঠ কেন ? তাঁর ধৈর্য বেশী ; আর আমাদের পঞ্চ ভ্রাতার চেয়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ কেন ? তাঁর ধৈর্য অসীম।

সৈরিন্ধ্রী ॥ মানুষের জীবন তো অসীম নয়।

বল্লব ॥ সেই জন্যই তো ধৈর্যের মূল্য। অমরের পক্ষে ধৈর্য নিরর্থক। দেবতাদের ধৈর্যের কি প্রয়োজন।

সৈরিন্ধ্রী ॥ শ্রীকৃষ্ণ তো দেবতা।

বল্লব ॥ দেবতা নন, দেবতার অবতার।

সৈরিন্ধ্রী ॥ প্রভেদটা কি ?

বল্লব ॥ নর দেহ ধারণ ক'রে ধৈর্যের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন।

সৈরিন্ধ্রী ॥ অপমানিতের চোখে ধৈর্য কাপুরুষের ভূমিকা।

বল্লব ॥ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।

সৈরিন্ধ্রী ॥ আর তোমরা ?

বল্লব ॥ তাঁর ভক্ত অনুচর।

সৈরিন্ধ্রী ॥ অপমানের সীমা যে ধৈর্যের সীমাকে ছাড়িয়ে যায়। আর কতদিন ধৈর্য ধারণ করে থাকবো ?

বল্লব ॥ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করবার আগে কতদিন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন ? স্বয়ং রামচন্দ্র রাবণকে বধ করবার আগে কতদিন ধৈর্য ধারণ ক'রেছিলেন ? স্বয়ং ইন্দ্র তারকাসুরকে বধ করার আগে কতদিন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন ?

সৈরিন্ধ্রী ॥ তাঁরা সবাই পুরুষ। নারীর ধৈর্য ক্ষণভঙ্গুর।

বল্লব ॥ পুত্রমুখ দর্শন করবার আশায় নারী কি দশ মাস ধৈর্য ধারণ ক'রে থাকে না ?

সৈরিন্ধ্রী ॥ এ যে এক বৎসর হ'তে চলল।

বল্লব ॥ বৎসরান্তে কীচক জীবিত থাকবে না।

সৈরিন্ধ্রী ॥ আর কত বিলম্ব ?

বল্লব ॥ আর তেরো রাত্রি ! আজ রাজসভায় তোমার অপমান দেখে' ঘরে এসে খড়ি পেতে গণনা করে দেখলাম আর তেরোটি রাত্রি অতিবাহিত হ'লেই আমাদের অজ্ঞাতবাসের সীমা লঙ্ঘন করবে।

সৈরিন্ধ্রী ॥ অজ্ঞাতবাসের অন্তে তোমরা রাজ্য ফিরে পাবে কিন্তু কৃষ্ণাকে আর ফিরে পাবে কিনা সন্দেহ।

বল্লব ॥ কেন ?

সৈরিন্ধ্রী ॥ লম্পটের ধৈর্য নারীর ধৈর্যের চেয়ে অল্প। কীচক তেরো রাত্রি অপেক্ষা করবে মনে হয় না।

বল্লব ॥ নারায়ণ, নারায়ণ।

সৈরিন্ধ্রী। আগামীকাল রাত্রে আমার শয়ন গৃহে সে আসবে বলে শাসিয়ে গিয়েছে।

বল্লব ॥ নারায়ণ, হতভাগ্য ভীমসেনকে ধৈর্য দাও।

সৈরিন্ধ্রী ॥ রাণী সুদেষ্ণা তার সহায়।

বল্লব ॥ ধৈর্য দাও ভগবান, ধৈর্য দাও, ভীমসেন বড় দুর্বল।

সৈরিন্ধ্রী ॥ রাজা যে কত অসহায় তা তো নিজ চক্ষেই দেখেছ।

বল্লব ॥ নারায়ণ এ কি পরীক্ষা !

সৈরিন্ধ্রী ॥ অপমানিতা হবার আগেই যাজ্ঞসেনী প্রাণত্যাগ করবে।

বল্লব ॥ দ্বাদশ বৎসর বনবাস, এক বৎসর পরগৃহে দাস বৃত্তি, এতে কি পরীক্ষার শেষ হয় নি !

সৈরিন্ধ্রী ॥ তাই বিদায় নিতে এসেছি, সূপকার।

বল্লব ॥ সূপকার ! ভীমসেন, ভীমসেন !

সৈরিন্ধ্রী ॥ সে ছিল আর এক ব্যক্তি। এ যে বল্লব, রাজার আজ্ঞাবাহী সূপকার।

বল্লব ॥ ভীমসেন ! ভীমসেন এখনো সেই ভীমসেনই আছে।

সৈরিন্ধ্রী ॥ কে বুঝবে ?

বল্লব ॥ কীচক বুঝবে।

সৈরিন্ধ্রী ॥ পায়ে ধরে মিনতি করবে ? লম্পট শুনবে না।

বল্লব ॥ দ্রৌপদী আর আঘাত করো না। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

সৈরিন্ধ্রী ॥ ভগবানের ইচ্ছা ধৈর্যধারণ। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবে?

বল্লব ॥ ভগবান যদি অন্তর্যামী হন তবে আমার মনের কথা বুঝবেন।

সৈরিন্ধ্রী ॥ ধর্মরাজ শুনলে—

বল্লব ॥ আশীর্বাদ করবেন।

সৈরিন্ধ্রী ॥ অজ্ঞাতবাসের নিয়ম।

বল্লব ॥ ধূলোয় মেশাক্ গে।

সৈরিন্ধ্রী ॥ তোমাদের স্বরূপ আবিষ্কৃত হ'লে আবার ফিরে বনবাস।

বল্লব ॥ তেমন বনবাস সহস্রবার কাম্য। শোনো, তোমার শয়নকক্ষে তুমি থাকবে না, থাকবো আমি, তারপরে একবার প্রবেশ করুক সেই লম্পট্‌টা। সে আর জীবিত গৃহত্যাগ করবে না।

সৈরিন্ধ্রী ॥ তোমার দ্বারা তা সম্ভব জানি। কিন্তু একবার ভালো ক'রে ভেবে দেখো। সামান্য একটা নারীর জন্য যশ, রাজ্য সব বিপদের মুখে ঠেলে দেবে। এমন কি কাপুরুষের, না, না, পুরুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ধৈর্য অবধি!

বল্লব ॥ নিশ্চয়, সহস্র বার।

সৈরিন্ধ্রী ॥ তার চেয়ে ধৈর্যধারণ ক'রে আর তেরো রাত্রি অপেক্ষা ক'রে থাকো।

বল্লব ॥ আর এক রাত্রিও নয়, সম্ভব হ'লে এই মুহূর্তেই।

সৈরিন্ধ্রী ॥ ধৈর্য ধারণ করো, ভীমসেন, ধৈর্য ধারণ করো।

বল্লধ ॥ অসম্ভব।

সৈরিন্ধ্রী ॥ ধৈর্য বীরের ধর্ম।

বল্লব ॥ চলো দেখিয়ে দাও কোথায় আছে সেই লম্পটটা। চলো তোমার শয়ন কক্ষে।

সৈরিন্ধ্রী ॥ সে তো আগামী রাত্রে।

বল্লব ॥ এখনও যে অনেক বিলম্ব।

সৈরিন্ধ্রী ॥ অন্ততঃ আর একটা রাত্রি ধৈর্য রক্ষা ক'রে থাকো।

বল্লব ॥ আর আমাকে ধৈর্যধারণ করতে বলো না যাজ্ঞসেনী, অজ্ঞাতবাসের জড়তা কাটিয়ে ভীমসেন এবার জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

সৈরিন্ধ্রী ॥ ভীমসেন!

বল্লব ॥ হাঁ, কীচকের হন্তারক ভীমসেন।

সৈরিন্ধ্রী ॥ স্বামী, আমার স্বামী।

বল্লব ॥ প্রিয়া, প্রাণাধিক, দ্রৌপদী।

দুর্যোধন ও শ্রীকৃষ্ণ

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে দুর্যোধন সভায় শ্রীকৃষ্ণের শান্তিদৌত্য অতি প্রসিদ্ধ উপাখ্যান। সেই উপাখ্যানটি বর্তমান সংলাপের মূল।

দুর্যোধন ॥ বাসুদেব, এতক্ষণে তোমাকে নির্জনে পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ নির্জনে কি প্রয়োজন ছিল?

দুর্যোধন ॥ তোমাকে বন্দী করতে চাই।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ দূত বন্ধনের অযোগ্য।

দুর্যোধন ॥ তুমি দূত? তুমি পাণ্ডবের সখা, মিত্র, তুমি পাণ্ডব-রথের সারথি।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তবে রথী ছেড়ে সারথিকে কেন?

দুর্যোধন ॥ দেহ ছেড়ে শিরে আঘাত করতে হয় যে-জন্যে।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ আমি শির?

দুর্যোধন ॥ না, তুমি শিরোমণি।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ পাণ্ডবের?

দুর্যোধন ॥ শুধু পাণ্ডবের নও, জগতের যেখানে যত চক্রী আছে, দুষ্ট আছে, রাজদ্রোহী আছে, তুমি সকলের শিরোমণি।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তবে খুব প্রতাপশালী বুঝতে হবে।

দুর্যোধন ॥ কিন্তু ভুল করেছ কৌরব সভায় একাকী আগমন করে।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ শান্তিপ্রস্তাববাহীর কি সসৈন্যে আসা উচিত?

দুর্যোধন ॥ উচিত নয়? যুদ্ধঘোষক একাকী আসতে পারে। কিন্তু শান্তিদূত আসবে অক্ষৌহিণীর পুরোভাগে।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ ধার্তরাষ্ট্র তোমার যুদ্ধ-নীতির মতো তোমার শান্তি-নীতিও বুদ্ধির অগোচর।

দুর্যোধন ॥ তোমার বুদ্ধিই বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা নয়।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তবে আর পাণ্ডবকে ভয় কিসের? তোমার মতে আমিই তো তাদের বুদ্ধির ভাণ্ডারী।

দুর্যোধন ॥ ভিক্ষুককে ভয় কিসের? সারাদিন ঘ্যান ঘ্যান, দাও দাও। বিরক্তি জন্মিয়ে দেয়।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ শান্তিপ্রস্তাব কি ভিক্ষুক-বৃত্তি?

দুর্যোধন ॥ নয়? ভিক্ষায় প্রেম, রাজত্ব ও শান্তি মেলে না।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তবে শান্তিপ্রতিষ্ঠার উপায় কি?

দুর্যোধন ॥ প্রস্তুতি চাই।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ কি রকম।

দুর্যোধন ॥ যেমন আমি করেছি।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ করেছ? তবে এতক্ষণ বলোনি কেন? বড়ই আহ্লাদের বিষয়।

দুর্যোধন ॥ বলবো বলেই তো নির্জনে চেয়েছি।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ এতই গুহ্য?

দুর্যোধন ॥ সৈন্যবল স্বভাবতই গোপনীয়।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ সৈন্যবল? শান্তির কথা হচ্ছিল।

দুর্যোধন ॥ ও দুই-ই এক।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ বুঝলাম না।

দুর্যোধন ॥ বন্দিশালায় গেলেই বুঝতে পারবে। সেখানে দুঃশাসন, কর্ণ, বিকর্ণ, শল্য, অশ্বত্থামা, ভগদত্ত প্রভৃতি মহারথগণ সমবেত হয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ শান্তির ব্যাখ্যাতারূপে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর সঞ্জয়কেই তো যোগ্যতর মনে করি।

দুর্যোধন ॥ যোগ্যতর বই কি! কেউ অন্ধ, কেউ বৃদ্ধ, কেউ বিপ্র, কেউ দুর্বলচিত্ত, নপুংসক সব! ওঁরা শান্তির জানে কি?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তবে দেখছি তোমার শান্তি আমার শান্তির ধারণা থেকে কিছু পৃথক!

দুর্যোধন ॥ পৃথক না হয়ে যায় না! তোমার শান্তি ভীরুর, আমার হচ্ছে বীরের শান্তি।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ নূতন বটে।

দুর্যোধন ॥ তোমার শান্তি প্রার্থনার বিষয়, আমার শান্তি দানের।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ আর কিছু পার্থক্য?

দুর্যোধন ॥ তোমার শান্তি নিষ্ক্রিয়, আমার শান্তি সক্রিয়।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ আর কিছু?

দুর্যোধন ॥ তোমার শান্তি ওঙ্কার, আমার শান্তি টঙ্কার।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ অনেক জানো দেখছি, এখন, এহেন শান্তির জন্য প্রস্তুতিটা কি রকম করেছ শুনি?

দুর্যোধন ॥ হস্তী, অশ্ব, রথী, পদাতিকে একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য হস্তিনাপুরের উপকণ্ঠে সমবেত করেছি; ধনুর্বাণ, গদা চর্ম, তোমর, ভল্ল প্রভৃতি অব্যর্থ সব অস্ত্র সংগৃহীত হয়েছে, আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, কৃপ, অশ্বত্থামা ভগদত্ত প্রভৃতি মহারথগণও উপস্থিত আছেন। এসব কি যথেষ্ট প্রস্তুতি নয়?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ যথেষ্ট, যথেষ্ট, শ্মশানের শান্তিপ্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্টেরও বেশি! কিন্তু তার চেয়ে কৌরব-পাণ্ডবে রাজ্যটা আধাআধি ভাগ করে নিলে সব দিক থেকেই ভালো হ'ত না?

দুর্যোধন ॥ পাণ্ডবদের দিক থেকে হয়তো ভালো হতো, কিন্তু সব দিক থেকে নয়।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ কেন?

দুর্যোধন ॥ ভারত-রাজ্য ও শান্তি দুই-ই অবিভাজ্য।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ অর্থাৎ।

দুর্যোধন ॥ পাশাপাশি দুই রাজা হলেই ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে যাবে।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ এখন তো এক রাজা, তাতেই বা ঠোকাঠুকি ঠেকে কই?

দুর্যোধন ॥ দুই রাজার সম্ভাবনাও যে দুই রাজার সামিল।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ অতএব উপায়?

দুর্যোধন ॥ পাণ্ডবেরা বনে যাক।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তাতেও কি অশান্তির আশঙ্কা থাকবে না? চিত্ররথ? উত্তর

গো-গৃহ ? শোনো কুরুপতি, পাণ্ডবদের হয়ে আমি অর্ধরাজত্বের দাবী ত্যাগ করলাম। তাদের পাঁচ ভাইকে পাঁচখানা গ্রাম ছেড়ে দাও।

দুর্যোধন ॥ অসম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ না-হয় একখানা গ্রামই ছেড়ে দাও।

দুর্যোধন ॥ সূচ্যগ্র পরিমাণ জমি স্বেচ্ছায় দান করবো না।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ এমন সূচীভেদ্য প্রতিজ্ঞার পরিণাম ভয়াবহ।

দুর্যোধন ॥ সে ভয়াবহতার জন্য প্রস্তুত আছি, কিছু কিঞ্চিৎ বিবরণও দিয়েছি।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ শোনো কৌরব, অশান্তির পথে কখনো শান্তি আসে না।

দুর্যোধন ॥ কেন, মরুভূমিতে কি নদী দেখা যায় না ?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ সে নদীর নাম মরীচিকা।

দুর্যোধন ॥ শূন্যে কি আকাশ-গঙ্গা নেই ?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তার অপর নাম ছায়াপথ।

দুর্যোধন ॥ পাতালে তো ভোগবতী রয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তারই সর্পিল রসনা উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে ভূমিকম্পে আর অগ্ন্যুৎপাতে। বৃথা জল্পনা রাখো। শান্তি যদি কাম্য হয়, শান্তির পথে অগ্রসর হও।

দুর্যোধন ॥ পাণ্ডবেরা শান্তি চায় ?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ পাণ্ডবেরা শান্তি চায়।

দুর্যোধন ॥ তারা শান্তির পথে অগ্রসর হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তারা শান্তির পথে অগ্রসর হয়েছে।

দুর্যোধন ॥ বটে, আমি যেন কিছু সংবাদ রাখি না। বনবাসকালে তারা কেবল জপ তপ করে কাটিয়েছে—এই কথা তুমি বলতে চাও ? কিরাতবেশী মহাদেবের কাছ থেকে পাশুপত অস্ত্র ভিক্ষা করে চেয়ে নিয়েছে কে ? স্বর্গে গিয়ে নিবাতকবচ দৈত্যকুলকে বধ করে দেবঅস্ত্র ভিক্ষা নিয়েছে কে ? দিকে দিকে আহ্বান পাঠিয়ে সপ্ত অক্ষৌহিণী সমবেত করেছে কারা ? এসব বুঝি শান্তির আয়োজন ? বাসুদেব, কৌরবের গুপ্তচরগণ বিচক্ষণ এবং বহু সংবাদবাহী !

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তোমার তথ্যসংগ্রহ সাকুল্য আর অভ্রান্ত। কিন্তু মনে রেখো পাণ্ডবগণের প্রস্তুতি তোমার প্রস্তুতির উত্তর মাত্র। এসব বিষয়ে কোনদিনই তারা পূর্বপক্ষ করেনি।

দুর্যোধন ॥ আমার প্রস্তুতির উত্তর মাত্র! ঠিক বিপরীত।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ খুলে বলো—

দুর্যোধন ॥ বনে গিয়ে পাণ্ডবগণ শক্তিসঞ্চয় করছে, এ-সংবাদ আমরা যথা-সময়ে পেয়েছিলাম, তার হাতেনাতে প্রমাণ পেলাম চিত্ররথের ব্যাপারটায় এবং আরও পরবর্তীকালের উত্তর গো-গৃহের রণ-ক্ষেত্রে। তবু তারা একাকী ছিল, অপ্রস্তুত ছিল। এরকম ক্ষেত্রে আত্মপক্ষের শক্তিবর্ধন রাজনীতির প্রথম পাঠ।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ কিন্তু প্রথম ঘটনায় তারা তোমাদের সহায় হয়েছিল।

দুর্যোধন ॥ তাতেই তো বুঝলাম ভয়ের গুরুত্ব। ঐ শক্তির যখন আমাদের প্রতিকূলে প্রয়োগ হবে! তখন!

শ্রীকৃষ্ণ ॥ যাতে কখনো না হয়, সেইজন্যেই তো এই শান্তির আহ্বান।

দুর্যোধন ॥ বটে! ঐ অছিলায় শত্রুর হাতে হাতিয়ার তুলে দিই।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ শত্রু হবে কেন?

দুর্যোধন ॥ কেন না হবে! প্রতিবেশী রাজদ্বয় শত্রু ছাড়া আর কি হতে পারে? পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সংজ্ঞাই যে শত্রুরাজ্য।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ কৌরব, ঘনিষ্ঠতম মিত্রকে নিষ্ঠুরতম শত্রু করে তোলবার ব্রত গ্রহণ করো না।

দুর্যোধন ॥ বাসুদেব ওসব ধর্মনীতির কথা বুড়োহাবড়া, পঙ্গু-নপুংসকদের সভায় উচ্চারণ করো। রাজনীতির কথা যদি জানো বলো।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ আমার রাজনীতি ধর্মনীতির অন্তর্গত।

দুর্যোধন ॥ সে-রাজনীতির পথ বনের পথ—পাণ্ডবদের জিজ্ঞাসা করে দেখো।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ কিন্তু সে-বনবাস তো ব্যর্থ হয়নি, এখনি তুমি নিজেই উল্লেখ করেছ।

দুর্যোধন ॥ বেশ তো, বনবাসের চর্চাই আর কিছুকাল তারা করুক না কেন?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ বৃথা সময়ক্ষেপে লাভ নেই। এবার বলো পাণ্ডবদের কি বলবো গিয়ে।

দুর্যোধন ॥ বলবে, তাদের শক্তিবৃদ্ধি দেখে আমাকেও শক্তি-বর্ধন করতে হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তারা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে শক্তিবৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছে।

দুর্যোধন ॥ বাসুদেব, পৃথিবীতে যখনি যেখানে যে-কেউ সৈন্য সংগ্রহ করেছে ঐ নামেই করেছে। পররাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে সৈন্য সংগ্রহ করছি স্বীকার করবে লোকে এমন নির্বোধ নয়। 'মশায়, আপনার অমূল্য মস্তকটি দ্বিখণ্ডিত করবার ইচ্ছাতেই বাঁশের লাঠিখানা তৈরি করছি,' সাধারণতঃ এমন কথা কেউ বলে না। বলে যে,' নিজের মাথা বাঁচাবার জন্যই লাঠিখানা সংগ্রহ করেছি বটে!' এই হচ্ছে রাজনীতি।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তোমার রাজনীতি অনুসারে ভ্রাতৃ-রাজত্ব মানেই শত্রু-রাজত্ব?

দুর্যোধন ॥ এবং সন্ধি নূতন ব্যূহ-রচনার অবকাশ।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ আর শান্তি ব্যাপকতর আত্মপ্রস্তুতির সুযোগ।

দুর্যোধন ॥ যেজন্যে তোমার এখানে আগমন। আমার সংবাদ এই যে, পাণ্ডবদের সমস্ত সৈন্য এখনো এসে সমবেত হয়নি, এখনো কিছু সময় লাগবে, তাই তুমি নিয়ে এসেছ শান্তিপ্রস্তাব।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ এ-সংবাদ তোমার গুপ্তচরেরা বানিয়েছে, কেননা, যুদ্ধ বাধলে সবচেয়ে বেশি লাভ সেনাপতিদের, ব্যবসায়ীদের এবং গুপ্তচর-গণের; যুদ্ধে কখনো কোন রাজা লাভবান হয়েছে এমন তো শুনিনি।

দুর্যোধন ॥ ভিক্ষুকের মুখ থেকে রাজনীতির পাঠ গ্রহণ করতে আমি অভ্যস্ত নই। ভিক্ষুকের দূত ভিক্ষুক ছাড়া আর কি? শান্তির জন্য হাত পাতে যে সে তো ভিক্ষুক।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ মৈত্রীর আহ্বান কি ভিক্ষার আহ্বান?

দুর্যোধন ॥ বীরের আবার মৈত্রী কি?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ বলবান যখন স্বেচ্ছায় আত্মসংবরণ করে তার চেয়ে অধিকতর বীরত্ব আর কি?

দুর্যোধন ॥ পাণ্ডব দুর্বল।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তুমি তো বলবান—তুমিই আত্মসংযমের উদাহরণ স্থাপন করো না কেন?

দুর্যোধন॥ আমি যুদ্ধকে ধর্ম মনে করি।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ আমি বৃথা যুদ্ধকে অধর্ম মনে করি।

দুর্যোধন॥ বৃথা কি বৃথা নয়, তার বিচার করবে কে?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ শুভবুদ্ধি।

দুর্যোধন॥ দুপক্ষের শুভ বুদ্ধিতে যদি না মেলে।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ মিলতেই হবে। শুভবুদ্ধিতে মেলায়।

দুর্যোধন॥ বাসুদেব, ক্ষুরধার তোমার বুদ্ধি ভারতবিদিত, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধার রসনায় নয়, অসিতে। তর্কে তোমার কাছে পরাস্ত হলাম।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তোমার স্বীকৃতি কি বর্তমান আলোচনা অবসানের ঘণ্টাধ্বনি?

দুর্যোধন॥ বাসুদেবের বুদ্ধি যে ভারতবিদিত, একথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তবে শোনো কৌরব, দুর্বল পাণ্ডবগণ নয়, দুর্বল তুমি; তুমি দুর্বল, কেননা, তুমি ভূতভয়গ্রস্ত। ভূতভয়গ্রস্তের চরাচরকে ভয়, কারণ ভয়ের বাসা তার নিজের অন্তরে। তোমার ভয় কেবল পাণ্ডবগণকে নয়, বিশ্ব চরাচরকে। আজ পাণ্ডবগণ উপলক্ষ্য, আগামীকাল আর কেউ হবে, গতকাল ছিল তোমার নিরীহ প্রজাবৃন্দ। পাণ্ডবেরা বনে গমন করলে তাদের প্রতি তোমার প্রজাদের গোপন সমবেদনা আছে অভিযোগে দলে দলে তাদের ধরে নিয়ে বন্দিশিবির ভরিয়ে তুলেছ। সেদিন নিশ্চয় নিজেকে অভিনন্দিত করেছিলে প্রতিদ্বন্দ্বীরহিত প্রতাপশালী ব'লে! কি বলো? তুমি সেই নিরীহ প্রজাদের চেয়েও দুর্বল, অক্ষম, অসহায়। আবার দেখো, দ্বন্দ্ব পরিহার করবার ইচ্ছায় পাণ্ডবেরা যত নত হয়েছে, তুমি তত বেশি শক্ত হয়েছ। এইতো দুর্বলতার লক্ষণ! পাণ্ডবগণ সমগ্র রাজ্য দাবী করতে পারতো, প্রার্থনা করলো কেবল অর্ধেক! পাঁচখানা গ্রাম চাইলো, তুমি বললে, একখানাও দেবে না। অবশেষে তারা একখানা গ্রাম চাইলো, সূচ্যগ্র ভূমি দেবে না হল তোমার উত্তর!

তুমি কত দুর্বল, বুঝতে পারছ কি। গ্রামমাত্রঅধীশ্বর পাণ্ডবগণও তোমার মূর্তিমান আতঙ্ক! এইতো ভয়ের লক্ষণ! ভয় থেকে হিংসা, হিংসা থেকে মহতী বিনষ্টি। সেই বিনাশের

পথের যাত্রী আজ তুমি, কিন্তু দুঃখ এই যে, সেই সর্বনাশের পথে সমস্ত ভারতকে টেনে নিয়ে চলেছ।

দুর্যোধন ॥ যে-অশান্তি নিবারণ করতে চাইছো তার স্থায়ী কারণ যে পাণ্ডবদের অর্ধ রাজ্য প্রার্থনার মধ্যেই নিহিত। ভারত রাজ্য অবিভাজ্য আর অখণ্ড, সেখানে ফাটল ধরলে তার প্রতিক্রিয়া ভারতবাসীর মনের মধ্যে দেখা দিতে বাধ্য।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ একথা আমার চেয়ে বেশি কে জানে? সেইজন্যই তো আমি তাদের পরামর্শ দিয়েছিলাম, সমগ্র রাজ্য দাবী করতে।

দুর্যোধন ॥ সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করে অর্ধেক মাত্র প্রার্থনা কি দুর্বলতার লক্ষণ নয়?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ লক্ষণ যারই হোক, শেষ পর্যন্ত সমগ্র রাজ্যই তাদের করতলগত হবে।

দুর্যোধন ॥ কারণ 'যতো ধর্মস্ততো জয়', কি বলো যাদব?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ ধর্ম নিয়ে পরিহাস করতে যাদবগণ অভ্যস্ত নয়।

দুর্যোধন ॥ তা বটে, গোপাল তাড়নায় অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে শান্তির জন্য কাঙালপনা করাই স্বাভাবিক। তা শান্তি তো আমার অনভিপ্রেত নয়। কিন্তু জটাচীরধারী পাণ্ডবের ধারণা থেকে তা কিঞ্চিৎ পৃথক্।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তোমার শান্তি রাজনৈতিক, আর আমি কামনা করি সেই শান্তি যা ধর্মনীতির অন্তর্গত। মাথায় ছাতা ধরে নিজের মাথার রৌদ্রটুকু মাত্র নিবারণ করা যায়, তাতে বিশ্বের তাপ নিবারিত হয় না। মনে রেখো কৌরব, নিছক রাজনৈতিক শান্তিতে আজকের জগতের জটিল সমস্যার সমাধান হবে না, কারণ ভূ-ভারত অবিভাজ্য বলেই তার শান্তিও অবিভাজ্য। আর রাজনৈতিক শান্তিকেই যদি আদর্শ মনে করে থাকো, তবে শনৈঃ শনৈঃ নিশির ডাকে স্বপ্নগ্রস্তের মতো সমস্ত মানবসমাজ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর অস্ত্র প্রতিযোগিতার মহাহবের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে।

দুর্যোধন ॥ কেন?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ রাজনীতিতে দেশে দেশে ভেদ; তোমার রাজনীতি আমার রাজনীতি নয়; এখন, শান্তির ভূমিকা যেখানে দেশের রাজনীতির

চেয়ে প্রশস্ত নয়, সেখানে অপর দেশের শান্তির সঙ্গে তার সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য! হিংসার যুদ্ধ থামে, কিন্তু শান্তির যুদ্ধ থামবে কিসে? যতই ধ্বংস বেশি হবে, ততই যে আদর্শসিদ্ধি! মানবোত্তর মহাশ্মশানের দিকেই রাজনৈতিক শান্তির নিশ্চিত সঙ্কেত। কৌরব, সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ হচ্ছে, যা শান্তি স্থাপনের নামে আরব্ধ হয়। এবারে সেই পালাই বুঝি আসন্ন।

দুর্যোধন। আসন্ন নয়, আরব্ধ।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ কেমন?

দুর্যোধন ॥ বাসুদেব তুমি বন্দী। কঃ কোঽত্র ভো, কই, কেউ নেই। আমিই তোমাকে বন্দী করলাম।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ সেই সঙ্গে তুমিও বন্দী হলে।

দুর্যোধন ॥ এ কি রকম প্রহেলিকা।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ প্রহেলিকা নয়, এইটেই সবচেয়ে সত্য।

দুর্যোধন ॥ কিভাবে?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ প্রহরী বন্দীর চেয়ে বেশি বদ্ধ, কারণ সে জানে না যে সে বন্দী। অস্ত্রী অস্ত্রের চেয়ে বেশি অসহায়, কারণ সে জানে না যে সে পরহস্তগত।

দুর্যোধন ॥ পরহস্তগত! কার হস্ত?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ অস্ত্রের। তুমি যখন একখানা তরবারিতে শান দিচ্ছ, তখন তরবারিখানাও যে তোমার মনকে শাণিত করে তুলছে, তা ক'জন জানে? তুমি নির্মাণ করছো একখানা অসি, ঠিক সেই সময়েই, সেই সঙ্গেই অসি নির্মাণ করছে একজন অসিচালক। তুমি ভাবছ তুমি কর্তা! প্রকৃতপক্ষে তুমি উপকরণ ঐ অসির মতোই! যেমন তুমি উপকরণ হ'য়ে পড়েছ তোমার সেনাপতি-মণ্ডলীর হাতে, অস্ত্রব্যবসায়িগণের হাতে, তোমার গুপ্তচরগণের হাতে।

দুর্যোধন ॥ আর সবচেয়ে বেশি তোমার হাতে।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ দুর্যোধন তুমি সত্যই কৃপার পাত্র। যে শান্তিকে আজ তুমি উপেক্ষা করলে একদিন তারই জন্যে লালায়িত হবে।

দুর্যোধন ॥ তখন না হয় তাকে বরণ করা যাবে।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তা হ'বার নয়। শান্তি তো সুখের পারাবত নয় যে ইঙ্গিতমাত্রে তোমার হাতে এসে বসবে। তার নিজের সময় আছে, সুযোগ আছে। সেই সময় সুযোগ তুমি উপেক্ষা করলে! তুমি সত্যই কৃপার পাত্র, সেই কথাই গিয়ে পাণ্ডবগণকে জানাবো।

দুর্যোধন ॥ যদি মুক্তি পাও।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তুমিই বা যুদ্ধোদ্যম করবে কি ভাবে—যদি না আমি তোমাকে মুক্তি দিই। দুই হাত দিয়ে বন্দীকে চেপে ধরে রাখলে অস্ত্রধারণ করবে কি ক'রে? প্রহরীর চেয়ে পঙ্গু কে—সে যে বন্দীর ভারে ভারাক্রান্ত।

দুর্যোধন ॥ আমার অসংখ্য প্রহরী আছে।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ আমারও যে অসংখ্য রূপ। একাদশ অক্ষৌহিণীর হাতজোড়া হ'য়ে থাকবে। লড়বে কে?

দুর্যোধন ॥ কথাটা মিথ্যা নয়। এখন উপায়?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ যাও, আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম।

দুর্যোধন ॥ ছোট মুখে বড় কথা।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তোমাকে এই মুক্তিদানের চেয়েও অনেক বড় কথা আজ শুনিয়েছি।

দুর্যোধন ॥ কী কথা?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ শান্তির কথা।

দুর্যোধন ॥ বাসুদেব তোমার রথ প্রস্তুত।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ আবার সাক্ষাৎ হবে।

দুর্যোধন ॥ কোথায়?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ রণক্ষেত্রে।

দুর্যোধন ॥ শান্তির প্রার্থনায় বুঝি?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ এবারে আর মানুষের কাছে নয়। বিধাতা সেদিন উদ্যত হবেন শান্তি প্রতিষ্ঠায়।

দুর্যোধন ॥ সেই ভালো। ঐ যে তোমার রথাশ্ব অধীর হ'য়ে উঠেছে।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ দুর্যোধন মনে রেখো, মহৎ সুযোগ জীবনে একেবারের অধিক

আসে না। শান্তিপ্রতিষ্ঠার আহ্বান মহত্তম সুযোগ। মানুষের ইতিহাসে এমন সুযোগ বহু যুগে একবার আসে—যার কাছে আসে সে পরম ভাগ্যবান, আর সেই দুর্লভ সুযোগ যে উপেক্ষা ক'রে হারায় সেই অভাগা সমগ্র ইতিহাসের দুঃসহতম কৃপাপাত্র!

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন

ভীষ্মপর্বে যুদ্ধারম্ভের ঠিক পূর্বে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িলে শ্রীকৃষ্ণ গীতারূপ উপদেশ দান করেন। অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন অতি প্রসিদ্ধ বিষয়। লেখক ভগবানের নূতন একটি বিভূতির কল্পনা করিয়াছেন এই সংলাপে।

শ্রীকৃষ্ণ॥ অর্জুন নিতান্ত স্নেহবশে তোমার কাছে অতিশয় গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশ করেছি, যেসব বিচিত্ররূপে আমি জগন্ময় স্বপ্রকাশ তা তোমাকে প্রদর্শন করেছি।

অর্জুন॥ ভগবন্, আপনার কৃপায় আমি ধন্য, আপনার বিচিত্র বিভূতি শ্রবণে আমি অভিভূত।

শ্রীকৃষ্ণ॥ এখন আমার আর একটি বিচিত্র বিভূতির বিবরণ তোমাকে দিতে উদ্যত।

অর্জুন॥ দেবাদিদেব, আমি অবহিত।

শ্রীকৃষ্ণ॥ রাজার সভাসদ্‌গণের মধ্যে আমি বিদূষকরূপে অবস্থিত।

অর্জুন॥ বিদূষকরূপে?

শ্রীকৃষ্ণ॥ তোমার বিস্ময়ের কারণ কি?

অর্জুন॥ সভাসদ্‌গণের মধ্যে বিদূষকের স্থান যে একেবারে নীচে।

শ্রীকৃষ্ণ॥ বৃক্ষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে শিকড়ের স্থানও তো নীচে, তাতে কি প্রমাণ হয় !

অর্জুন॥ আমি সত্যই মূঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছি, কৃপা ক'রে আমাকে বুঝিয়ে দিন।

শ্রীকৃষ্ণ॥ জগতে অসংখ্যরূপে আমি নিত্যবিদ্যমান। আকাশের নক্ষত্র হ'তে নদী সৈকতের বালুকণা, অরণ্যের পুষ্পদল হ'তে মানব মনের যাবতীয় প্রবৃত্তি সমস্তই স্ব স্ব ক্ষেত্রে আমার প্রতিনিধিত্ব করছে। কেবল অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছেই উচ্চ নীচ, ক্ষুদ্র মহৎ এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা সম্ভব। কিন্তু জগৎ স্রষ্টার কাছে কিছুই অবজ্ঞেয়, কিছুই নগণ্য নয়—তিনিই জানেন জগৎ তন্ত্রে সকলেরই নিজস্ব মূল্য বর্তমান। সৃষ্টির একমাত্র যথার্থ মর্মজ্ঞ স্রষ্টা স্বয়ং।

অর্জুন॥ এ তত্ত্ব আপনার মুখে অনেকবার শুনেছি কাজেই এ তত্ত্ব যতই গূঢ় হোক আপনার প্রসাদে আমার ধারণার অতীত নয়। কিন্তু আমি সত্যই বুঝতে অক্ষম ঐ নীচ বিদূষকটা কোন্ গুণে আপনার প্রতিনিধিত্বের দাবী রাখে !

শ্রীকৃষ্ণ॥ এই সৃষ্টি উদ্দেশ্যমূলক। এই মূল উদ্দেশ্যটা স্বীকার করলে সহজেই বুঝতে পারবে যে বিদূষকের সৃষ্টিও নিরর্থক নয়।

অর্জুন॥ কিন্তু কি সেই উদ্দেশ্য ?

শ্রীকৃষ্ণ॥ অর্জুন তুমি অবগত হও যে আমি নব রসের মধ্যে হাস্যরস এবং সভাসদগণের মধ্যে হাস্য রসিক বিদূষক।

অর্জুন॥ আপনার ব্যাখ্যায় আমার বোধের পথ আরও দুর্গম হ'য়ে উঠ্‌ল।

শ্রীকৃষ্ণ॥ তবে বলি, অবধান করো। যে-আমি ক্ষুধারূপে, তৃষ্ণারূপে, কাম-রূপে, হিংসা রূপে, প্রবৃত্তি রূপে, নিবৃত্তি রূপে, জগতে নিত্য ভ্রাম্যমাণ, সেই আমি হাস্যরূপে, হাস্যরসিকরূপে জগতে বিদ্যমান থাকবো—তা'তে বিস্ময়ের এমন কি আছে ?

অর্জুন॥ ভগবান্, নব রসের মধ্যে আপনি হাস্যরস কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ॥ সে তত্ত্ব বুঝলে, কেন আমি হাস্যরসিক তাও বুঝতে পারবে। অন্য সমস্ত রস পরমুখাপেক্ষী বা অপরের উপর নির্ভরশীল, একমাত্র হাস্য-রসই অক্ষরকুলে 'অ' অকারের ন্যায় অনন্যনির্ভর। মধুর রস সার্থকতার জন্য প্রিয়পাত্রে অপেক্ষা রাখে, বীররস বীর্য প্রকাশের

জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীর অপেক্ষা রাখে, এইভাবে সমস্ত রসই আপন সার্থকতার জন্য অপরের উপরে নির্ভর করে। কেবল হাস্যরস স্বতঃস্ফূর্ত, স্বতোচ্ছ্বাসিত, নির্জন অরণ্যচারিণী নির্ঝরিণীর ন্যায় হাস্যরস আপন বেগে, আপন লীলায় প্রবাহিত, কে উপকৃত হ'ল, আর কে হ'ল না, তার কি সন্ধান করে হাস্যরস। একমাত্র হাস্যরসিকই, যোগীর ন্যায় আপনাকে নিয়ে আপনি মত্ত থাকে হাস্যরসের এই অনন্যনির্ভরতা, এই অনন্যশরণ তাই তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ—আর এই শ্রেষ্ঠত্বের মূলে আমার বিভূতি। সদাসদগণের মধ্যে আর সকলেই রাজার মুখাপেক্ষা ক'রে থাকে, কেবল বিদূষকের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম। কিম্বা, রাজসভায় সকলেই—বিদূষকের মুখাপেক্ষী, কি পাত্র-মিত্র, কি রাজ্যেশ্বর স্বয়ং। কখন্ কোন্ উপলক্ষ্যে যে ঐ বিদূষকটা অট্টহাস্য ক'রে উঠ্‌বে—এই ভয় কারো ঘুচতে চায় না।

অর্জুন॥ এ বড় বিচিত্র ব্যাখ্যা।

শ্রীকৃষ্ণ॥ বিচিত্র কিন্তু অবাস্তব নয়। হাস্যরস আমার বিভূতি, হাস্যরসিক আমার বিভূতিমান্,—একবার স্বীকার ক'রে নিলে আর কোথাও দুরূহত্ব থাকে না। অর্জুন, জগতে হাসির বড় প্রয়োজন। হাসির শুভ্র সৈন্ধব লবণ ব্যতীত জীবন লাবণ্যহীন।

অর্জুন॥ এই মহাহবের ঠিক পূর্বাহ্ণে কি ক'রে স্বীকার করি যে জগতে হাসির প্রয়োজন! এখনই বীরের হুঙ্কারে, ধনুকের টঙ্কারে, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায়, হস্তীর বৃংহিতে, অশ্বের হ্রেষায় আর বিচিত্র হলহলায় দিঙ্মণ্ডল ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌বে, বিজয়ীর উল্লাস, আহতের আর্তরব, নিহতের নীরব ঔদাসীন্য আকাশকে আবিল করবে—এখন, এখানে হাসির কি প্রয়োজন!

শ্রীকৃষ্ণ॥ এখনই, এখানেই হাসির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। সরোবরের তীরে যার নিবাস জল সংগ্রহে সে উদাসীন হ'তে পারে, কিন্তু মরুভূমির যাত্রীর তো পানীয় সংগ্রহে এতটুকু শিথিলতা অকর্তব্য।

অর্জুন॥ আশ্চর্য।

শ্রীকৃষ্ণ। হাসির যথার্থ ব্যবহার যদি লোকে জানতো তবে এ যুদ্ধের আয়োজন

হ'তো কি ? কুরুসভায় দ্রৌপদীর অপমান হ'তো কি ? জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ হ'তো কি ?

অর্জুন ॥ কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ হিংসা, দম্ভ; লোভ একপ্রকার কুজ্ঝটিকা, হাসির সূর্যকিরণ অনায়াসে তার বক্ষ বিদারণ ক'রে দেখিয়ে দেয় তার অবাস্তবতা। মানুষে সম্বিৎ পায়।

অর্জুন ॥ তবে এ ক্ষেত্রে তা হ'ল না কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ সহজেই বুঝতে পারা উচিত। কৌরব রাজসভায় আর সবই ছিল, আর সকলেই ছিল, কেবল ছিল না সেই একটি মাত্র লোক, যার হাসির চটকায় দ্রৌপদীর বস্ত্রে হস্তার্পণের পূর্বে নিজের মূঢ়তায় লজ্জিত হ'তো দুঃশাসন।

অর্জুন ॥ কে সেই লোক ?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ বিদূষক। কৌরব রাজসভায় বিদূষক ছিল কি ? তুমি বলেছ যে বিদূষকটা নীচ। কিন্তু কেন রাজারা তাকে নীচে বসিয়ে রাখে জানো ? তাকে ভয় করে বলে।

অর্জুন ॥ না রাখলেই হয়।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ যা হয় তার পরিণাম আজকের এই মহাসংগ্রামের সূচনা। রাজারা বিদূষককে ছাড়তেও পারে না,—রাখতেও পারে না,—তাই মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা ক'রে নীচাসনে তাকে বসিয়ে রাখে।

অর্জুন ॥ স্বীকার করছি প্রভু, বিদূষকের অসীম প্রভাব আমার অজ্ঞাত ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ এখনো সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত নয়। হে অর্জুন, যুগে যুগে মানুষের ইতিহাস প্রভাবিত হয়েছে, পরিবর্তিত হয়েছে, অপ্রত্যাশিত মোড় ফিরেছে হাসির প্রভাবে। বিপ্লব হাসি হর্রা, মন্বন্তর হাসির মূর্ছনা, ইন্দ্রপাত হাসির চমক, অট্টহাস্যের অট্টবজ্রপাতে বারে বারে ধ্বসে পড়েছে গাম্ভীর্যের গম্বুজ, দম্ভের তোরণ, মূঢ়তার অভ্রভেদী অট্টালিকা। ঐ হাসিই কতবার মূঢ়তার মুখোস খসিয়ে ফেলে মানুষকে রক্ষা করেছে নিশ্চিত আত্মহত্যা থেকে। কিন্তু মানুষের এমনই নির্বুদ্ধিতা যে হাসিকে ঠেকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যেই মনের

যত দরজা জানলা সব রুদ্ধ ক'রে রাখে—কোথাও এতটুকু ফাঁক-ফুকর রাখতে চায় না পাছে হাসির রশ্মি ঢুকে পড়ে।

অর্জুন॥ আপনার শ্রীমুখে বিদূষক তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হ'ল, এক্ষণে মানুষের ইতিহাসে হাস্যরসের গুরুত্ব উপলব্ধি হল।

শ্রীকৃষ্ণ। শুধু মানুষের ইতিহাসে নয়, রসবোধের তৃতীয় নেত্র লাভ হলে সৌভাগ্যবান্ মানুষ দেখ্‌তে পায় যে চরাচর হাসির তরঙ্গে নিরন্তর আন্দোলিত।

অর্জুন। আমায় বিশদভাবে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ। আকাশে যে অসংখ্য তারকা নিত্য রাত্রে উদিত হয়—বিশ্বহাসির প্রভাবে তাদের চক্ষু ঝলমল করছে। পৃথিবীতে যে অসংখ্য পুষ্পদল নিত্য বিকশিত হচ্ছে বিশ্বহাসির প্রভাবে তাদের আনন প্রফুল্ল। সমুদ্রের নিত্যধ্বনিত কল্লোলে সেই হাসির স্ফূর্তি, নদী প্রবাহ সেই হাসিকে বহন ক'রে নিয়ে চলেছে সমুদ্রাভিমুখে। পিতামহ হিমালয় সহস্র তুষার শৃঙ্গ থেকে নিত্য নিয়ত হাসির রশ্মি বিকীরণ ক'রে দিচ্ছে সমস্ত জগতে। চরাচরে নিখিল হাস্যের ধ্বনি প্রতিধ্বনি, ছবি প্রতিচ্ছবি, স্ফুরণ প্রতিস্ফুরণ। এই বিশ্বহাসির নিত্যলীলা যে দেখতে সক্ষম হয়—তার জীবন ধন্য, অর্জুন, জীবনে তার দুঃখ কোথায়!

অর্জুন॥ ভগবান, এই গূঢ়াতিগূঢ় দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব আপনার প্রসাদে আমি বুঝতে সমর্থ হলাম।

শ্রীকৃষ্ণ॥ এই বিশ্বব্যাপী হাসির উৎসব প্রভাবে তোমার মনের অবসাদ দূর হোক—আমি এই আশীর্বাদ করি।

অর্জুন॥ আমার জীবন আপনার আশীর্বাদে পূর্ণ হ'ল, ধন্য হ'ল, কৃতার্থ হ'ল—হে নন্দনন্দন ভগবন্।

যুধিষ্ঠির ও ভীষ্ম

শরশয্যাসীন ভীষ্মের সমীপে উপদেশ লাভের উদ্দেশ্যে পাণ্ডবগণ গমন করিলে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছিল তাহা অবলম্বন করিয়া এই সংলাপটি লিখিত।

যুধিষ্ঠির ॥ পিতামহ, মানুষ ধর্মপথে অবস্থান করতে বাসনা করলে কিরূপ কাজের অনুষ্ঠান করবেন? সত্য ও মিথ্যায় সমুদয় জগৎ সমাচ্ছন্ন। ধর্মার্থী ব্যক্তির ঐ দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টিকে আশ্রয় করা উচিত? সত্য কি? মিথ্যা কি? সনাতন ধর্ম কি? কোন্ সময়ে সত্য আর কোন্ সময়েই বা মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করতে হয়? আর সর্বশেষে সত্য ও ধর্মের পারস্পরিক সম্বন্ধই বা কি? এই সব দুরূহ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা মানসে আমরা শ্রীচরণে সমুপস্থিত। আমাদের আকাঙ্ক্ষা নিবারিত করুন।

ভীষ্ম ॥ তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় যেমন দুরূহ তেমনি গূঢ়। বিষয়টি অপরের বোধগম্য করা কঠিন, নিজে বোঝা অপেক্ষাকৃত সহজ—অবশ্য সে বোধও অনেক সময়েই আকস্মিক।

যুধিষ্ঠির ॥ এ যে প্রহেলিকার মতো! যে নিজে বোঝে সে অপরকে বোঝাতে অক্ষম হবে কেন?

ভীষ্ম ॥ ধর্ম ও সত্য বুদ্ধি দ্বারা আয়ত্তগম্য বিষয় নয়।

যুধিষ্ঠির ॥ জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা আয়ত্ত করা সম্ভব, তবে জ্ঞানের সঙ্গে সত্যের ও ধর্মের কি রকম সম্বন্ধ?

ভীষ্ম ॥ জ্ঞান ইন্ধন, সত্য ও ধর্ম অগ্নি।

যুধিষ্ঠির ॥ এ কথা সত্য যে ইন্ধন ও অগ্নি পরস্পরের অপেক্ষা রাখে কিন্তু এ দু'য়ের যোগাযোগ সাধন কেন কঠিন বুঝি না।

ভীষ্ম ॥ ইঙ্গিতে বল্‌তে চেষ্টা করা যাক। মনে করো, একদল পথিক তীর্থযাত্রা উপলক্ষে পর্বতমালা অতিক্রম ক'রে চলেছে। সন্ধ্যাবেলা পাকের উদ্দেশ্যে অগ্নি প্রজ্বালন আবশ্যক কিন্তু দেখলো যে, কাজটি সহজ নয়। কোথায় ইন্ধন? ইতস্ততঃ বনস্পতি আছে কিন্তু সে-সব তো ইন্ধনযোগ্য নয়। তার উপরে পর্বত শিখর সর্বদা

ভীম প্রভঞ্জনের লীলাস্থল, প্রজ্বালিত অগ্নি নির্বাপিত হয়। এমন সময় দেখতে পেলো, হঠাৎ বজ্রপাত হ'য়ে প্রাচীন এক বনস্পতি মুহূর্তে দীপ্যমান হ'য়ে উঠ্‌ল। তখন অনায়াসে সেই জ্বলন্ত স্তূপে রন্ধন সম্পন্ন করলো। বজ্রাগ্নি প্রজ্ঞা—তা আকস্মিক ও দৈবকৃপা সঞ্জাত। সত্যবোধ ও ধর্মবোধের মূলে প্রজ্ঞা। জ্ঞানে ও প্রজ্ঞায় অনেক ব্যবধান।

যুধিষ্ঠির ॥ আমরা তো সেই দিব্যাগ্নি দীপ্যমান বনস্পতির সমীপেই আগত, আমাদের প্রার্থনা পূরণ করুন।

ভীষ্ম ॥ বৎসগণ গ্রহণ করো, আমি প্রস্তুত।

যুধিষ্ঠির ॥ মহামতি, লোকে সদাসর্বদা সত্য ও ধর্ম শব্দ দু'টি একত্র বা অব্যবহিতভাবে উচ্চারণ করে। সত্য ও ধর্ম এক অথবা পৃথক অনেকেই তা জানে না। যদি এক হয় তবে দু'টি শব্দ কেন? আর যদি পৃথক হয় তবে এ দু'য়ের সম্বন্ধ কি প্রকার বর্ণনা করুন!

ভীষ্ম ॥ সত্য আধার, ধর্ম আধেয়। ধর্মকে ধারণ করে রেখেছে সত্য।

যুধিষ্ঠির ॥ আশ্চর্য কথা পিতামহ! শাস্ত্রে শুনেছি, ধর্ম ধারণ করে রেখেছে আর সমস্তকে। আপনি বলছেন, সেই ধর্ম সত্যের দ্বারা বিধৃত। এ কেমন হ'ল?

ভীষ্ম ॥ পৃথিবী সকলকে ধারণ ক'রে রেখেছে—কিন্তু তার ধারয়িতৃ কি বাসুকি নয়? বাধা কোথায়? আমার বক্তব্য এই যে সত্য না থাকলে ধর্ম নেই।

যুধিষ্ঠির ॥ তবে কি আধার আধেয় ভেদে মুখ্য গৌণ কল্পনা করতে হবে?

ভীষ্ম ॥ অবিবেকী লোকে সেইরূপ কল্পনা ক'রে থাকে। কিন্তু এরূপ কল্পনা যথার্থ নয়।

যুধিষ্ঠির ॥ কেন?

ভীষ্ম ॥ হয়তো আধার আধেয় উপমার জন্যেই এরূপ ভ্রম উপস্থিত হয়। আমার বলা উচিত ছিল দেহ ও প্রাণ।

যুধিষ্ঠির ॥ তাতেও গৌণ মুখ্য ভ্রম হওয়া সম্ভব।

ভীষ্ম ॥ তবে আত্মা ও প্রাণ। সত্য প্রাণ, ধর্ম আত্মা; দুই-ই অবিনশ্বর। দেখো, মানুষের ভাষা বস্তুবোধের সঙ্গে জড়িত। এখন বা বস্তুধর্মী

নয়, তাকে বস্তু দিয়ে বোঝাতে গেলে কিছু ভ্রম অনিবার্য হয়ে পড়ে। হয়তো আত্মা ও প্রাণ উপমায় এ ভ্রমের নিরসন ঘটে।

যুধিষ্ঠির ॥ কিন্তু দুঃখের আপেক্ষিক সম্বন্ধ কথনো পরিষ্কার হ'ল না।

ভীষ্ম ॥ প্রাণ না থাকলে আত্মা থাকে না। সত্যের বোধ না হ'লে ধর্মের বোধ সম্ভব নয়।

যুধিষ্ঠির ॥ আর সত্যের বোধ হ'লে—

ভীষ্ম ॥ ধর্মের বোধ আপনি হয়। কাজেই সত্য কি বুঝতে চেষ্টা করো। বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধিতেই সত্যের বোধ।

যুধিষ্ঠির ॥ মানুষ কেন সে চেষ্টা করবে ?

ভীষ্ম ॥ ধর্মের উপলব্ধি হবে ব'লে।

যুধিষ্ঠির ॥ ধর্মের উপলব্ধিতে মানুষের কি লাভ ?

ভীষ্ম ॥ মানুষ কি চায় ?

যুধিষ্ঠির ॥ সুখ।

ভীষ্ম ॥ তবে সুখী হবে বলেই সত্য উপলব্ধির চেষ্টা করবে মানুষ।

যুধিষ্ঠির ॥ কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, সত্যের পথ দুঃখের।

ভীষ্ম ॥ সমস্ত পথই দুঃখের। তবে মানুষ পথে চলার দুঃখ স্বীকার করে কেন ?

যুধিষ্ঠির ॥ লক্ষ্যে পৌছবে বলে—মানুষ পথের দুঃখ স্বীকার করে।

ভীষ্ম ॥ এখানেও সেই কথা। দূরদর্শী ব্যক্তি সত্য পালনের দুঃখ স্বীকার করেন ধর্মরূপ লক্ষ্যে পৌছবার আশায়—ধর্মে সুখ !

যুধিষ্ঠির ॥ তবে কি ব্যবহারিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সত্য ও ধর্মকে এক বলে গ্রহণ করতে পারি ?

ভীষ্ম ॥ দু'য়ে এমন অঙ্গাঙ্গী জড়িত যে বাধা দেখি না, শেষ পর্যন্ত সত্যবোধে ও ধর্মবোধে কোন ভেদ থাকে না।

যুধিষ্ঠির ॥ পিতামহ, এবারে কৃপা ক'রে সত্য কথন সম্বন্ধে উপদেশ দান করুন।

ভীষ্ম ॥ বৎস, সমুদয় লোকের দুর্জ্ঞেয় বিষয় কথনে উদ্যত হ'য়েছি, প্রণিধান করো। যে স্থানে সত্য মিথ্যারূপে ও মিথ্যা সত্যরূপে পরিণত হয়, সেখানে সত্য কথা না বলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ কর্তব্য।

যুধিষ্ঠির ॥ এরূপ নির্দেশে কি যথেচ্ছাচার এসে পড়বে না ?

ভীষ্ম ॥ সংসারে কোন্ ক্ষেত্রে সে আশঙ্কা নাই ? বিধি নিষেধের ব্যভিচার হবে আশঙ্কা করলে বিধি নিষেধ দান থেকে বিরত হ'তে হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো কোনখানে সত্য মিথ্যায় এবং মিথ্যা সত্যে পরিণত হ'তে পারে সে বিচারের জন্য জ্ঞানের আবশ্যক। জ্ঞানের নেত্রহীন ব্যক্তি সত্য দর্শন করতে সক্ষম নয়। যিনি এই ভাবে সত্য মিথ্যার বিচার করতে পারেন সমাজে তিনি ধার্মিকরূপে পরিচিত হ'য়ে থাকেন।

যুধিষ্ঠির ॥ সত্যের এ হেন ব্যবহার আমার কাছে নূতন।

ভীষ্ম ॥ তাতে বিচলিত হ'য়ো না, কারণ যথার্থ ধর্ম স্থির করা দুঃসাধ্য। আরও শ্রবণ করো। প্রাণিগণের অভ্যুদয়, ক্লেশনিবারণ ও পরিত্রাণের নিমিত্তই ধর্মের সৃষ্টি, অতএব যা'তে প্রজাগণ অভ্যুদয়-শালী, ক্লেশবিহীন ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়—তাই যথার্থ ধর্ম। ভুলোনা যে সুখ লাভই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, ধর্ম যদি সুখের সন্ধান না দিতে পারে তবে লোকে কেন ধর্মাচরণ করবে ? আর যদি সুখের সন্ধান ধর্ম দিতে পারে তবে স্থায়ী সুখ পাওয়ার আশায় মানুষে আপাত দুঃখ নিশ্চয় স্বীকার করবে।

যুধিষ্ঠির ॥ বুঝবার চেষ্টা করছি আরও বলুন।

ভীষ্ম ॥ দস্যুগণ পরধন অপহরণ করবার মানসে তার অনুসন্ধান জিজ্ঞাসা করলে তাদের কাছে তা প্রকাশ না করাই প্রধান ধর্ম। ঐরূপ স্থলে যদি মৌনাবলম্বন করলে দস্যুগণ সন্দেহ করে তবে মিথ্যা বাক্য তখন দূষণীয় নয়। এমন কি ওরূপ স্থলে শপথপূর্বক মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও দোষাবহ নয়। আরও শ্রবণ করো। বিবাহ ও প্রাণসংশয়কালে, অন্যের অর্থের রক্ষা, ধর্মের বৃদ্ধি ও সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ অকর্তব্য নয়। যে যেরূপ ব্যবহার করে তার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার কর্তব্য। যে-ব্যক্তি মায়াবী তার সঙ্গে শঠতাচরণ এবং যে-ব্যক্তি সাধু তার সঙ্গে সরল ব্যবহার করাই যুক্তিসিদ্ধ। অথবা অধিক কথায় কি প্রয়োজন, যাতে বহুজনের হিত হয় সেইরূপ আচরণই সত্যাচরণ—তাহাই ধর্ম।

যুধিষ্ঠির ॥ পিতামহ আপনি তত্ত্বদর্শী, আপনার বাক্য মিথ্যা বলার দুঃসাহস

আমার নেই ; কিন্তু আপনার বাক্য দুই দিকে ধার, কিরিচাস্ত্রের ন্যায়—সত্যের দিকেও কাটে মিথ্যার দিকেও কাটে। এ হেন অস্ত্র প্রাকৃত জনের আয়ত্ত হলে সত্য মিথ্যায় প্রভেদ দূর হয়ে যায় নাকি ?

ভীষ্ম ॥ বালকে অস্ত্রে হাত কাটবে আশঙ্কায় অস্ত্র নির্মাণ বন্ধ করা চলে না। ধর্মের পথ ক্ষুরধারের ন্যায় নিশ্চিত।

যুধিষ্ঠির ॥ আপনার কথা অবশ্যই সত্য কিন্তু আমার মন যে সান্ত্বনা পায় না।

ভীষ্ম ॥ বৎস, ধর্মের তথা সত্যের দু'টি রূপ, লৌকিক ও শাশ্বত। তত্ত্বজ্ঞানের আগে পর্যন্ত দুটি রূপের সমন্বয় সম্ভব নয়—তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে দেখা যায় যে, লৌকিক রূপ ও শাশ্বত রূপ পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির ন্যায় একই বৃহৎ গতিচক্রের অন্তর্গত।

যুধিষ্ঠির ॥ আপনি ক্ষেত্র বিশেষে মিথ্যা বাক্যপ্রয়োগ ধর্মসম্মত জ্ঞাপন করেছেন।

ভীষ্ম ॥ সেখানে মিথ্যাই সত্য। সত্য মিথ্যার বিচার এত সহজ হলে ধর্মের পথ সরল হতো, ক্ষুরধারের ন্যায় বিপজ্জনক হতো না। ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ দশরথকে হত্যা করবার মানসে শপথ করে বলেছিলেন যে 'হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং', সে শপথ ভঙ্গ ধর্ম না পালন ধর্ম! বস্তুতঃ, অন্যায় সত্য পালনে যে কিরূপ অমঙ্গল হয় তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। পরশুরাম পিতৃ সত্য পালনের জন্য মাতাকে নিহত করেছিলেন—এ সত্য কি ধর্ম ? দশরথ কৈকেয়ীকে যে বরদান করবেন বলে সত্য ক'রেছিলেন সে বাক্য লঙ্ঘন করলেই কি ধর্ম হ'ত না ?

যুধিষ্ঠির ॥ রামচন্দ্রের বনগমন রূপ সত্যরক্ষা ধর্ম না অধর্ম ?

ভীষ্ম ॥ নিশ্চয় ধর্ম, কারণ তাতে বহুজনের ক্ষতির কারণ ঘটেনি।

যুধিষ্ঠির ॥ আর তাঁর সীতার বনবাস ?

ভীষ্ম ॥ সমাজ রক্ষার জন্যে তার প্রয়োজন ছিল।

যুধিষ্ঠির ॥ সীতার অপবাদ মিথ্যা জেনেও—

ভীষ্ম ॥ মিথ্যা জেনেও। কারণ সীতার অপবাদ যে সত্য এইরূপ ধারণাই ছিল বহুজনের মনে।—বস্তুতঃ, সীতার কলঙ্ক মিথ্যা হ'লেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা পেয়েছিল সত্যের গুরুত্ব।

যুধিষ্ঠির ॥ সমস্তই বিচিত্র বলে মনে হচ্ছে।

ভীষ্ম ॥ বৎস, এমন হওয়ার কারণ আগেই বর্ণনা করেছি। সত্যের লৌকিক ও শাশ্বত রূপের সামঞ্জস্য ঘটেনি এখনো তোমার মনে।

যুধিষ্ঠির ॥ সেই সামঞ্জস্য বোধ লাভের উপায় কি ?

ভীষ্ম ॥ জ্ঞানী ব্যক্তি সত্যের দু'টি রূপ দেখেন লৌকিক ও শাশ্বত। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি দেখেন দু'টি এক, লৌকিকরূপ দেহ, শাশ্বতরূপ দেহী, দেহ দেহী অভিন্ন।

যুধিষ্ঠির ॥ আমার দৃষ্টিতে কবে সেই সামঞ্জস্য প্রতিভাত হবে ?

ভীষ্ম ॥ যখন হবে তখন অপরের কাছে আর তোমার আসবার প্রয়োজন হবে না।

যুধিষ্ঠির ॥ আপনার মতো মহাজ্ঞানীর কাছেও নয় ?

ভীষ্ম ॥ নদীর তীরে যার বাস, সে কি যায় অপরের কাছে জলের প্রার্থনায় ?

যুধিষ্ঠির ॥ নদীর সন্ধান পাবো কার কাছে ?

ভীষ্ম ॥ শুভক্ষণ সমাগত হ'লে নদীই তোমাকে সন্ধান করে দ্বারে উপস্থিত হবে। তার জন্য প্রস্তুত হ'তে থাকো।

যুধিষ্ঠির ॥ আপনার আশ্বাসে কৃতার্থ হলাম। আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন পিতামহ।

যুধিষ্ঠির ও কুকুর (ধর্মরাজ)

মহাপ্রস্থানের পথে যুধিষ্ঠিরকে অনুসরণ করিয়া বকরূপী ধর্মের অনুগমন সুপ্রসিদ্ধ কাহিনী। এই সংলাপটির উপজীব্য সেই কাহিনী।

যুধিষ্ঠির ॥ হিমশৃঙ্গের আকস্মিক তুষারস্খলনের মতো একে একে চার ভাই আর দ্রৌপদী পতিত হ'ল। আমি কোথায় চলেছি? সম্মুখে কেবল উত্তুঙ্গ ধূসর শুভ্রতা, ঊর্ধ্ব থেকে আরও ঊর্ধ্বে উত্থিত, দেবলোকের অলৌকিক সোপান। আর পশ্চাতে অনন্ত প্রসারিত কুয়াশার বন্যা। রক্তার্জিত সাম্রাজ্য কোথায় অন্তর্হিত, রাজপ্রাসাদের উচ্চতম চূড়াটিও এখন দৃষ্টির অন্তরালবর্তী। কেবল প্রেতলোকের দীর্ঘশ্বাসের মতো তুহিন-স্পর্শ বায়ু, কেবল তুষার-স্খলনের বুক ফাটা আর্তনাদ, কেবল সেই সব ধ্বনির সহস্র হাতে হাত-তালির প্রতিধ্বনি। একি ভৈরব নির্জনতা! আর নির্জনতা কি এমন পরিপূর্ণ হওয়া সম্ভব, যেন কত যুগের কত অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা দিয়ে ঠাসা! একি মর্তের সীমান্ত না দেবলোকের সূচনা? নিঃসঙ্গতা যে এমনভাবে বুক চেপে ধরতে পারে তা কি জানতাম? এক সময়ে পৃথিবীর হীনতম কুকুরটার সঙ্গ পেলেও যেন বেঁচে যেতাম।

কুকুর ॥ মহারাজ, তোমার সে আশা বুঝি অপূর্ণ থাকবে না। এই যে আমি।

যুধিষ্ঠির ॥ বৎস, তুমি কে?

কুকুর ॥ তুষারস্তূপের আড়ালে এই যে আমি, তোমার আকাঙ্ক্ষিত হীনতম একটা কুকুর।

যুধিষ্ঠির ॥ তাই তো! কি আশ্চর্য, এসো বৎস, এসো।

কুকুর ॥ তবু ভালো যে এতদিনে মহারাজের চোখে পড়লাম।

যুধিষ্ঠির ॥ এতদিনে? কোথায় ছিলে এতদিন?

কুকুর ॥ মহারাজের প্রাসাদের কোণে।

যুধিষ্ঠির ॥ কি আশ্চর্য! চোখে পড়েনি তো।

কুকুর ॥ আশ্চর্য হবার কি কারণ আছে মহারাজ! দিগ্বিদিক থেকে সমাগত সামন্ত নরপতিগণের সমবেত উষ্ণীষ চূড়ার অরণ্য আড়ালে যেখানে ন্যায়, সত্য, ধর্ম প্রভৃতিও সর্বদা চোখে পড়তে চায় না, সেখানে সামান্য একটা কুকুর মহারাজের চোখে পড়বে এ কেমন করে আশা করবো?

যুধিষ্ঠির ॥ সেখানে তোমার অনাদর হয়নি তো?

কুকুর ॥ কি বলছেন মহারাজ! অনাদর? সামন্ত নরপতিগণের মতোই আমার আদর ছিল।

যুধিষ্ঠির ॥ কি আশ্চর্য! আমার ব্যবস্থা কি সত্যই এমন পক্ষপাতহীন ছিল? আর একটু খুলে বলো।

কুকুর ॥ তাঁদের জন্য প্রস্তুত খাদ্যই আমি পেতাম।

যুধিষ্ঠির ॥ বটে? পেট ভরতো?

কুকুর ॥ কুকুরের পেটও ভরে মহারাজ। অবশ্য সামন্তগণের ক্ষুধা অপরিসীম। কিন্তু মহারাজার বদান্যতাও যে অনন্ত। তাদের পাত্রের উচ্ছিষ্টে প্রায় আমার একরকম চলে যেত।

যুধিষ্ঠির ॥ উচ্ছিষ্টে? তাই বলো।

কুকুর ॥ আপনি কি ভেবেছিলেন যে, আমাকেও সামন্তগণের সঙ্গে পরিবেশন করা হয়। তাঁরা আপত্তি না করলেও আমি যে করবো।

যুধিষ্ঠির ॥ কেন?

কুকুর ॥ কীর্তিতে তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে পারবো কেন? তাঁরা মানুষ, আমি সামান্য কুকুর।

যুধিষ্ঠির ॥ আর রাত্রি যাপন করতে কোথায়?

কুকুর ॥ প্রায় ঐ সামন্তগণের সঙ্গেই।

যুধিষ্ঠির ॥ কেমন?

কুকুর ॥ আজ্ঞে, তাঁদের পালঙ্কের নীচে আমার স্থান ছিল।

যুধিষ্ঠির ॥ তাঁরা সহ্য করতেন?

কুকুর ॥ মহারাজার বারুণীর কৃপায় রাত্রিকালে শয়নের সময় সহ্য-অসহ্য কোন শক্তিই তাঁদের থাকতো না। তবে হাঁ, তাঁদের অনুচরেরা মাঝে মাঝে লগুড়াঘাতে—

যুধিষ্ঠির ॥ আহা, আহা !

কুকুর ॥ না মহারাজ, অকারণে ব্যথিত হবেন না। মানুষেরা লগুড়াঘাতকে যে রকম পীড়াদায়ক মনে করে থাকে বস্তুতঃ তা সে রকম নয়। বিশেষ কুকুরের খাদ্য তালিকার ওটা একটা অপরিহার্য অঙ্গ, আপত্তি করলে চলবে কেন ?

যুধিষ্ঠির ॥ তোমার সঙ্গে আর কেউ ছিল ?

কুকুর ॥ ছিল বই কি, তার নাম দয়া।

যুধিষ্ঠির ॥ কুক্কুরী ?

কুকুর ॥ কুক্কুরী হলে বোধ করি মানুষের পাপ কিছু লঘু হত।

যুধিষ্ঠির ॥ তবে সে কে ? চিনতে পারলাম না তো ?

কুকুর ॥ চিনতে পারলে আর সংসারের অবস্থা এরকম কেন হবে ?

যুধিষ্ঠির ॥ বুঝিয়ে দাও।

কুকুর ॥ যেদিন মহারাজা ভূরিভোজী, স্ফীতোদর সন্ন্যাসীকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করতেন, রাজধানীর লোকেরা বলাবলি করতো, আহা মহারাজার কি দয়া ! আবার যেদিন রাণীমাতা সামন্ত-গৃহিণীদের জন্য অলঙ্কার ও বস্ত্রের উপঢৌকন প্রেরণ করতেন, প্রাসাদের অনুচরেরা বলাবলি করতো আহা রাণীমার কি দয়া !

যুধিষ্ঠির ॥ ওঃ, সেই দয়ার কথা বলছ ?

কুকুর ॥ চিনেছেন তাহলে মহারাজ। জগৎ জুড়ে দয়া একই, নাম ভিন্ন।

যুধিষ্ঠির ॥ বৎস, সত্যই যদি তোমার এত অনাদর ছিল, তবে এই দুর্গম পথে, অনিশ্চয়ের মুখে আমাকে অনুসরণ করলে কেন ?

কুকুর ॥ অন্ন-ঋণ শোধ করবার ইচ্ছায়।

যুধিষ্ঠির ॥ অন্ন ঋণ শোধ ? কি রকম শুনি।

কুকুর ॥ যখন দেখলাম যে, মহারাজার রাজ্য পরিত্যাগ সঙ্কল্প ঘোষিত হওয়া মাত্র রাজকুলের পুত্র পৌত্রগণের মধ্যে চাপা উল্লাসের উচ্ছ্বাস উঠল, যখন দেখলাম যে ঠিক কবে কোন্ লগ্নে মহারাজেরা ক'ভাই মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করবেন জানবার জন্য উত্তরাধিকারী মহলে কৌতূহলের অন্ত নেই, যখন দেখলাম যে, পাছে আবার মহারাজেরা পঞ্চ ভাই ফিরে আসেন সেই আশঙ্কায় তাদের মনে প্রচণ্ড উদ্বেগ

বর্তমান, তখন স্থির করলাম মহারাজের পুত্র পৌত্রগণ যেমনই ব্যবহার করুন আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। তারপর আবার যখন দেখলাম যে, মহারাজেরা রাজধানী পরিত্যাগ করে উত্তরান্তে যাত্রা করবামাত্র, উত্তরাধিকারিগণ অশোভন ব্যস্ততায় প্রত্যাবর্তন করলো, সুষ্ঠুভাবে প্রণাম করবার জন্যেও অপেক্ষা করলো না, অনাত্মীয় প্রজাসাধারণ যতটুকু খেদ পরিতাপ করলো আত্মীয় জ্ঞাতি সমাজে সেটুকু শিষ্টতারও অভাব, তখন ভাবলাম এই হীনতম কুকুরটাই এখন মহারাজের শেষ ভরসার স্থল। ভাবলাম আর কেউ যদি মহারাজ-ভ্রাতৃগণের অনুসরণ না-ও করে তবে আমাকেই সে কাজ করতে হবে। তাই সঙ্গে চলে এসেছি।

যুধিষ্ঠির ॥ একেই অন্ন-ঋণ শোধ বলছ ?

কুকুর ॥ বললে ক্ষতি নেই। কিন্তু কেবল অনুসরণের দ্বারাই ঋণ শোধ করব না মহারাজ।

যুধিষ্ঠির ॥ আর কি উপায় আছে ? কি দিতে পারো তুমি আমাকে।

কুকুর ॥ আমি এমন কিছু দিতে পারি মহারাজের পুত্র, আত্মীয়গণ প্রচুর ঐশ্বর্যের মধ্যেও যা সব সময় দিতে পারেনি। আর তখন যদি বা পারে এখন একেবারেই অশক্ত।

যুধিষ্ঠির ॥ কি সেই অমূল্য বস্তু যা তুমি এখন দান করতে পারো ?

কুকুর ॥ মহারাজকে আমি সঙ্গদান করতে পারি, যার জন্যে মনে মনে মহারাজ একান্ত উৎসুক হয়ে উঠেছেন।

যুধিষ্ঠির ॥ হায় হতভাগ্য কুকুর !

কুকুর ॥ আজ এই মুহূর্তে আমার ভাগ্যহীনতা কি মহারাজের চেয়েও অধিক ?

যুধিষ্ঠির ॥ কেন ?

কুকুর ॥ জীবহীন এই লোক প্রায় প্রেতলোক। এখানে জীবমাত্রের মনেই জীবসঙ্গের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, মহারাজের মনেও নিশ্চয়ই জাগ্রত হয়েছে। আমার মনের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের সঙ্গ, আর আমি যদি তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না করে থাকতে পারি, তবে কে বেশি হতভাগ্য !

যুধিষ্ঠির ॥ আশ্চর্য।

কুকুর ॥ আশ্চর্য বই কি মহারাজ। রাজধানীতে সুখৈশ্বর্য এবং আত্মীয় পরিবারের মধ্যে এই সামান্ত কুকুরটাকে চোখে পড়বে—এ কথনো সম্ভব ছিল না। আর এখন কি নিষ্ঠুর বিধিলিপি, এখানে সেই অপবিত্র জীবটা ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই। তখন আমাকে চোখেও পড়েনি, আজ আমাকে ছাড়া আর কাউকে চোখেও পড়ছে না। মহারাজ বিধিলিপির অক্ষরগুলো যেমন বাঁকা, তেমনি সূক্ষ্ম, চোখে পড়াও কঠিন, অর্থবোধও সহজ নয়। মহারাজ, নীরব যে?

যুধিষ্ঠির ॥ ভেবেছিলাম এখানে ধর্ম ছাড়া আর কেউ সঙ্গী-সহায় নেই।

কুকুর ॥ এ কি অনর্থ মহারাজ। ধর্মের সঙ্গে আমার তুলনা! শুনলে ধর্মরাজ নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবেন না।

যুধিষ্ঠির ॥ কিন্তু সর্ব সহায় এবং শেষসঙ্গী ধর্ম ছাড়া আর কারো সঙ্গে তোমার উপমা তো খুঁজে পাচ্ছি না বৎস। তবে এমন সময় হয়তো আসতে পারে যখন তুমিও আমাকে পরিত্যাগ করবে, ধর্ম তখনও থাকবেন আমার সহায়।

কুকুর ॥ ধর্ম কি করবেন তিনিই জানেন, আমি কথনো মহারাজকে পরিত্যাগ করবো না।

যুধিষ্ঠির। তা কি কথনো সম্ভব?

কুকুর ॥ কেন নয়?

যুধিষ্ঠির ॥ একমাত্র ধর্ম ছাড়া জগতে আর সমস্তই মরণশীল, সরণশীল, সমস্তই নশ্বর।

কুকুর ॥ আমি অঙ্গীকার করছি আমি মহারাজকে কথনো পরিত্যাগ করবো না।

যুধিষ্ঠির ॥ যে জীব স্বয়ং অনিত্য তার এ হেন অঙ্গীকারের মূল্য কতখানি জানি না, তবে যদি সত্য হয়, তবে বুঝবো ধর্মের মতো তুমি সর্বসহায় ও শেষসঙ্গী।

কুকুর ॥ তবে দেখছি ধর্ম অনন্ত নন।

যুধিষ্ঠির ॥ সেই কথাই তো ভাবছি।

কুকুর ॥ কি ভাবছ?

যুধিষ্ঠির ॥ এতদিন যা জেনে এসেছি হয়তো তা অভ্রান্ত নয়

কুকুর ॥ তা সম্ভব নয় মহারাজ, জগতে একমাত্র ধর্মই নিত্য।

যুধিষ্ঠির ॥ তবে তুমি ?

কুকুর ॥ আমিই ধর্ম।

যুধিষ্ঠির ॥ তুমি ধর্ম ?

কুকুর ॥ ভালো করে দেখো মহারাজ!

যুধিষ্ঠির ॥ এ কি এ যে ধর্মরাজ! কুকুরটা কোথায় ?

ধর্মরাজ ॥ ওটা আমারই ছদ্মবেশ ছিল।

যুধিষ্ঠির ॥ প্রভু, তোমার ছদ্মবেশ কুকুর ?

ধর্মরাজ ॥ কেন নয় ?

যুধিষ্ঠির ॥ ওটা যে প্রাণী-জগতের নীচতম জীব।

ধর্মরাজ ॥ সেইজন্যই তো কুকুর-রূপ গ্রহণ করেছিলাম। নীচতম স্থান পর্যন্ত যদি ধর্ম না পৌঁছয় তবে উচ্চতম বাঁচবে কি ভাবে ? মূলে জল পেলে তবেই তো বৃক্ষচূড়াটি সঞ্জীবিত থাকে।

যুধিষ্ঠির ॥ এ কি আশ্চর্য!

ধর্মরাজ ॥ আশ্চর্য নয় বৎস, ধর্মের গতি বৃক্ষদেহে রসের গতির মতোই নিম্ন থেকে উর্ধ্বসঞ্চারী, বৃষ্টিধারার মতো বর্ষিত হয় না। বৎস, ধর্মের গতি নিম্নসঞ্চারী বলেই গূঢ়সঞ্চারী, গূঢ়সঞ্চারী বলেই সংসারকে সর্বদা এমন ত্রস্ত, উদ্বেলিত করে রেখেছে। ধর্মের গতি যদি গাণিতিক সত্যের মতো নিশ্চিত আর প্রত্যক্ষ হত, তবে তার চোখ এড়ানো বুদ্ধিমানের পক্ষে অসম্ভব হত না, যেমন মৃগের পক্ষে অনেক সময় অসম্ভব নয় ধনুশ্চ্যুত শরকে এড়িয়ে যাওয়া। তা তো হবার নয় বৎস, ধর্মের গতি ব্যাঘ্রের আক্রমণের মতো অতর্কিত, আকস্মিক, সমস্ত প্রত্যক্ষ গণনার অতীত। তাই এমন অব্যর্থ, তাই এমন ভয়ঙ্কর! তাই না চরাচরকে এমন করে ধরা পড়বার মুখে নিরন্তর বসিয়ে রেখেছে। লোকে যখন কল্পনা করে ধর্ম অধিষ্ঠিত কোনো দুর স্বর্গলোকে, কোনো অমূল্য রত্নবেদীতে, তখন ধর্ম হয়তো রয়েছে তার পার্শ্বে উপবিষ্ট রোগজীর্ণ ঐ কুকুরটায়।

যুধিষ্ঠির ॥ সেই অভাবিতেই তো বিস্মিত হয়ে আছি। এবার দেখা দিলে

তুমি কুকুরের ছদ্মবেশে আর সেই বনবাসকালে দেখা দিয়েছিলে বকপক্ষীর ছদ্মবেশে।

ধর্মরাজ ॥ পশুর মধ্যে কুকুর যেমন হীনতম, পাখীর মধ্যে বক তেমনি দীনতম।

যুধিষ্ঠির ॥ আর মানুষের মধ্যে ?

ধমরাজ ॥ হয়তো আছে ঐ নপুংসক শিখণ্ডীটায়। সেইজন্যেই তো সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম তাকে 'তৎ' বলা হয়েছে।

যুধিষ্ঠির ॥ কিন্তু প্রভু একটা সন্দেহ কিছুতেই দূর হচ্ছে না, বিশ্বরূপ বর্ণনায় জীবজড় চরাচরের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনকে ভগবানের প্রতিনিধি বলা হয়েছে। এখানে তার ব্যতিক্রম কেন ?

ধর্মরাজ ॥ সেখানে ধর্মের ঐশ্বর্য বর্ণিত, এখানে বর্ণিত ধর্মের শক্তি।

যুধিষ্ঠির ॥ শক্তি ? কোন্ শক্তির বিকাশ ঐ দুর্বল জীবটায়। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার হলেও না হয় বুঝতাম।

ধমরাজ ॥ ভুল বুঝতে বৎস ! শৃঙ্খলের শক্তি নির্ভর করে তার দুর্বলতম গ্রন্থিটার উপরে। সর্বদা মনে রেখো চরাচরের শক্তির চরম নির্ভর তার অশক্ততম জীবটি। তাই আমি কুকুর, তাই আমি বক, তাই আমি শিখণ্ডী। ধর্মের সম্মতি নিয়ে চলতে হতো বলেই পাণ্ডবগণের মধ্যে তুমি ছিলে দুর্বলতম, তাই শেষ পর্যন্ত তুমিই রইলে জীবিত। বৎস, যে ধর্মকে রক্ষা করে চলে তাকে রক্ষা করবার ভার ধর্ম গ্রহণ করেন। তুমি ধর্মকে রক্ষা করেছ, ধর্ম তোমাকে রক্ষা করে এসেছেন, নিয়ে এসেছেন সশরীরে তোমাকে দেবলোকের সীমান্তে। ত্বরায় চলো, দেবগণ অপেক্ষা করে আছেন।

যুধিষ্ঠির ॥ কিন্তু ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, পাত্র, মিত্র সকলকে বঞ্চিত করে একাকী স্বর্গভোগের বাসনা নেই ধর্মরাজ।

ধর্মরাজ ॥ মহারাজ, সেখানে যথাস্থানে সকলকেই দেখতে পাবে, বিষাদ পরিত্যাগ করো। ত্বরান্বিত হও। ঐ দেখো বৎস, স্বর্গের সিংহদ্বার।

চার্বাক ও গৌতম

চার্বাক জড়বাদী দার্শনিকরূপে সুপ্রসিদ্ধ। গৌতম অধ্যাত্মবাদী। তাহাদের সংলাপ জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কিত আলোচনা। বিশেষ কোন পৌরাণিক কাহিনী ইহার মূল নয়।

চার্বাক ॥ নিতান্ত মূঢ় ব্যক্তিতেও জানে যে মানুষ দেহসর্বস্ব নয়।

গৌতম ॥ তবে 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ' এই উক্তির তাৎপর্য কি ?

চার্বাক ॥ তুলাদণ্ডের অসমান দিকটায় একটু 'পাষাণ' দিতে হয়—দুটে দিককে সমান করে নেবার উদ্দেশ্যে।

গৌতম ॥ সে তো নিত্য দেখতে পাই পণ্যশালায়।

চার্বাক ॥ 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য' উক্তি সেই পাষাণ খণ্ড, চাপিয়ে দিয়েছি জীবন তুলার অসমান দিকে।

গৌতম ॥ তোমার ভাষ্য সূত্রের মতোই দুর্বোধ্য।

চার্বাক ॥ তোমাদের মতো হাড় খট্‌খটে মুনি-ঋষিরা জীবনতুলায় আত্মার দিকটায় এমন ভার চাপিয়েছে যে, দেহের পাল্লাটা উঁচু হয়ে গিয়ে ঠেকেছে নিরর্থকতার শূন্যে।

গৌতম ॥ তাই—

চার্বাক ॥ তাই আমাকে কিছু ঝোঁক দিয়ে দেহের গৌরব প্রচার করতে হয়েছে।

গৌতম ॥ শুধু প্রচারে গুরুত্ব বাড়বে কি ?

চার্বাক ॥ অবশ্যই বেড়েছে নইলে তোমার মতো জ্ঞানী ব্যক্তি কেন তর্কের আসরে নামতে যাবে ? কেন তোমাদের তারস্বরে প্রতিবাদ করতে হচ্ছে যে, দেহটা কিছু নয়।

গৌতম ॥ এটুকু ভুল। দেহটা কিছু নয় আমরা কখনো বলিনে, আমরা বলি যে দেহ ও দেহাতীতের মধ্যে গৌণ মুখ্যের সম্বন্ধ।

চার্বাক ॥ তোমাদের মতে দেহটা গৌণ।

গৌতম ॥ আর দেহাতীত মুখ্য।

চার্বাক ॥ প্রমাণ ?

গৌতম ॥ দেহটা ভস্মীভূত হলে সমূলে লোপ পায়।

চার্বাক ॥ থাকে কী ?

গৌতম ॥ দেহাতীত।

চার্বাক ॥ দেহ বাদ দিয়ে দেহাতীত কল্পনা করতে পারো ?

গৌতম ॥ কেন নয় ?

চার্বাক ॥ এই কারণে যে তোমরা সর্বদা সেই অনির্দিষ্ট পদার্থটাকে দেহের সঙ্গে জড়িয়ে উল্লেখ করো—ব'লে থাকো দেহাতীত। এখন দেহটাকে বাদ দিলে থাকে 'অতীত' অর্থাৎ এমন একটা পদার্থ যা তোমাদের ধারণার অতীত কিনা অলীক।

গৌতম ॥ কে বল্‌ল ধারণার অতীত ?

চার্বাক ॥ কী তার নাম ?

গৌতম ॥ আত্মা।

চার্বাক ॥ দেহ ধ্বংস হ'লে কি ক'রে থাকে আত্মা ?

গৌতম ॥ বাসা ধ্বংস হলেই কি বাসী ধ্বংস হয় ?

চার্বাক ॥ এখানে বাসা ও বাসী যে এক, রেশমকীট ও তার গুটির মতো।

গৌতম ॥ ঐখানেই তোমার সঙ্গে আমাদের ভেদ।

চার্বাক ॥ এ ভেদ তোমার আমার মধ্যে নয়, বাস্তব অবাস্তবের মধ্যে।

গৌতম ॥ আত্মা অবশ্যই অবাস্তব, কারণ তা বস্তুগত নয়।

চার্বাক ॥ বস্তুগত নয় এবং ধারণাগতও নয়।

গৌতম ॥ তোমার ধারণাগত না হ'তে পারে।

চার্বাক ॥ বেশ তো আমার ধারণাগত ক'রে তোল না ?

গৌতম ॥ তা দেবতাদেরও অসাধ্য।

চার্বাক ॥ চোরের সাক্ষী শৌণ্ডিক।

গৌতম ॥ কি রকম ?

চার্বাক ॥ অবাস্তব আত্মার বোধয়িতা অবাস্তব দেবতা।

গৌতম ॥ তুমি নিতান্তই বস্তুসর্বস্ব—তার অতিরিক্ত কিছু কি নেই তোমার ধারণায় ?

চার্বাক ॥ অবশ্যই আছে—তাকেই তো বলি অবাস্তব।

গৌতম ॥ তুমি দেহের উপরে সর্বস্ব পণ ক'রে বসে আছ, তোমার দেউলে হ'তে বিলম্ব নেই।

চার্বাক ॥ তবু তো আমার সম্মুখে পণ্য কিছু আছে তুমি যে একেবারে শূন্যে লাফ মেরেছ।

গৌতম ॥ কি রকম ?

চার্বাক ॥ যা নেই তার উপরে ভরসা ক'রে যা আছে তা হারালে।

গৌতম ॥ কি আছে ?

চার্বাক ॥ দেহ।

গৌতম ॥ কতক্ষণ আছে ?

চার্বাক ॥ যতক্ষণ থাকে।

গৌতম ॥ বড় ক্ষণস্থায়ী।

চার্বাক ॥ তুমিই কোন্ চিরস্থায়ী ?

গৌতম ॥ আত্মারূপে আমি অমর।

চার্বাক ॥ সেই অনিশ্চিত অনির্দিষ্ট অবাস্তব অলীক অমরত্বের উপরে আমার এতটুকু ভরসা নেই।

গৌতম ॥ দেহবাদীর এই তো স্বাভাবিক শোচনীয় পরিণাম।

চার্বাক ॥ আর দেহাতীতবাদীর পরিণামটাই বা এমন কি প্রার্থনীয় ? দেহটাকে জীর্ণ করতে করতে শুষ্ক হরতকির কোঠায় এনে ফেলেছ।

গৌতম ॥ পরিণামে তোমারও ক' খানা হাড়ের বেশি থাকবে না।

চার্বাক ॥ সেই হাড় ক' খানা কি জানো ? তোমার 'দেহাতীতের' মুখের উপরে নিক্ষিপ্ত পাশা।

গৌতম ॥ কি তার পণ ?

চার্বাক ॥ দেহ পণ।

গৌতম ॥ দেহ তো ধ্বংস হ'ল।

চার্বাক ॥ সেই কথাই তো সগৌরবে প্রচার করে শুষ্ক অট্টহাসে।

গৌতম ॥ জয়টা হ'ল কার ? দেহের না দেহাতীতের !

চার্বাক ॥ দেহের।

গৌতম ॥ কি ভাবে ?

চার্বাক ॥ দেহাস্থি নীরবে বিদ্রূপ করে দেহাতীতকে, এইখানে সব শেষ।

গৌতম ॥ তার বিদ্রূপের অর্থ ভুল বুঝেছ বলে বলেছিলাম সব শেষ কিন্তু এখন দেখছি তা শেষ হ'ল না।

চার্বাক ॥ আমরা কি অলীক তর্ক করছি না ?

গৌতম ॥ হাঁ, প্রায় দেহাতীতের কোঠায় এসে পৌছেছি।

চার্বাক ॥ অতএব ফিরে যাওয়া যাক।

গৌতম ॥ উত্তম।

চার্বাক ॥ দেহকে, জগৎকে অবহেলা ক'রো না, অসীম রহস্য, অনন্ত তার সৌন্দর্য, অমোঘ তার প্রাণ।

গৌতম ॥ ঐ আকর্ষণটুকু কাটলে দেখতে পাবে আত্মার, জগদাতীতের পরমতম ঐশ্বর্য, চার্বাক শেষ নাই তার শেষ নাই।

চার্বাক ॥ এ কথা দেহসৌন্দর্য সম্বন্ধেও প্রযোজ্য—সৌন্দর্য মাত্রেই কি অসীম নয় ?

গৌতম ॥ দেহ ধ্বংসের পরেও ?

চার্বাক ॥ পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে যেমন বিচরণ করে ভ্রমর—সৌন্দর্যের তেমনি বিচরণ দেখ, দেহ থেকে দেহান্তরে। দেহ ধ্বংসশীল, সৌন্দর্য অমর।

গৌতম ॥ তার মানে প্রকারান্তরে তুমি অমরত্ব স্বীকার করছ ?

চার্বাক ॥ সে কেবল দেহের সম্পর্কে, জগতের সম্পর্কে।

গৌতম ॥ এ বড় বিচিত্র ! তুমি সৌন্দর্য মানো, কল্যাণ মানো, শুভ মানো। এ সমস্ত কি দেহাতীত গুণ নয় ? এ সমস্ত কি মনকে আশ্রয় করে নাই ?

চার্বাক ॥ কিন্তু মন ব'লে যদি কিছু থাকে তবে সে তো রয়েছে দেহকে আশ্রয় করে, দেহ না থাকলে—

গৌতম ॥ চার্বাক তুমি জ্ঞানী হ'য়ে অজ্ঞানের অভিনয় করছ। মন যদি না থাকে তবে ভোগ করছে কে ? তুমি যখন পুষ্পের গন্ধ গ্রহণ করছ, কিম্বা সূর্যাস্তের সৌন্দর্য দর্শন করছ, তা উপভোগ করছে কে ? তোমার নাসিকা ও চক্ষু কি ?

চার্বাক ॥ অবশ্যই নয়, উপভোক্তা আমার মন।

গৌতম ॥ তবে ?

চার্বাক ॥ 'তবে' তো ওঠে না। আমি সেই থেকে বোঝাতে চেষ্টা করছি মন আছে, ধীশক্তি আছে, খুব সম্ভব আত্মা বলেও কিছু একটা

আছে—কিন্তু এ সমস্তই দেহের সম্পর্কে মাত্র আছে, তদতিরিক্তভাবে আছে কিনা জানিনে, জানবার প্রয়োজনও অনুভব করিনে।

গৌতম ॥ আচ্ছা ধরো—ভূপৃষ্ঠ থেকে মানবজাতি লোপ পেল, তখন কি পুষ্পগন্ধ থাকবে না, চন্দ্রোদয় সূর্যাস্ত থাকবে না।

চার্বাক ॥ থাকবে, কিন্তু সৌন্দর্য ও সৌগন্ধ থাকবে না।

গৌতম ॥ উপভোক্তা মনের অভাবে তবেই মনটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

চার্বাক ॥ দেহটা অপরিহার্য হ'য়ে পড়ে ব'লে। দেখো গৌতম, দেহ ও জগৎকে অস্বীকৃতির বা গৌণপদ দানের ফলে মানুষ আজো পরমপদ লাভ করতে পারছে না।

গৌতম ॥ যে-সব অসভ্য জাতি দেহ ও জগৎটাকেই প্রাধান্য দেয় তারাই বা কোন্ পরমপদ লাভ করেছে ?

চার্বাক ॥ তারাও দেহ ও জগতের যথার্থ মর্যাদা দেয় না ; তাদের চোখে এ সব জড়পিণ্ড মাত্র।

গৌতম ॥ সত্যই কি এ সব জড়পিণ্ড নয় ?

চার্বাক ॥ জড়ে যখন অজড়ের আরোপ হয় তখন তার সীমা গিয়ে চৈতন্যলোক স্পর্শ করে।

গৌতম ॥ চৈতন্যলোক ! এ কথা তোমার মুখে নূতন বটে।

চার্বাক ॥ চৈতন্যলোককে আমি অস্বীকার করিনে, সৌন্দর্য, শুভ, কল্যাণ এ সব তো চৈতন্যলোকের গুণ।

গৌতম ॥ তবে তর্কের বেলায় উল্টোপাল্টা কথা বলো কেন ?

চার্বাক ॥ তোমরা কেবলই চৈতন্যলোক মানো, আর কিছু মানতে চাও না, তাই আমি দেহটার উপরে কিছু ঝোঁক দিয়ে কথা বলে থাকি, চৈতন্য ও দেহের গুরুত্বের হেরফের ঘুচিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে।

গৌতম ॥ আর আমরা দেহকে অস্বীকার না ক'রেও চৈতন্যলোকের উপরে কেন গুরুত্ব আরোপ করি জানো ?

চার্বাক ॥ বলো।

গৌতম ॥ অতি প্রত্যক্ষ দেহ ও জগৎটা তো ইন্দ্রিয়গুলোর উপরে এমন ঘন যবনিকা টেনে দিয়ে রয়েছে যে, তদতিরিক্ত কিছু উপলব্ধ হ'তেই চায় না। তাই চৈতন্যলোকের উপরে আমরা ঝোঁক দিয়ে কথা বলি।

চার্বাক ॥ তার ফল কি হয়েছে দেখো, তোমার শিষ্যগণ স্বর্গ, মুক্তি, পরলোক বলে ক্ষেপে উঠেছে।

গৌতম ॥ তোমার দেহসর্বস্ব তত্ত্ব প্রচারেই কি বিপরীত ফল ফলেনি? তোমার শিষ্যরা দেহতন্ত্রের অধিক মানতে অসম্মত।

চার্বাক ॥ দু' দলের দু' রকম ভুল। তবু তোমার শিষ্যদের ভুলটাই অধিকতর মারাত্মক।

গৌতম ॥ হেতু?

চার্বাক ॥ স্বর্গ মুক্তি পরলোক না মানলেও এক রকম চলে যায়, কিন্তু মর্ত্য বন্ধন ইহলোক না মানলে যে অচল। অনন্তকে অস্বীকারকারী অন্ধকারে গিয়ে পড়ে, কিন্তু অন্তকে অস্বীকারকারী কি গভীরতর অন্ধকারে গিয়ে পড়ে না? অনন্তের উপরে ঝোঁক দিয়ে চলবার ফলে আমাদের ইতিহাসের নৌকাখানা এক পেশে হয়ে চলছে, পাছে নিমজ্জিত হয় আশঙ্কার। আমি অন্য পাশে কিছু অতিরিক্ত ভার চাপিয়ে দিয়েছি। ক্ষতিটা কি হয়েছে?

গৌতম ॥ কিছুই না। দু' পাশে ভার চাপাবার এলে নৌকার গতি না অতলের দিকে হয়।

চার্বাক ॥ গৌতম, ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, ভারি নৌকার চেয়ে খালি নৌকা ডুবে থাকে বেশি। আর তাছাড়া নৌকা তো খালি থাকবার জন্যে সৃষ্টি হয়নি।

গৌতম ॥ চার্বাক, তুমি দেহতন্ত্রের ঋষি, কিন্তু নিজের দেহটাকে মানো বলে তো মনে হচ্ছে না।

চার্বাক ॥ হঠাৎ এমন মনে হওয়ার কারণ?

গৌতম ॥ সকাল থেকে বিতণ্ডা করছ, দেহ মানলে দেহের ধর্ম মানতে। ক্ষুধা তৃষ্ণা কি পায়নি?

চার্বাক ॥ তার্কিকের ঐ এক বিপদ। তর্কের দৌড়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণাগুলো পাছে প'ড়ে থাকে। এখন তোমার কথায় ঐ দুটো বাচাল মুখর হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু উপায় কি?

গৌতম ॥ নিকটেই আমার আশ্রম। উত্তম মুদ্গ আর ইক্ষু গুড় আছে, আর আছে সদ্যভর্জিত পুরোডাশ সেই সঙ্গে সদ্যোগত হৈয়ঙ্গবীন। আর

ফলমূল সে সব কোন্ ঋষির আশ্রমে না থাকে। আর গতকল্য আমার এক ধনী শিষ্য সপ্ত কলস গান্ধার প্রদেশজাত সোমরস পাঠিয়ে দিয়েছে।

চার্বাক ॥ আহা-হা, এ তো বিশুদ্ধ চৈতন্যবাদীয় আশ্রমের উপযুক্ত উপকরণ নয়।

গৌতম ॥ নয়ই তো। আমরা বিশুদ্ধ চৈতন্যবাদী বলেই চৈতন্যের আধার-স্বরূপ এই দেহটার যত্ন করতে ভুলি না। আজ দয়া ক'রে আমার আতিথ্য গ্রহণ করো। অতঃপর একদিন না হয় তোমার আশ্রমে গিয়ে অতিথি হ'ব।

চার্বাক ॥ তাতে খুবই ঠকবে।

গৌতম ॥ কেন ?

চার্বাক ॥ আমার আশ্রমে গেলে গোটাকতক শুষ্ক হরতকি আমলকি আর বহেড়া ছাড়া কিছু দিতে পারবো না।

গৌতম ॥ চমৎকার! এ যে একেবারে ত্রিফলার ব্যবস্থা। কিন্তু তোমার চলে কি ক'রে ? দেহটি তো মন্দ দেখছি না।

চার্বাক ॥ আজ যে-ভাবে চল্‌ল সেইভাবেই চলে। নদীতে স্নানের ঘাটে বসে থাকি, জটাঅলা মুনি-ঋষি দেখলে তর্ক বাধিয়ে বেলা পাড়িয়ে দিই, শেযে তারা আমার মুখ বন্ধ করবার আশায় আশ্রমে নিমন্ত্রণ করে, দিব্য চলে যায়। কঠোরতপ মুনি-ঋষিগণ খায়দায় ভালো। তা'ছাড়া আশ্রমকন্যাকাগণও দেখতে শুনতে মন্দ নয়।

গৌতম ॥ তুমি বলেছ—

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

তুমি তো এ-আশ্রম সে-আশ্রমে ঘুরেই খাও। তবে ও কথার সার্থকতা কি ?

চার্বাক ॥ তোমাদের যাতে কখনো ঘৃতের অভাব না হয়, তাই ঐ উপদেশ। তোমরা ঋণ ক'রে ঘৃত কিনবে, আমি তা খাবো।

গৌতম ॥ আপাতত ঋণ করবার প্রয়োজন নেই, একটি শিষ্যের বাড়ী থেকে প্রচুর হৈয়ঙ্গবীন এসেছে।

চার্বাক ॥ তবে আর বিলম্ব নয়, শীঘ্র চলো।

ছন্দক ও সিদ্ধার্থ

সিদ্ধার্থ নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া প্রথম দুঃখের পরিচয় লাভ করিলে সারথি ছন্দক ও সিদ্ধার্থের মধ্যে এইরূপ সংলাপ হইয়াছিল বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

সিদ্ধার্থ ॥ সারথি ও কিসের শব্দ ?

ছন্দক ॥ ক্রন্দনের যুবরাজ।

সিদ্ধার্থ ॥ ক্রন্দন! কেন ?

ছন্দক ॥ সংসারে যে দুঃখ শোক আছে, যুবরাজ।

সিদ্ধার্থ ॥ কই, রাজপুরীতে তো নেই।

ছন্দক ॥ রাজপুরীতেও আছে, ফুলের স্তূপে চাপা আছে।

সিদ্ধার্থ ॥ সংসারে তবে চাপা থাকে না কেন ?

ছন্দক ॥ এত ফুল সংসারে কোথায় ?

সিদ্ধার্থ ॥ আমাকে তবে এমন প্রবঞ্চনার মধ্যে রেখেছিলে কেন ?

ছন্দক ॥ সে প্রবঞ্চনা তো আজ ঘুচলো, বয়স হ'লে সকলেরই একদিন ঘুচে থাকে।

সিদ্ধার্থ ॥ কিসের শোক · কিসের দুঃখ ?

ছন্দক ॥ কেমন ক'রে বল্‌ব যুবরাজ ? দুঃখ শোকের কারণ তো একটা নয়।

সিদ্ধার্থ ॥ বল কি! অনেক কারণ ?

ছন্দক ॥ অনেক কারণ বইকি! নূতন ক্ষত হতে পারে আবার পুরাতন ক্ষতের স্মৃতিও অসম্ভব নয়।

সিদ্ধার্থ ॥ এই সমস্তই আমার কাছে নূতন।

ছন্দক ॥ মানুষের কাছে এর চেয়ে পুরাতন আর কিছুই নেই।

সিদ্ধার্থ ॥ তবে তোমরা সবাই মিলে আমাকে এমন ভ্রমের মধ্যে রেখেছিলে কেন ?

ছন্দক ॥ তুমি যে রাজপুত্র, যুবরাজ।

সিদ্ধার্থ ॥ তার অর্থ কি হ'ল ?

ছন্দক ॥ রাজপুত্র যে ভ্রমের পুত্তলী।

সিদ্ধার্থ ॥ কিন্তু আঘাত থেকে কি বাঁচাতে পারলে ?

ছন্দক ॥ যে আঘাত একদিন জীবনের হাত থেকে আসবেই, তা আমরা দিতে যাই কেন ?

সিদ্ধার্থ ॥ তবে আজ দিলে কেন ?

ছন্দক ॥ আমি তো আঘাত দিইনি, আঘাতের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছি মাত্র।

সিদ্ধার্থ ॥ অন্য কিছু বল্‌লে না কেন ?

ছন্দক ॥ দুঃখের করুণ সুরকে আর কিছু ব'লে ব্যাখ্যা করা তো সম্ভব নয়, যুবরাজ। ক্ষত চিহ্নে ওর আপাদমস্তক আবৃত।

সিদ্ধার্থ ॥ ঐ শোন আবার ক্রন্দন। আমার রথ অন্যত্র নিয়ে চল।

ছন্দক ॥ কোথায় যাবে যুবরাজ ? যেখানে মানুষ সেখানে দুঃখ।

সিদ্ধার্থ ॥ তবে এমন স্থান নিয়ে চল যেখানে মানুষ নেই।

ছন্দক ॥ সেখানে নীরব দুঃখ নিরন্তর উদ্বেলিত হচ্ছে নিঃশব্দ নির্ঝরিণীর মূর্ছনায়।

সিদ্ধার্থ ॥ তবে ফুলের বনে নিয়ে চল, যে ফুল দিয়ে মানুষ দুঃখকে চাপা দিয়ে রাখে।

ছন্দক ॥ রথচক্রের আবর্তনে ফুলের আস্তরণ ভিন্ন হয়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়বে দুঃখের চিহ্ন।

সিদ্ধার্থ ॥ তবে ?

ছন্দক ॥ নিস্তার নাই, নিষ্কৃতি নাই। দুঃখের চক্রব্যূহে নিরস্ত্র যোদ্ধা মানুষ।

সিদ্ধার্থ ॥ দুঃখের হাত থেকে সত্যই কি নিস্তার নাই।

ছন্দক ॥ চক্রব্যূহ থেকে অভিমন্যু কি নিস্তার পেয়েছিল ?

সিদ্ধার্থ ॥ সে যে ছিল অন্যায় সংগ্রাম। সপ্তরথীর বিরুদ্ধে অভিমন্যু একা।

ছন্দক ॥ এখানেও দুঃখের সংখ্যা অল্প নয়।

সিদ্ধার্থ ॥ অভিমন্যুর পতন হয়েছিল, মানুষের জীবনধারা চল্‌ছে কি ভাবে ?

ছন্দক ॥ চলছে আবার চলছেও না !

সিদ্ধার্থ ॥ কেমন ?

ছন্দক ॥ দুঃখের তন্ত্রীতে কেউবা নাগপাশে জড়িত হয়ে মরছে, আবার কেউবা সে তন্ত্রীকে বীণায় চড়িয়ে নিয়ে সুর সাধছে।

সিদ্ধার্থ ॥ দুঃখের তন্ত্রী সুর সাধনা ?

ছন্দক ॥ সুর সাধনা বৈকি ! জগৎ সঙ্গীতে অনাদিকাল থেকে ছয় রাগ

ছত্রিশ রাগিণীর আলাপ চলছে—তার মধ্যে যে দুঃখের রাগিণীটিও বর্তমান।

সিদ্ধার্থ॥ কি আশ্চর্য!

ছন্দক ॥ আশ্চর্যান্বিত কেন হচ্ছ যুবরাজ, পাঁচ রঙের ফুলে যে তোড়া সাজাতে হয়।

সিদ্ধার্থ॥ তাই ব'লে দুঃখের ফুলেও?

ছন্দক ॥ দুঃখের ফুলটিই যে সবচেয়ে লাল।

সিদ্ধার্থ॥ দুঃখের ফুলের সৌন্দর্যে যে মুগ্ধ না হয়।

ছন্দক ॥ তার মরতে হয়।

সিদ্ধার্থ॥ দুঃখের রাগিণীর মাধুর্যে যে মুগ্ধ না হয?

ছন্দক ॥ তাকেও মরতে হয়।

সিদ্ধার্থ॥ তবে বাঁচবার উপায়?

ছন্দক ॥ ঐ তো বললাম! দুঃখের তন্ত্রী বীণায চড়িয়ে নেওয়া, দুঃখের কুসুম তোড়ায় বেঁধে নেওয়া।

সিদ্ধার্থ॥ তুমি এত কথা কোথায় শিখলে?

ছন্দক ॥ জীবন পণ্ডিতের পাঠশালায়।

সিদ্ধার্থ॥ রাজারা সে পাঠশালায় যায় না কেন?

ছন্দক ॥ রাজারা ভাবে জীবন পণ্ডিত তাদের ভৃত্য, তাই ভাবে তার কাছে শিখবার এমন কি থাকতে পারে?

সিদ্ধার্থ॥ কিন্তু তাকে তো এড়ান গেল না।

ছন্দক ॥ গেলই তো না। কপিলাবস্তুর যুবরাজকে পাঠশালায় না পেয়ে আজ একেবারে পথের মাঝখানে এসে পাকড়াও করেছে।

সিদ্ধার্থ॥ হয়তো তোমার কথাই সত্য ছন্দক। কাল রাত্রে আমি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখেছি। মধুর বীণাধ্বনি শুনে চমকে দেখি আমার শিয়রে বসে এক দিব্যকান্তি পুরষ বীণা বাজাচ্ছেন। আহা কি মধুর সে আলাপ, পূর্বজন্মের স্মৃতি মনে পড়ে যায়। আমাকে উঠে বসতে দেখে তিনি বললেন, খুব ভালো লাগছে, নয়? আমি বললাম, এমন মধুর আলাপ জীবনে শুনিনি। তিনি বললেন, ঐ তো তোমার বীণা, বাজাও না কেন। তাঁর আজ্ঞায় তুলে নিলাম বীণা,

কিন্তু কই আমার রাগিণী তো তেমন মধুর হয়ে বাজল না। আমাকে দুঃখিত দেখে তিনি বললেন, দোষ তোমার নয়, ত্রুটি তোমার বীণার। কেন ? কেন কি, গুণে দেখ তোমার আমার বীণার তার, দেখ কোন প্রভেদ আছে কি না! দুটি বীণা পরীক্ষা করে দেখি তাঁর বীণায় একটি অতিরিক্ত তন্ত্রী আছে, যার অনুরূপ নেই আমার বীণায়। তিনি বললেন, ঐটির জন্যই আমার বীণা মধুরতর।

ছন্দক ॥ সে কি রকম তার যুবরাজ ?

সিদ্ধার্থ ॥ সে তন্ত্রী যেন চোখের জলে গড়া এমন নির্মল, আর তার উপরে যেন পড়েছে আকাশের সব আলো এমনি উজ্জ্বল।

ছন্দক ॥ যুবরাজ—ঐটি হচ্ছে দুঃখের তন্ত্রী। দুঃখের তন্ত্রীকে তিনি বীণায় চড়িয়ে আয়ত্ত করতে পেরেছেন বলেই এমন মধুর তাঁর হাতের আলাপ। তার পরে কি হ'ল, যুবরাজ ?

সিদ্ধার্থ ॥ দিব্যকান্তি পুরুষ বললেন, রাজকুমার ঐ তন্ত্রীটি জুড়ে নাও তোমার বীণায়, তখন বাজবে তোমার বীণা এমন মধুর স্বরে যেমনটি আর কখনো প্রবেশ করেনি মানুষের কানে। এই ব'লে তিনি অন্তর্হিত হ'লেন।

ছন্দক ॥ যুবরাজ—ঐ কথাই কথা, জুড়ে নাও সেই তন্ত্রীটি তোমার বীণায়।

সিদ্ধার্থ ॥ দুঃখের তন্ত্রী ?

ছন্দক ॥ হাঁ, দুঃখের তন্ত্রী ? জীবনে যে পথেই যাওনা কেন দুঃখকে এড়াবার উপায় নেই। দুঃখের প্রকৃতি যখন অপরিবর্তনীয়, তখন একমাত্র উপায় মনঃপ্রকৃতির পরিবর্তনসাধন।

সিদ্ধার্থ ॥ তাতে কি হবে ?

ছন্দক ॥ যা ছিল কলরব তা হ'য়ে উঠবে সঙ্গীত, জীবন সঙ্গৎ ধ্বনিত হবে মধুরতর।

সিদ্ধার্থ ॥ তার উপায় কি ?

ছন্দক ॥ উপায় অবশ্যই আছে। ঐ দেখ কুমার, ঐ দেখ আর এক দিব্যকান্তি পুরুষ।

সিদ্ধার্থ ॥ উনি যে সন্ন্যাসী।

ছন্দক ॥ উনি পেয়েছেন সেই পথের সন্ধান, জুড়ে নিয়েছেন দুঃখের তন্ত্রী জীবন-বীণায়—তাই না ওঁর মুখে এমন দিব্য প্রশান্তি।

সিদ্ধার্থ ॥ তবে ঐ পথটাই পথ।

ছন্দক ॥ একমাত্র পথ

সিদ্ধার্থ ॥ ঘোরাও রথের মুখ, ফিরে চল প্রাসাদে। না, আর প্রাসাদে নয়, চল নগর প্রান্তে যেখানে ঐ পথের সুরু।

ছন্দক ॥ ধ্বনিত হোক তোমার বীণায় সেই মহা সঙ্গীত, জুড়িয়ে যাবে মানুষের শ্রবণ, জুড়িয়ে যাবে মানুষের জীবন। জয় হবে তোমার, জয় হোক্ তোমার হে দুঃখজিৎ মহাপুরুষ।

দেবদত্ত ও আনন্দ

দেবদত্ত বুদ্ধের জ্ঞাতিভ্রাতা, সে ছিল বুদ্ধবিরোধী। আনন্দ বুদ্ধের প্রধান শিষ্য। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ লাভের পরে উভয়ের মধ্যে এইরূপ সংলাপ হইয়াছিল কল্পনা করা হইয়াছে।

দেবদত্ত ॥ এ কি আনন্দ যে!

আনন্দ ॥ রাজপুত্র চিনতে ভুল করেননি।

দেবদত্ত ॥ তোমাদের না চিনে উপায় কি? আপাদমস্তক কাষায় মুড়ি দিয়ে সঙ সেজে বেড়াও। তা আজ এমন বিমর্ষ কেন?

আনন্দ ॥ সংবাদ পাননি? ভগবান তথাগত মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছেন।

দেবদত্ত ॥ মহাপরিনির্বাণ! সেটা আবার কি?

আনন্দ ॥ তিনি দেহরক্ষা করেছেন।

দেবদত্ত ॥ তাই বলো, মরেছেন, বাঁচা গিয়েছে। সোজাসুজি ভাষায় বল্‌লেই হয় তো শুদ্ধোদনের বেটা মরেছে। না, মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছেন, হঠাৎ ভাবলাম না জানি কি রাজত্বই বা লাভ করলেন।

আনন্দ ॥ রাজপুত্র, মহাপুরুষকে ব্যঙ্গ করতে নেই।

দেবদত্ত ॥ যত ব্যঙ্গের লক্ষ্য বুঝি আমাদের মতো সাধারণ লোক।

আনন্দ ॥ অবশ্যই নয়। কিন্তু ব্যঙ্গ দেখলেন কোথায়?

দেবদত্ত ॥ কথায় দেখিনি, আচরণে দেখতে পাই। তোমরা সব কাষায় ধারণ ক'রে, মাথা নেড়া ক'রে মুখে চোখে এমন সাত্ত্বিক ভাব ফুটিয়ে ঘুরে বেড়াও, আমাদের মতো গৃহীদের ব্যঙ্গ করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

আনন্দ ॥ এ আপনার অনুমান মাত্র।

দেবদত্ত ॥ না হয় তাই হ'ল। কিন্তু তোমরা এখন কি করবে? নাটের গুরু তো মরে বেঁচেছেন।

আনন্দ ॥ ভগবান তথাগতের নির্দেশিত পথে চলতে চেষ্টা করবো।

দেবদত্ত ॥ কি সে পথটা শুনি।

আনন্দ ॥ মহাপরিনির্বাণ লাভ করবার পূর্ব মুহূর্তে তিনি অনন্যশরণ হ'বার, আত্মদীপ হবার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন।

দেবদত্ত ॥ অনন্যশরণ তো বুঝলাম, কেবল ভিক্ষা গ্রহণ ছাড়া আর কোন কারণে পরের কাছে ঘেঁযোনা। আত্মদীপ বস্তুটি কি বুঝিয়ে দাও দেখি।

আনন্দ ॥ নিজের মনের মধ্যে আলোর সন্ধান করো, বাইরে হাত্‌ড়ে মরোনা।

দেবদত্ত ॥ অর্থাৎ—

আনন্দ ॥ অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন কি নেই সে বিষয়ে বৃথা চিন্তা ক'রে মরোনা। মনের মধ্যে আলো জ্বালাতে চেষ্টা করো—পথ আপনি চোখে পড়বে।

দেবদত্ত ॥ তোমার ভগবান্ তথাগতের কপালে দুঃখ আছে দেখছি। চেলাদের দিয়ে ঈশ্বর অস্বীকার করিয়ে গেলেন, একদিন এই চেলারাই তাঁকে ঈশ্বর বানিয়ে পূজো স্রুরু ক'রে দেবে।

আনন্দ ॥ এ কি সম্ভব?

দেবদত্ত ॥ আনন্দ, সংসার বড় বিচিত্র। এখানে আমার মতো পাষণ্ডীর কথাও মাঝে মাঝে সত্য হ'য়ে ওঠে।

আনন্দ ॥ রাজপুত্র, নিজেকে বৃথা পাষণ্ডী বলছেন কেন?

দেবদত্ত ॥ তোমার কথাই সত্য আনন্দ, বোধ করি বৃথাই নিজেকে পাষণ্ডী বলছি। যখন শুনলাম যে তোমাদের গুরু পিতৃহন্তা অজাতশত্রুকে ক্ষমা করেছেন, তখন নিজেকে আর পাষণ্ডী মনে করবার হেতু খুঁজে পাইনে।

আনন্দ ॥ অজাতশত্রু সত্যই কৃপার পাত্র।

দেবদত্ত ॥ বলো কি! এত বড় মহাপুরুষের করুণা লাভ করবার পরেও। আনন্দ, রাজপুত্র বলেই তোমাদের গুরু পিতৃহন্তা অজাতশত্রুকে কোল দিয়েছেন।

আনন্দ ॥ না রাজপুত্র, তাঁর আর কোথাও স্থান ছিল না বলেই তথাগত কোল দিয়েছেন।

দেবদত্ত ॥ তোমাদের স্বদ্ধর্ম আমার বুদ্ধির অতীত। পিতৃহন্তা ক্ষমার যোগ্য হ'লেও ক্ষমার অযোগ্য কি?

আনন্দ ॥ কিছুই নয়।

দেবদত্ত ॥ কিছুই নয়! তবে লোকস্থিতি রক্ষার উপায় কি? কোন দোষ যদি ক্ষমার অযোগ্য না হয় তবে সমাজবন্ধন যে আলগা হ'য়ে যাবে।

আনন্দ ॥ রাজবিধানের ক্ষেত্রে বৃহৎ সংসারকে বাঁধা কি সম্ভব?

দেবদত্ত ॥ তবে কি হবে সেই বন্ধন?

আনন্দ ॥ অপ্রমেয় করুণা।

দেবদত্ত ॥ করুণা তো শূন্যতা।

আনন্দ ॥ বিনিসূতায় গাঁথা মালা কি দেখেননি রাজপুত্র?

দেবদত্ত ॥ সে ভাবে মালাই গাঁথা যায়, মানুষের সঙ্গে মানুষকে গাঁথা যায় না।

আনন্দ ॥ রাজবিধানের সূত্রে গ্রথিত মানুষ তো বন্দী, কারাগারের জীব।

দেবদত্ত ॥ করুণার অবাস্তব বন্ধনে যুক্ত মানুষ তো উন্মাদাগারের জীব, সেখানে সবই গ্রাহ্য, সবই নিয়ম, সবই ক্ষমার্হ।

আনন্দ ॥ রাজপুত্র, মহাকাশে সঞ্চরমান গ্রহ নক্ষত্র কোন্ বন্ধনে বদ্ধ? নিত্যনিয়মী ঋতুপর্যায় আসে যায় কোন্ বন্ধনের সূত্রে?

দেবদত্ত ॥ কোনো অদৃশ্য শক্তি হবে।

আনন্দ ॥ সেই অদৃশ্য শক্তিকেই বিশ্বব্যাপী করুণা বল্‌লে ক্ষতি কি

দেবদত্ত ॥ সেটা তো তোমার অনুমান।

আনন্দ ॥ অন্ততঃ রাজবিধান যে নয় তার তো প্রমাণ অনাবশ্যক।

দেবদত্ত ॥ ধরো যদি তা-ই হয়, তবু তার সঙ্গে মানবের সম্পর্ক কি?

আনন্দ ॥ বিশ্বব্যাপী করুণা না থাকলে মানুষের মনে করুণা এলো কোথা থেকে? পল্বলের গণ্ডুষ প্রমাণ জলের অস্তিত্বই কি প্রমাণ করে না যে মহাজলধি বর্তমান।

দেবদত্ত ॥ সেই মহাজলধি বুঝি তোমাদের প্রভু তথাগত? তা জলধির কৃপা বেছে বেছে শ্রেষ্ঠী ও রাজাদের উপরে বর্ষিত হয়—মন্দ নয়।

আনন্দ ॥ কি রকম?

দেবদত্ত ॥ এই যেমন অজাতশত্রু পিতৃহন্তা হয়েও ক্ষমার যোগ্য—কেননা সে রাজপুত্র। আবার তোমাদের প্রভু যখন চাতুর্মাস্যের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করতেন শ্রেষ্ঠী ও নৃপতিদের প্রাসাদ ছাড়া চোখে পড়ত না। এ মন্দ নয়। সাধুত্বও হ'ল আবার আরামটুকুও হাতছাড়া হল না। এই জন্যেই বুঝি তোমাদের আড্ডাগুলোর নাম সঙ্ঘারাম।

আনন্দ ॥ রাজপুত্র, আপনি অবিচার করছেন।

দেবদত্ত ॥ কার উপরে? তোমাদের প্রভুর উপরে?

আনন্দ ॥ না, শ্রেষ্ঠী ও নৃপতিদের উপরে।

দেবদত্ত ॥ কি রকমটা শুনি।

আনন্দ ॥ অভাজনদেরই তো কৃপার বেশী প্রয়োজন।

দেবদত্ত ॥ অভাজন কারা?

আনন্দ ॥ ধনভারে যারা পীড়িত।

দেবদত্ত ॥ তাই সে ভার লাঘব করবার উদ্দেশ্যে সদলবলে তোমার প্রভু বুঝি তাদের ভবনে অতিথি হতেন।

আনন্দ ॥ তাদের মনঃপীড়া লাঘব করবার উদ্দেশ্যে। তা ছাড়া, যাঁর চক্ষে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষ তাঁর পক্ষে ধনের প্রভেদ থাকতে পারে না। এ তো সহজবোধ্য।

দেবদত্ত ॥ খুব সহজবোধ্য নয়। তোমাদের প্রভুর আচরণে জগৎশুদ্ধ ধনীদের বিশ্বাস জন্মেছে যে তারা এমন কিছু পাপ করেনি, নতুবা এতবড় মহাত্মা তাদের কোল দেবেন কেন?

আনন্দ ॥ ধনার্জন মানেই তো পাপাচরণ নয়।

দেবদত্ত ॥ আরে বাপু সেই বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করেই তো সংসার করছি, নতুবা এতদিন সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে গেরুয়া ধরতে হতো। কিন্তু মনে কেমন একটা সন্দেহ ছিল যে, মহাত্মা পুরুষদের ধারণা অন্যরূপ।

আনন্দ ॥ বদ্ধ জলাশয়ের মতো বদ্ধ ধনেই কলুষের সৃষ্টি হয়। মহাত্মাগণ ধনের অবরোধ মুক্ত ক'রে দেন। তখন ধন মানব কল্যাণের পথে নির্বিকার স্রোতে প্রবাহিত হয়। এ শিক্ষায় ধনীদের বড় প্রয়োজন।

দেবদত্ত ॥ সেই শিক্ষাটাই বুঝি তিনি ধনীদের গৃহে গৃহে দিয়ে বেড়িয়েছেন।

আনন্দ ॥ হাঁ রাজপুত্র, সেটাও তাঁর শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্যতম। ধন ভার থেকে আত্মার মুক্তি না হলে কেবল ধন যে অকল্যাণ করে তা নয়, আত্মাও মুক্তির পথ খুঁজে পায় না। আত্মাকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যেই তিনি ঘরে ঘরে ধনের বাঁধ কেটে দিয়ে বেড়িয়েছেন।

দেবদত্ত ॥ ধনীদের মতিগতিতে কিছু পরিবর্তন দেখেছ কি ?

আনন্দ ॥ কারো কারো পরিবর্তন হয়েছে বইকি। কিন্তু মাথাগুণে সত্যনির্ধারণ চলে না। একজনেরও যদি পরিবর্তন না ঘটে থাকে তবু সত্য প্রচারে পরাঙ্মুখ হওয়া চলে না।

দেবদত্ত ॥ সত্য, অহিংসা, করুণা, মৈত্রী প্রভৃতি শব্দগুলি তেমন করে উচ্চারণ করতে পারলে মধুর ধ্বনিতে আসর জমে ওঠে। ওগুলো শূন্য গর্ভ।

আনন্দ ॥ যা কিছু মধুর শব্দকারী সবই তো শূন্য গর্ভ, বাঁশী, মৃদঙ্গ সমস্তই।

দেবদত্ত ॥ তাই তো বলছি ঐ শব্দগুলোর আসর মৃদঙ্গ, তম্বুরা, বাঁশী প্রভৃতির সঙ্গেই, ওতে আসর জমে, সংসার চলে না। তোমার প্রভু যতই চেষ্টা করুন না কেন অহিংসা, অসত্য, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি কখনো লোপ পাবে না।

আনন্দ ॥ কে বল্‌ল লোপ পাবে ? ওগুলো থাকবে বলেই তো অহিংসা, সত্য, করুণা প্রভৃতি অপরিহার্য। জল না থাকলে নৌকার কি প্রয়োজন ?

দেবদত্ত ॥ তবে পৃথিবী স্বর্গ হবে কিরূপে ?

আনন্দ ॥ পৃথিবী স্বর্গ হতে যাবে কেন ? পৃথিবী আরো বেশি ক'রে পৃথিবী হোক এই ছিল আমার প্রভুর আকাঙ্ক্ষা। তিনি তো শূন্যগর্ভ আদর্শবাদী ছিলেন না, তিনি ছিলেন আদর্শে বাস্তবপন্থী। আমার প্রভু চাননি যে সংসারটা প্রকাণ্ড একটা নৈমিষারণ্য হয়ে উঠুক, যাবতীয় মানুষ কাষায় ধারণ করুক। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল গৃহী গৃহেই থাকুক, কিন্তু তাঁর মনটা সর্বদা যেন সত্যের দিকে ঝুঁকে থাকে। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল ধনী সহস্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপার্জন করুক, কিন্তু তাঁর মনটা সর্বদা যেন করুণার দিকে ঝুঁকে থাকে। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল রাজা রাজ্যশাসন করুক কিন্তু তাঁর মনটা সর্বদা যেন অহিংসার দিকে ঝুঁকে থাকে। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল পৃথিবী আরো বেশি করে পার্থিব হয়ে উঠুক, শুধু সেটা যেন নরকে পরিণত না হয়। এই সামান্য আকাঙ্ক্ষাটুকু ছিল আমার প্রভুর মনে—এটুকু আকাঙ্ক্ষাও কি বেশি ? রাজপুত্র মানুষের মনে ধর্মের আগ্রহ নিত্য জাগ্রত না থাকলে তবে ধন, ঐশ্বর্য, শক্তি, ব্যবসায় কিছুই তার ভোগে লাগবে না। কামনার সুধাপাত্র তার ওষ্ঠে পৌছবার আগেই হয়ে উঠবে হলাহল। নির্বাসিত ঐশ্বর্যের ভারে মানুষ চাপা পড়ে মরবে, তার নিজের অস্ত্র নিজেকে আঘাত করবে—সিংহাসনে আর কারাকক্ষে তার পক্ষে প্রভেদ থাকবে না। আমার প্রভু জানতেন যে মানুষে সদা সত্য কথা বলতে পারে না। কিন্তু সদা সত্য কথা বলবার জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা থাকুক তার মনে এইটুকুই ছিল তাঁর কাম্য। ঐ প্রভেদটুকুকে অতিশয় সূক্ষ্ম মনে হতে পারে সত্য, কিন্তু রাজপুত্র জেনো, ঐ সূক্ষ্মরেখাটুকুই জীবন মরণের সীমান্ত।

খ্রীষ্ট ও সীজার

ধর্মগুরু যীশুখ্রীষ্ট ও জুলিয়াস সীজারের কল্পিত কথোপকথন

সীজার ॥ তোমার ওকথা আমি কিছুতেই মানতে পারি না।

খ্রীষ্ট ॥ কোন্ কথা? ইতিমধ্যে অনেক কথা বলেছি।

সীজার ॥ একমাত্র আত্মত্যাগের দ্বারাই আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব।

খ্রীষ্ট ॥ তোমার মত কি শুনি?

সীজার ॥ একমাত্র বলের দ্বারাই আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব।

খ্রীষ্ট ॥ বলের প্রকৃতিটা শুনি।

সীজার ॥ বাহুর বল। সব বলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

খ্রীষ্ট ॥ তবে বাহুবল ছাড়া অন্য প্রকৃতির বলও সম্ভব?

সীজার ॥ সম্ভব হলেই যে গ্রহণযোগ্য তা নয়।

খ্রীষ্ট ॥ বাহুবলের কি সীমা আছে? তোমার চেয়ে অধিকতর বলবান যদি থাকে।

সীজার ॥ তবে সে আত্মপ্রতিষ্ঠা করবে।

খ্রীষ্ট ॥ তবে তোমার যুক্তি অনুসারে সংসারে মাত্র একজনেরই আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব,—সবচেয়ে যে বলবান।

সীজার ॥ নিশ্চয়।

খ্রীষ্ট ॥ আর সকলে কি করবে?

সীজার ॥ তার বশ্যতা স্বীকার করবে। সংসার সবলের।

খ্রীষ্ট ॥ বলো বলবত্তমের।

সীজার ॥ হাঁ তাই।

খ্রীষ্ট ॥ বিচিত্র তোমার জগৎ, যেখানে একজন প্রভু আর সকলে ক্রীতদাস।

সীজার ॥ একজন কথাটা ঠিক হ'লনা। একটি জাতি প্রভু আর সব জাতি ক্রীতদাস।

খ্রীষ্ট ॥ ঐ এক কথাই হ'ল।

সীজার ॥ তোমার জগতের প্রকৃতিটা শুনি।

খ্রীষ্ট ॥ আমার জগতে ইচ্ছা করলে সকলেই প্রভু হতে পারে।

সীজার ॥ সকলেই প্রভু! প্রভুত্ব দাসত্বের অপেক্ষা রাখে। সকলে যেখানে প্রভু, কে কার দাস?

খ্রীষ্ট ॥ কেউ কারো দাস নয়।

সীজার ॥ এ চমৎকার। তবে প্রভুত্ব করবে কার উপরে?

খ্রীষ্ট ॥ নিজের উপরে।

সীজার ॥ নিজের উপরে!

খ্রীষ্ট ॥ বিস্মিত হচ্ছ কেন? মনের মধ্যে শত্রুর অভাব আছে কি? রিপুর চেয়ে বড় শত্রু আর কে?

সীজার ॥ নিজের উপরে প্রভুত্বস্থাপন যে করেছে তার কি লাভ?

খ্রীষ্ট ॥ সে তো লাভক্ষতির উর্ধ্বে, সে তো স্বর্গভোগ করে।

সীজার ॥ তবে তোমার স্বর্গ মনের মধ্যে।

খ্রীষ্ট ॥ এবং নরকও। আর কোথায় সম্ভব জানিনে।

সীজার ॥ আমাদের ধর্ম-স্বীকার করলে জানতে যে স্বর্গ নরকের প্রকৃতি ও স্থিতি অন্য রকম।

খ্রীষ্ট ॥ কি তোমাদের ধর্ম?

সীজার ॥ ঐ তো গোড়াতেই বলেছি শক্তির দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠার ধর্ম। জুপিটার বলের দ্বারা স্বর্গে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি দেবরাজ। আর মর্ত্যে সীজার বলের দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে, সে সম্রাট্। এবারে তোমার ভগবানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করো।

খ্রীষ্ট ॥ আমার ভগবান বলের দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন না; প্রেমে বিগলিত হ'য়ে নেমে আসেন মর্ত্যে, তিনি যে পিতা। আর আমার সম্রাট্ দীনতমের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, পাপিষ্ঠতমের পাপের ভার স্কন্ধে তুলে নেন, তিনি যে ভ্রাতা।

সীজার ॥ ধর্মের নামে এযে দীনতার প্রতিযোগিতা।

খ্রীষ্ট ॥ ধর্মের নামে কেন? আমার ধর্ম দীনের ধর্ম।

সীজার ॥ তোমার ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'লে পৃথিবী লক্ষ কোটি দীনে পূর্ণ হ'য়ে যাবে যে।

খ্রীষ্ট ॥ যাবেই তো। যে রাজ্যে সকলেই দীন সেখানে দীনতা কোথায়? ধনের তুলনাতেই তো দীনতা।

সীজার ॥ অদ্ভুত তোমার জগৎ! তবে ভরসার মধ্যে এই যে ও রকমটি কখনো হবে না।

খ্রীষ্ট ॥ আমার চেয়ে বেশী কেউ তা জানেনা।

সীজার ॥ তবে?

খ্রীষ্ট ॥ আমার ধর্ম পথ কাটতে কাটতে চলা, পথের শেষ নেই, কাজেই পথ কাটারও শেষ নেই। ঐ এক আনন্দ।

সীজার ॥ আমার ধর্ম পাথর বাঁধানো পথে রোমান বাহিনীর জয়যাত্রা—লক্ষ্য রণক্ষেত্র। খ্রীষ্ট পৃথিবী সবলের।

খ্রীষ্ট ॥ সীজার পৃথিবী দুর্বলের। দেখনি কোমল বারি বিন্দুপাতে পাথর ক্ষ'য়ে গিয়েছে, দেখনি নিরীহ উদ্ভিদ পাষান উদ্ভিন্ন ক'রে দুটি দুর্বল পাতা বের ক'রে দিয়েছে? সীজার প্রবলের শক্তির নির্ভর দুর্বল। কঠিন শৃঙ্খলের শক্তি দুর্বলতম গ্রন্থিটার চেয়ে অধিক নয়।

সীজার ॥ তোমার এ কল্পনা কখনো বাস্তবরূপ নেবে না। তুমি রোমক সাম্রাজ্যের নিন্দা করছ, বলতে চাও তার প্রতাপ, ঐশ্বর্য, বিলাস, মানুষের মুক্তির পথ বিঘ্নিত ক'রে তাকে হিংসার অনুকূল ক'রে তুলেছে। কিন্তু যেখানে রোমক সাম্রাজ্যের প্রভাব পৌঁছয়নি, যেখানে প্রতাপ ঐশ্বর্য বিলাস নেই সেখানেই কি হিংসা কম। আমাকে তো পৃথিবীর অল্প অংশ ঘুরতে হয়নি, গিয়েছি উত্তর সাগরের সীমান্তস্পর্শী বৃটেনে, গিয়েছি রাইন নদের পূর্বতীরের জার্মানিক জাতিসমূহ অধ্যুষিত ভূখণ্ডে, সে-সব স্থানে নেই ঐশ্বর্য, নেই বিলাস, সরল অনাড়ম্বর তাদের জীবন যাত্রা তাই বলে হিংসা কি কিছু কম? আদৌ নয়। নিরন্তর হানাহানি, মারামারি, কাড়াকাড়ি লেগেই রয়েছে। বরঞ্চ রোম সাম্রাজ্যে পাবে শান্তি, দেখবে হিংসার অভাব, দেখবে অধিকাংশ লোকে সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করছে। ঠিক নয় কি?

খ্রীষ্ট ॥ এক কথায় কি উত্তর দেবো? তাই বলছি ঠিক এবং ঠিক নয়।

সীজার ॥ কেমন?

খ্রীষ্ট ॥ তোমার কথিত সেই সব ভূখণ্ডে হিংসা আছে ব্যক্তিগত স্তরে, তাই যত্রতত্র চোখে পড়ে। আর রোম সাম্রাজ্যে হিংসা শাসনদণ্ডে

পুঞ্জীভূত, সর্বদা চোখে না পড়লেও তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ নেই। কোন দেশ কি জাতি একবার মাথা তুলতে চেষ্টা করুক না! সে হিংসার দুর্নিবার রূপ বুঝতে পেরেছে কার্থেজ, বুঝতে পেরেছে ইজরেল, বুঝতে পেরেছে গ্রীস, মিশর, গল।

সীজার ॥ তারা যে বিদ্রোহী।

খ্রীষ্ট ॥ বিধাতার বিরুদ্ধে কি?

সীজার ॥ সীজারের বিরুদ্ধে।

খ্রীষ্ট ॥ তবে?

সীজার ॥ তবে আর কেন? তুমিই তো সীজার আর বিধাতাকে সমান অংশে পৃথিবী বণ্টন ক'রে দিয়েছে Give unto Caesar what is Caesar's!

খ্রীষ্ট ॥ ওর ভুল অর্থ করেছ। পার্থিব বস্তুর প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার জন্যেই আমার পরামর্শ ওটা।

সীজার ॥ সীজার কি শুধু পার্থিব বস্তুতেই মগ্ন? প্রজার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকামনা কি পার্থিব বিষয়ের অন্তর্গত?

খ্রীষ্ট ॥ যে পরিমাণে সীজার প্রকৃত কল্যাণকামী সেই পরিমাণে সীজারের চেষ্টা অপার্থিব। কিন্তু সে কতটুকু? হিংসার টবে এ যে প্রেমের চারাগাছ।

সীজার ॥ হিংসা যে জীবনের একটি প্রধান তত্ত্ব।

খ্রীষ্ট ॥ তারই উচ্ছেদের জন্য যে আমার আগমন।

সীজার ॥ তবে তোমাকে অনেককাল অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে।

খ্রীষ্ট ॥ এবারে না হ'লে আবার আসবো।

সীজার ॥ তখনি কি সম্ভব হবে?

খ্রীষ্ট ॥ বারে বারে আসবো। মানুষের ঘরে যুগে যুগে শিশু ভূমিষ্ঠ হবে এই কামনা নিয়ে।

সীজার ॥ যুগে যুগে তারা মাথা নত ক'রে ফিরে যাবে। কিন্তু খ্রীষ্ট এ কথা কেন মনে করলে যে যুগে যুগে সীজার ভূমিষ্ঠ হবে না। হিংসা ও প্রেম দুই চিরন্তন্।

খ্রীষ্ট ॥ চিরন্তন বলেই সত্য নয়।

সীজার॥ সেটা তো উভয়তঃ সত্য হ'তে পারে। প্রেমের বাণী প্রচার করতে এসেই কি তোমার অপঘাত হয় নি।

খ্রীষ্ট ॥ তোমারও মৃত্যু ঘটেছে অপঘাতে।

সীজার॥ সে কথা যথার্থ বটে। কিন্তু তাতেই কি হিংসার অজেয়ত্ব প্রমাণ হয় না?

খ্রীষ্ট ॥ সাপুড়ে সাপের কামড়ে মরে বলে সাপটাই কি সত্য?

সীজার॥ অন্ততঃ মিথ্যা নয়। শোনো খ্রীষ্ট তুমি আমি, হিংসা প্রেম, যুদ্ধ শান্তি, পৃথিবী স্বর্গ বোধ করি এ দুই-ই সত্য। দুইটি রয়ে গেল মানুষের সম্মুখে আর কোনরূপে না হয় অন্ততঃ দুটি আদর্শরূপে রয়ে গেল। দেখা যাক মানুষে কোনটাকে গ্রহণ করে। তারা খ্রীষ্টকে মনে রাখবে কিন্তু সীজারকেও বিস্মৃত হবে না। ভুলোনা যে আমি তোমার অগ্রজ।

খ্রীষ্ট ॥ আরও ভুলোনা যে আমি অন্ত্যজ, অন্তে আমিই থাকবো।

মোহনলাল ও মীরজাফর

পলাশীর যুদ্ধের দুই নায়ক মোহনলাল ও মীরজাফর। দুই জনের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। এই সংলাপটির মূল কাল্পনিক।

এক ব্যক্তি॥ বে-ইমান!

অন্য ব্যক্তি॥ অন্ধকারে ভালো ঠাহর করতে পারছি না। কে ও?

এক ব্যক্তি॥ আমি মোহনলাল।

অন্য ব্যক্তি॥ ও, পাঁচহাজারী মনসবদার?

মোহনলাল॥ হাঁ, সেনাপতি সাহেব, বন্দেগি, কুর্নিশ!

মীরজাফর ॥ কি বলছিলে?

মোহনলাল॥ বলছিলাম, তুমি বে-ইমান।

মীরজাফর ॥ তার মানে ?

মোহনলাল ॥ তুমি নিমকের অমর্যাদা করেছিলে।

মীরজাফর ॥ পলাশীর যুদ্ধের পরে কতদিন হ'ল ?

মোহনলাল ॥ তা প্রায় দু'শো বছর হ'তে চল্‌লো।

মীরজাফর ॥ তবে ?

মোহনলাল ॥ তবে আবার কি। সময় গেলে কি আদর্শের রদ-বদল হয় ?

মীরজাফর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ! মোহনলাল, তুমি দেখছি সেই রকমটিই রয়ে গেলে, কিছুমাত্র বদলাও নি।

মোহনলাল ॥ মোহনলাল বদলে মীরজাফর হবে ?

মীরজাফর ॥ আরে না, না, তা বলছি না। সময় গেলে মানুষের বুদ্ধি বাড়ে অথচ দুশো বছরেও তোমার সেখানে কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

মোহনলাল ॥ তোমার বুঝি ঘটেছে ?

মীরজাফর ॥ বিলক্ষণ! আমার বুদ্ধি আমাকে ছাপিয়ে দেশময় ছড়িয়ে গিয়েছে, গুগ্‌গুলের খোশবু যেমন যায় গুগ্‌গুলদানিকে ছাপিয়ে। বুঝলে ?

মোহনলাল ॥ বুদ্ধি বাড়েনি, তাই বুঝতে পারলাম না।

মীরজাফর ॥ ভাবগতিক দেখে' তা বুঝতে পেরেছি।

মোহনলাল ॥ তাহ'লে দয়া ক'রে বুঝিয়ে দাও।

মীরজাফর ॥ তার আগে তুমি বুঝিয়ে দাও বে-ইমান বললে কেন ?

মোহনলাল ॥ তুমি দেশ দিয়েছিলে পরের হাতে তুলে।

মীরজাফর ॥ ঐ কথাটা ইতিহাসের পাতা বেয়ে গড়াতে গড়াতে দু'শো বছর চলে এসেছে। গোড়াতে যা ছিল আমার বাড়ির নালা, এখন তা পরিণত হয়েছে কীর্তিনাশা নদীতে। কিন্তু আসল কথা কি জানো, অপর কারো হাতে দেশ তুলে দেবো ভাবিনি, ভেবেছিলাম কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবো।

মোহনলাল ॥ শেষে দেখলে সে কাঁটা—

মীরজাফর ॥ কাঁটা নয়, শেল। ওর মূলে ছিল আমার বিচারবুদ্ধির ভ্রম।

মোহনলাল ॥ বুদ্ধির ভ্রমই হোক আর মনের সঙ্কল্পই হোক ইতিহাস তোমাকে জানে বে-ইমান বলে', বে-ইমান বলেই চিরকাল জানবে।

মীরজাফর ॥ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমন নিশ্চয় হ'য়ো না।

মোহনলাল ॥ কেন?

মীরজাফর ॥ নিজের দৃষ্টান্ত নিয়েই দেখনা, সেদিন তুমি ছিলে সামান্য মনসবদার, কে-ই বা তোমাকে জানতো!

মোহনলাল ॥ আর তুমি ছিলে সুবে বাংলার জঙ্গীলাট, কে না তোমাকে জানতো?

মীরজাফর ॥ তারপরে ঐতিহাসিক আর সাহিত্যিকদের ফুঁয়ে ফুঁয়ে ফাঁপতে ফাঁপতে তুমি আকাশজোড়া ফানুসে পরিণত হয়েছ আর আমি—

মোহনলাল ॥ কলঙ্কের কলা বাড়তে বাড়তে পূর্ণিমার চাঁদ আজ অমাবস্যার চাঁদে পরিণত···

মীরজাফর ॥ চমৎকার বলেছ। হাজার হোক, বাঙালী বটে তো! তা ছাড়া উপমাটি আমার অনুকূলও বটে।

মোহনলাল ॥ কেমন?

মীরজাফর ॥ অমাবস্যা চিরকাল থাকে না, চাঁদ আবার কলঙ্কমুক্ত হয়, পূর্ণিমা দেখা দেয়, লোকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে, চোখ ফিরতে চায় না।

মোহনলাল ॥ তার মানে, বলতে চাও তুমি হবে কলঙ্কমুক্ত?

মীরজাফর ॥ সে অসাধ কার? কিন্তু আমাকে তো মুখ ফুটে বলতে হয়নি, উপমার ইঙ্গিতে তুমিই কথাটার সূত্র ধরিয়ে দিয়েছ।

মোহনলাল ॥ তোমার বে-ইমান কলঙ্ক দূর হবে?

মীরজাফর ॥ এমন সময় যদি আসে যাতে লোকে আমার দোষকে আর দোষ মনে না করে?

মোহনলাল ॥ বে-ইমান আর বে-ইমান থাকবে না! এমন সময় আসবে?

মীরজাফর ॥ কেন না আসবে? সময়ের যে বদল হয়! তাছাড়া দেশ সম্বন্ধে ধারণা যদি বদলায়? পরের হাতকে যদি আপন হাত ব'লে মনে হয়?

মোহনলাল ॥ তোমার মাথায় দুশমনের আড্ডা।

মীরজাফর ॥ দুশমন সম্বন্ধেও ধারণার বদল হ'তে পারে।

মোহনলাল ॥ এমন কথা তোমার ছাড়া আর কারো মনে আসবে না।

মীরজাফর ॥ হাজার হাজার লোকের মনে আসবে, এমন এসেছে।

মোহনলাল ॥ এই না বললে ইতিহাসের কৃপায় তোমার বে-ইমানি সর্বজন-বিদিত!

মীরজাফর ॥ ইতিহাস পাল্টে লেখা হবে, এমন হয়েছে।

মোহনলাল ॥ অসম্ভব।

মীরজাফর ॥ স্থির হয়ে ব'সো, সব বুঝিয়ে বলছি।

মোহনলাল ॥ বলো।

মীরজাফর ॥ আজকের দিনের খবর রাখলে জানতে পারতে লোকে আমার প্রশংসা করছে।

মোহনলাল ॥ তোমার প্রশংসা? কেন, দেশ স্বাধীন করেছ বলে?

মীরজাফর ॥ পরিহাস নয়। স্বাধীনতা পুরোনো ধারণা, তার স্থান দখল করেছে প্রগতি।

মোহনলাল ॥ সেটা আবার কি?

মীরজাফর ॥ অর্থ শুধিয়ো না, ওর অর্থ নেই।

মোহনলাল ॥ তার মানে অনর্থ।

মীরজাফর ॥ পরিহাসেই অভ্যস্ত হয়েছ দেখছি। প্রগতির অর্থ স্পষ্ট ক'রে কেউ জানে না, কিন্তু দেখলে বুঝতে পারে।

মোহনলাল ॥ কেমন?

মীরজাফর ॥ যেমন আমার কাজের ফলে দেশ প্রগতির পথে এগিয়ে গিয়েছে।

মোহনলাল ॥ দাঁড়িয়ে থাকা চললো না, বসতে বাধ্য হ'লাম। নাও এবারে বলো।

মীরজাফর ॥ দেশ ছিল দুর্বল ক্ষয়িষ্ণু অত্যাচারপ্রবণ সামন্ততন্ত্রের অধীন; আমার কাজের ফলে দেশ গিয়ে পড়লো চলিষ্ণু নবীন আন্তর্জাতিক শক্তির হাতে। তার মানে, প্রগতির পথে দেশ এক ধাপ এগিয়ে গেল।

মোহনলাল ॥ যার ফলে দেশ নতুন ক'রে প্রায় দুশো বছরের জন্য পরাধীন হয়ে পড়লো।

মীরজাফর ॥ প্রায় দু'শো বছর কেন বলছ ?

মোহনলাল ॥ দেশ তো স্বাধীন হয়েছে।

মীরজাফর ॥ একে বলো স্বাধীনতা ?

মোহনলাল ॥ তবে এ কি ?

মীরজাফর ॥ তথাকথিত স্বাধীনতা।

মোহনলাল ॥ তথাকথিত ? তথা…কোথা ?

মীরজাফর ॥ আর যেখানেই হোক হেথা নয়।

মোহনলাল ॥ আজ যারা এ স্বাধীনতাকে তথাকথিত বলে অবজ্ঞা করছে, স্বাধীনতাব্রতীরা যেদিন গুলি খেয়ে মরছিল, লাঠির ঘায়ে আহত হচ্ছিল, জেলে পচছিল, সেদিন আজকের 'তথাকথকে'র দল ছিল কোথায় ?

মীরজাফর ॥ তারা সরকারী চাকুরি করছিল, পেন্সনের আরামের তোরণ থেকে একখানি ইটও যাতে না খসে সেই উদ্দেশ্যে স্বদেশী-ওয়ালাদের ধরিয়ে দিচ্ছিল ; আবার কোন কোন বুদ্ধিমানের দল সরকারের পিছনে ব'সে গোয়েন্দাব্রত অবলম্বন করেছিল— এ সব কথা আজ কে না জানে ?

মোহনলাল ॥ তবু তাদের কথাই আজ লোকের স্বাদু মনে হচ্ছে !

মীরজাফর ॥ প্রগতিপরায়ণতার এটাও একটা লক্ষণ।

মোহনলাল ॥ তার মানে, আরও লক্ষণ আছে ?

মীরজাফর ॥ অসংখ্য। সেই জন্যই তো বললাম যে প্রগতির সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।

মোহনলাল ॥ যার সংজ্ঞা সম্ভব নয় তার আলোচনাটাও নিষ্ফল। অতএব এখন বলো প্রকৃত স্বাধীনতার স্বরূপ কি।

মীরজাফর ॥ স্বাধীনতা দুই শ্রেণীর। ঝুটা স্বাধীনতার নাম 'তথাকথিত', আর সাঁচ্চা স্বাধীনতার নাম 'হোথাকথিত।'

মোহনলাল ॥ হোথা…কোথা ?

মীরজাফর ॥ দেশের বাইরে কোথাও।

মোহনলাল ॥ তার মানে ও বস্তু নূতন পরাধীনতার, পরিচিত ভূমিকা।

মীরজাফর ॥ তুমি যাকে বলছ পরাধীনতা অন্য দিক থেকে দেখলে সেটাই প্রগতি, রসগোল্লা চেপটা হলেই ক্ষীরমোহন।

মোহনলাল ॥ তোমার সেই ক্ষীরমোহনের স্বরূপটা কি শুনি।

মীরজাফর ॥ দেশে যখন একটিও ভিক্ষুক না থাকবে তখনই বুঝতে হবে দেশ স্বাধীন হয়েছে।

মোহনলাল ॥ বুঝতে হবে 'হোথাকথিত' স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু দেশে যে ভিক্ষুক নেই এ সনন্দ দেবে কে ?

মীরজাফর ॥ বিদেশ থেকে অনুগত লোক আনিয়ে সনন্দ আদায় ক'রে নিতে হবে।

মোহনলাল ॥ শহর থেকে ভিক্ষুক খেদিয়ে দিয়েও তো করা সম্ভব। নবাবের শোভাযাত্রার আগে এমন আমরা অনেকবার করেছি।

মীরজাফর ॥ ওটা নবাবী আমলের পন্থা। এখনকার পন্থা অঙ্গুলি নির্দেশ করছে ফাটক আর বন্দী-শিবিরের দিকে।

মোহনলাল ॥ বিদেশী দর্শক যদি সে-সব জায়গা দেখতে চায় ?

মীরজাফর ॥ চাইবে না সেই বিশ্বাসেই তো ডাকা। বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সমপ্রাণতা, নিজ রাষ্ট্রের প্রতি অনাস্থা; পরশ্রীতে অতিবিশ্বাস আত্মশ্রীতে অবিশ্বাস; চিরদিনকার বন্ধুকে অবজ্ঞা আর চির-চিহ্নিত শত্রুকে আলিঙ্গন—প্রগতির এগুলোও লক্ষণ!

মোহনলাল ॥ এ কি অকল্যাণ!

মীরজাফর ॥ কিন্তু সবাই যদি অকল্যাণের জয়ধ্বনি করে তবে অকল্যাণই হয়ে ওঠে কল্যাণ।

মোহনলাল ॥ সবাই এমন আত্মঘাতী ধ্বনিতে মাতবে তা কখনোই সম্ভব নয়।

মীরজাফর ॥ অধিকাংশকে কথা না বলতে দিলে অল্পসংখ্যকই হয়ে উঠবে সর্বাত্মক! ছোট দলের বড় দলের যে পাল্লা তাকে বলি গণতন্ত্র আর এক দলের সঙ্গে নিঃশব্দের যে পাল্লা তারই নাম প্রগতিতন্ত্র!

মোহনলাল ॥ কিন্তু সংখ্যায় বেশি হ'লে তারা নিঃশব্দে থাকবে কেন ?

মীরজাফর ॥ প্রথম প্রথম পুরাতন অভ্যাসের তাড়ায় শব্দ করতে চাইবে, কিন্তু ঠেকে শিখবে শব্দ করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। প্রথমে এ জন্য অস্ত্র-শস্ত্রের দরকার হবে। তার পরে অস্ত্রের স্থান অধিকার করবে বাক্যতন্ত্র; 'আমিই যে তোমরা'—এই মোহ লোকের

মনে সৃষ্টি ক'রে দিতে হবে। তখন লোকে ভাববে 'উনি আমাদের কথাই বলছেন' ; তারপরে মোহটা আরও একটু জমাট হয়ে উঠলে ভাববে 'উনিই আমারা'; তারপরে মোহ যখন তুরীয় অবস্থায় পৌছবে, ভাববে—'ওঁর মধ্যেই আমরা আছি', যেমন সুন্দরবনের নিরীহ জন্তুরা ভাবে দক্ষিণ রায়ের রাজকীয় উদরের মধ্যেই তাদের স্বস্থান! এবারে কিছু বুঝলে?

মোহনলাল ॥ যেটুকু বুঝেছি তাতেই শির-ঘূর্ণন সুরু হয়েছে।

মীরজাফর ॥ এখন এই শ্রেণীর লোকেরাই আমার প্রশংসা করছে, তাদের কাছে আমি বাহাদুর, বীর, তাদের আমি আদর্শ।

মোহনলাল ॥ তারা তোমার প্রশংসা করছে বুঝলাম। কিন্তু কেন যে তুমি তাদের আদর্শ তা এখনো বুঝতে পারিনি।

মীরজাফর ॥ তোমার নেহাত 'চের-বেগা' বুদ্ধি। যাহোক, আবার চেষ্টা করা যাক।

মীরজাফর ॥ দেশাত্মবোধ প্রগতির অন্তরায়।

মোহনলাল ॥ আমি তো সেই রকমই জানি।

মীরজাফর ॥ ওরাও জানে। ঘাড় থেকে ভূত না নামলে ব্রহ্মদত্যি চাপে না। দেশাত্মবোধের ভূত নামাতে সাহায্য করেছি বলেই আমি ওদের আদর্শ।

মোহনলাল ॥ কি ভাবে সাহায্য করেছ শুনি?

মীরজাফর ॥ দীর্ঘকাল নবাবের হাতে দেশ থাকবার ফলে নবাবী মুল্লুককে লোকে আপন মুল্লুক মনে করতে সুরু করেছিল। এমন সময়ে দেশ গেল বিদেশী এক কোম্পানির হাতে। বিদেশী শাসক আপন হ'ল না, তার শাসিত দেশও পর হয়ে রইলো। দেশাত্ম-বোধের শিকড় মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলো না। শুধু তাই নয়, নবাবী আমলে শিকড় যেটুকু ভিতরে ঢুকেছিল তা-ও উপড়ে গেল। এখন, আমি এই কাজটুকু না করলে এখনকার কাজ সহজ হ'ত না।

মোহনলাল ॥ তার মানে, তথাকথিত স্বাধীনতাবোধের অঙ্কুর পুঁতেছিলে তুমিই।

মীরজাফর ॥ একটু বাড়িয়ে বললে। আমি কেবল বীজ পুঁতেছিলাম, আজ তা অঙ্কুরিত।

মোহনলাল ॥ সর্বনাশ! এখনো তাহলে তার বনস্পতি-রূপ অদূরে!

মীরজাফর ॥ সে বনস্পতি দূরে দূরে পাঠিয়ে দেবে শাখায় শাখায় আহ্বান, পত্রে পত্রে নিমন্ত্রণ। এবারে বুঝতে পারলে কেন তাদের আমি আদর্শ?

মোহনলাল ॥ কিন্তু এ স্বাভাবিক নয়। মানুষ জন্মে বিশেষ দেশে, বিশেষ কালে, বিশেষ সমাজে। তাকে লঙ্ঘন ক'রে সে দাঁড়াবে কোথায়? আপনার উপরে তো দাঁড়ানো যায় না।

মীরজাফর ॥ মানুষের সেই দাঁড়াবার জায়গা দেশাত্মবোধ। সে জায়গা যার পায়ের তলা থেকে স'রে গিয়েছে সে ঝাঁপ দিয়েছে শূন্যে, পড়েছে নিজের মাথার উপরে। হেটমুণ্ড বলেই সব দেখছে সে উল্টো।

মোহনলাল ॥ এমন সর্বনাশ কেন করতে গেলে?

মীরজাফর ॥ ইচ্ছে ক'রে করিনি, যেমন করিনি কোম্পানিকে আনবার চেষ্টা! একটা স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে একটা কাজ করেছিলাম, এ সমস্ত তার পরোক্ষ এবং বিলম্বিত ফল।

মোহনলাল ॥ এখন উপায়?

মীরজাফর ॥ নিরুপায়। আজ যখন ছায়ামূর্ত্তিতে দেশের ঘরে ঘরে ঘুরছি, পথে পথে জনপ্রবাহ দেখছি, মাঠে মাঠে সভার বক্তৃতা শুনছি, মনে হচ্ছে পলাশীর যুদ্ধের আগেকার মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেছি।

মোহনলাল ॥ কেন?

মীরজাফর ॥ সেদিন সবাই মনে করেছিল নবাব গেলেই সব আপদ যাবে মনে করেছিল নবাবী শাসনই সত্যযুগের দরজা চেপে দাঁড়িয়ে রয়েছে! হতভাগারা জানতো না ভূতের পরে আছে ব্রহ্মদৈত্য। ভূত শুধু ঘাড় মটকেই সন্তুষ্ট, ব্রহ্মদৈত্য আশ্রয় ডালটাকেও আস্ত রাখে না। দেশ যাওয়ার চেয়েও যদি কিছু বেশি শোচনীয় থাকে তা হচ্ছে দেশাত্মবোধ যাওয়া! পলাশীর যুদ্ধের ফলে দেশ গিয়েছিল, আর আজকের হতভাগারা বুঝছে না যে দেশাত্মবোধ যেতে বসেছে।

মোহনলাল ॥ তুমি যেন দুঃখ করছো মনে হচ্ছে?

মীরজাফর ॥ দুঃখও নয়, আনন্দও নয়, কেবল বিশ্লেষণ করছি।

মোহনলাল ॥ আবার মরতে ইচ্ছে করছে।

মীরজাফর ॥ সেবার ম'রে বীরপুরুষ ব'লে পূজিত হয়েছিলে, এবার মরলে আপশোষ করতে হবে।

মোহনলাল ॥ কেন?

মীরজাফর ॥ তোমার মৃত আত্মার কাছে থেকে ওরা 'স্বীকারোক্তি' আদায় ক'রে নেবে, তাতে তুমি নিজের কৃতকর্মকে প্রতিবাদ ক'রে ঘোষণা করবে যে, নবাবের পক্ষে লড়াই ক'রে তুমি জীবনের চূড়ান্ত ভুল করেছিলে, আর লোকে তোমাকে বলবে—

মোহনলাল ॥ কি বলবে আমাকে?

মীরজাফর ॥ বলবে, মোহনলাল বে-ইমান।

মধুসূদন ও ভারতচন্দ্র

প্রাচীন যুগের মহাকবি ভারতচন্দ্র ও নবীনযুগের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মধ্যে এই সংলাপটি কাল্পনিক হইলেও অবাস্তব নয়—দু'জনের কবি দৃষ্টির প্রভেদে ইহার মূল বর্তমান।

মধুসূদন ॥ আঃ কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে—মৃত্যুর পরেও শান্তি পাব না?

এক ব্যক্তি ॥ কেন কি হয়েছে?

মধুসূদন ॥ তুমিও বাঙালী দেখছি! আমার মৃত্যুশয্যার শিয়রে বাঙালী কবিরা কলম উঁচিয়ে বসে ছিল, যেমনি নাভিশ্বাস উঠেছে, অমনি কবিতার বান বইয়ে দিলে। আরে ভাল করে মরতেই দে!

এক ব্যক্তি ॥ কেন ?

মধুসূদন ॥ দু'চারটে লাইন কানে ঢুকেছিল।

এক ব্যক্তি ॥ তা'তে ক্ষতি কি ?

মধুসূদন ॥ ক্ষতি কি! ওই শব্দগুলো এক ঝাঁক মৌমাছির মত তাড়া করে আসছে। মৃত্যুর বিস্মৃতিতেও ওদের আটকাতে পারেনি। কি কুক্ষণেই লিখেছিলাম "রচিব মধুচক্র, গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" মধুচক্রে মধুর সন্ধান পেলাম না, মৌমাছির হুলের দংশনে কান দুটো গেল।

এক ব্যক্তি ॥ একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

মধুসূদন ॥ পরিহাস বলে' পরিহাস। একেবারে কান ধরে পরিহাস। আচ্ছা তুমিও তো বাঙালী, এমন কবিতা জান যাতে কান জুড়িয়ে যায়।

এক ব্যক্তি ॥ জানি বই কি !

মধুসূদন ॥ আবৃত্তি কর—কান জুড়োক।

এক ব্যক্তি ॥ পছন্দ হবে কি ! আচ্ছা তবে শোন

"অন্নপূর্ণা উতরিলা গাঙ্গিনীর তীরে
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী
ত্বরায় আনিলা নৌকা বামাস্বর শুনি॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার
ভয় করি কি জানি কে দেবে ফেরফার॥"

মধুসূদন ॥ আঃ এতক্ষণে কান জুড়লো। থেম না, থেম না, আবৃত্তি করে' যাও—

এক ব্যক্তি ॥ "বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥
পাটনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হ'য়ে
পায়ে ধরি কি জানি কুম্ভীরে যাবে লয়ে॥

ভবানী বলেন তোর নায়ে ভরা জল
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুইব বল॥
পাটনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন
সেঁউতি-উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ॥"

মধুসূদন ॥ এ যেন শোনা কবিতা! কিন্তু তা হোক, তুমি বলে যাও।

এক ব্যক্তি॥ "পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি উপরে॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধোয়ায়
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতি-উপরে
তার ইচ্ছা নাহি হলে কি তপ সঞ্চারে॥
সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে
সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে॥

মধুসূদন ॥ গ্র্যাণ্ড! শুধু সেঁউতি কেন আমার হাতে পড়লে সমস্ত নৌকাখানাই সোনা করে দিতাম, সেই হত আমার সোনার তরী; পরবর্তী কোন কবির জন্য এ কাজ আর বাকী রাখতাম না! চমৎকার—এতক্ষণে কানের গ্লানি গেল।

এক ব্যক্তি॥ কিন্তু মধুসূদন, বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে যে লোকটাকে তুমি সবচেয়ে বেশি ঈর্ষ্যা করতে এ যে তারই কবিতা!

মধুসূদন ॥ কৃষ্ণনগরের সেই লোকটা?

এক ব্যক্তি॥ এতই অবজ্ঞা যে তার নামও করতে নেই!

মধুসূদন ॥ ভারতচন্দ্র!

এক ব্যক্তি॥ যাক, তবু তোমার মুখে রামনাম শোনা গেল!

মধুসূদন ॥ বড্ড পরিহাস করে নিলে।

এক ব্যক্তি॥ কিন্তু আমার পরিহাস বোধ হয় অদৃষ্টের পরিহাসের মত অঙ্গ স্পর্শ করে নি।

মধুসূদন ॥ নিশ্চয় নয়। আজ একবার ভারতচন্দ্রকে সম্মুখে পেলে খুব করমর্দন করে নিতাম।

এক ব্যক্তি॥ এই তো হাত বাড়িয়ে দিয়েছি—কর না।

মধুসূদন ॥ তুমি! বাই জোভ!

(প্রবল ভাবে করমর্দন)

ভারতচন্দ্র ॥ আঃ হাতখানা গেল যে।

মধুসূদন ॥ যাক্! আমার যে কান যেতে বসেছিল।

ভারতচন্দ্র ॥ আমি বাঁচিয়ে দিলাম—আর এই কি তার প্রতিদান।

মধুসূদন ॥ ঠিক। ও বিদেশী কায়দায় আর নয়; এই নাও নমস্কার।

ভারতচন্দ্র ॥ নমস্কার। মধুসূদন তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবছি। যে-পয়ার পায়ের বেড়ি তুমি বঙ্গভাষার পা থেকে খসিয়েছ বলে গৌরব বোধ করতে, সেই পয়ার আজ তোমার এত মিষ্টি লাগল কেন?

মধুসূদন ॥ কথটা আগে ভাবি নি—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কি জান, নূপুর আর বেড়ি তৈরি করবার ধাতু একই, ভঙ্গী আলাদা। বহুদিনের অভ্যাসে যাদের হাত বেহাত হয়েছে তারা নূপুর গড়তে গিয়ে বেড়ি তৈরি করে বসে।

ভারতচন্দ্র ॥ যদি তাই হয় তবে দোষ হাতের, নূপুরের নয়।

মধুসূদন ॥ আর যাদের কান ধ্বনির সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ধরতে পারে না, তারা বেড়ির শব্দে আর নূপুরের শব্দে ভুল করে বসে।

ভারতচন্দ্র ॥ সে দোষ কানের, নূপুরের নয়।

মধুসূদন ॥ ও রকম সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সম্ভাবনা কোথায়? ভুলটা ভুলই, দোষ যারই হোক।

ভারতচন্দ্র ॥ কিন্তু অকবিদের স্থূল হস্তাবলেপে পয়ার যদি গোময়লিপ্ত হয়ে থাকে, তবে কবিদের উচিত তাকে ধুয়ে নির্মল করে প্রকাশ করা, অবিচারে ত্যাগ করা নয়।

মধুসূদন ॥ হয় তো তোমার কথা অযথার্থ নয়, কিন্তু যুগধর্ম বাম।

ভারতচন্দ্র ॥ যুগধর্ম কাকে বলছ?

মধুসূদন ॥ পয়ারের যুগ চলে গিয়েছে।

ভারতচন্দ্র ॥ সাহিত্যিক পঞ্জিকার বর্ষফল-গণনা আমাদের সময়ে ছিল না, কাজেই আমি তাতে অভ্যস্ত নই; এখন "কেবা রাজা, কেবা মন্ত্রী" বলতো—

মধুসূদন ॥ এখন শুক্র রাজা, বুধ মন্ত্রী।

ভারতচন্দ্র ॥ অস্যার্থ—

মধুসূদন ॥ শুক্র দৈত্যগুরু; পশ্চিমের অসুরদের এখন আমরা গুরুর গৌরব দিয়েছি, তাই শুক্র আমাদের আরাধ্য।

ভারতচন্দ্র ॥ সেই দৈত্য গুরুর কন্যা দেবযানী এসেছেন ভারতের ব্রহ্মচারী কবির মনোহরণ করবার জন্য।

মধুসূদন ॥ চমৎকার বলেছ। এক্স্যাক্টলি।

ভারতচন্দ্র ॥ ওই বিদেশী শব্দগুলো বাদ দিয়ে বল।

মধুসূদন ॥ "অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল"—যে যুগের যে ধর্ম।

ভারতচন্দ্র ॥ আমার অস্ত্রেই আমাকে মেরেছ। কিন্তু বেচারা কচের অবস্থা স্মরণ করে দেখেছ।

মধুসূদন ॥ দেখেছি বই কি। তোমাদের পৌরাণিক কচ ছিল—

ভারতচন্দ্র ॥ হাঁ, হাঁ, আর বলতে হবে না, ইঙ্গিতেই বুঝে নিয়েছি।

মধুসূদন ॥ পারবেই তো! "বুঝে লোক যে জানে সন্ধান!" এ যুগের কচ দেবযানীর প্রণয়কে উপেক্ষা করে স্বর্গের মরীচিকার দিকে ছুটে যাবে না; এ যুগের কচ দৈত্যগুরুর বিদ্যার সঙ্গে দৈত্যগুরুর কন্যাকেও গ্রহণ করবে। এই হচ্ছে আমাদের নূতন যুগের বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান! আঃ কথা বলতে বলতে তোমার কাব্যের সীমানায় এসে প্রবেশ করেছি।

ভারতচন্দ্র ॥ সে জন্য বিরক্তি কেন?

মধুসূদন ॥ বাংলা সাহিত্যে তোমাকেই এক মাত্র আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে স্বীকার করতাম।

ভারতচন্দ্র ॥ মধুসূদন, বাংলা সাহিত্যের আঙিনা যথেষ্ট উদার; তাতে তোমার আমার এবং আমাদের বড় আরও অনেকের স্থান হবে।

মধুসূদন ॥ আমার চেয়েও বড়!

ভারতচন্দ্র ॥ পৃথিবী বিপুল, কালও নিরবধি। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এই যে নবযুগের উল্লেখ করলে, ওতে কি সত্যিই বিশ্বাস কর?

মধুসূদন ॥ নিশ্চয়!

ভারতচন্দ্র ॥ নবযুগের জন্য এত অকাল ব্যগ্রতা কেন? পুরাতন যুগের কর্তব্য কি শেষ করেছ?

মধুসূদন ॥ সে ভাবনা আমার নয়। আমি নবসূর্যোদয়ের আলো-অন্ধকারের মধ্যে ছায়াশরীরী আসন্ন নবযুগকে লক্ষ্য করেছি।

ভারতচন্দ্র ॥ সে ছায়াশরীরী সত্তা নবযুগ নয়; পুরাতন যুগের অতৃপ্ত প্রেতাত্মা বুভুক্ষু হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

মধুসূদন ॥ নাঃ, তুমি নেহাত রক্ষণশীল।

ভারতচন্দ্র ॥ আমি বৈপ্লবিক রক্ষণশীল।

মধুসূদন ॥ সে আবার কি?

ভারতচন্দ্র ॥ আমি রক্ষণশীলতার দ্বারা বিপ্লব আনয়ন করব।

মধুসূদন ॥ তার উপায় কি?

ভারতচন্দ্র ॥ প্রথমে রক্ষণশীলতাকে রক্ষা করতে হবে।

মধুসূদন ॥ সেটা কি করে হবে?

ভারতচন্দ্র ॥ পয়ার ছন্দ দিয়ে।

মধুসূদন ॥ একটু বুঝিয়ে বল।

ভারতচন্দ্র ॥ কথায় কথায় সেখানে ঠিক সময়ে গিয়ে পৌছবো। তার আগে তোমার বর্ষফলের বুধের মন্ত্রিত্বের গুণ সম্বন্ধে কিছু বল দেখি।

মধুসূদন ॥ বুধের বৃত্তি হচ্ছে ব্যবসায়; মনে মনে সে বৈশ্য। আমাদের সাহিত্য হচ্ছে ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যের যুগ্ম বাহুর কীর্তি।

ভারতচন্দ্র ॥ অর্থাৎ তার এক হাতে হচ্ছে অস্ত্র, আর এক হাতে টাকার থলি।

মধুসূদন ॥ এবং সে থলিতে চল্লিশ হাজার টাকা। আমি বেশ চিন্তা করে দেখেছি বার্ষিক চল্লিশ হাজার টাকার কমে কোন সাহিত্যিকের জীবন যাপন সম্ভব নয়। তোমাকে কৃষ্ণচন্দ্র কত টাকার আয়ের সম্পত্তি দিয়েছিল!

ভারতচন্দ্র ॥ আমি তো সাহিত্যিক ছিলাম না।

মধুসূদন ॥ সাহিত্যিক ছিলে না?

ভারতচন্দ্র ॥ হয় তো পরোক্ষভাবে ছিলাম। কিন্তু আমাদের সময়ে জীবনের আদর্শ ছিল ভদ্রতা; আমি ভদ্রলোক ছিলাম, সেই ছিল আমার সবচেয়ে বড় গৌরবের বিষয়।

মধুসূদন ॥ তোমাদের সময়ে তবে কি সাহিত্যিক ছিল না ?

ভারতচন্দ্র ॥ সাহিত্যিক আর ভদ্রলোক বলে ছুটো স্বতন্ত্র শ্রেণী ছিল না ; কোন কোন ভদ্রলোক কবিতা রচনা করত, এইমাত্র। তোমাদের সময়ে বোধ হয় কোন কোন সাহিত্যিক ভদ্রতা রক্ষা করে চলে, কি বল ? এই ভাবে সময়ের হাওয়া উল্টে যাওয়াকেই তো তোমরা নবযুগ বলে থাক।

মধুসূদন ॥ নবযুগ নিয়ে পরিহাস করো না। ও তুমি বুঝতে পারবে না।

ভারতচন্দ্র ॥ চেষ্টা করতে ক্ষতি কি ?

মধুসূদন ॥ আমি অমিত্রাক্ষরের খাল কেটে ইউরোপের নবীন রক্তকে বাংলার ধমনীতে প্রবাহিত করে দিয়েছি।

ভারতচন্দ্র ॥ অর্থাৎ খাল কেটে কুমীর ঢুকিয়েছ।

মধুসূদন ॥ নাঃ তুমি কিছুতেই বুঝবে না দেখছি। "যার কর্ম তারে সাজে, অন্যলোকে লাঠি বাজে।"

ভারতচন্দ্র ॥ আমাকে তুমি অবজ্ঞা করতে, কিন্তু আমার কাব্য তো ভাল করেই পড়েছ দেখছি।

মধুসূদন ॥ আচ্ছা, এই নাও, আমি স্থির হয়ে বসলাম, পযার সম্বন্ধে তোমার কি বক্তব্য আছে, বল।

ভারতচন্দ্র ॥ তার আগে একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। আমি জন্মেছিলাম ইতিহাসের এক পর্বান্তে, আর তোমার জন্ম এক পর্বারম্ভে।

মধুসূদন ॥ হিয়ার। হিয়ার। "একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে।" ভারতচন্দ্র, এই পর্বভেদকেই আমরা যুগভেদ বলে থাকি।

ভারতচন্দ্র ॥ কিন্তু ভেদটা দেখলে কোথায় ? পরিবর্তন তো নিয়তই হচ্ছে, পরিবর্তন তো নবায়ন নয়। ও কি ও রকম মুখ করলে কেন ?

মধুসূদন ॥ বুঝতেই পারছ, কথাগুলো খুব হৃদ্য নয়।

ভারতচন্দ্র ॥ ঠিক, এ-যে "রুগী যেন নিম গেলে মুদিয়া নয়ন।" এখন, এই যুগভেদে ছন্দের ধর্মভেদ হয়েছে। পয়ার এই পর্বান্তের ছন্দ। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ান্তে যবনিকা পড়েছে, দর্শকদের

বিদায়ের জন্য কাংস্য ঘণ্টা বাজ্‌ছে, পয়ারের অন্ত্যানুপ্রাসে তারই প্রতিধ্বনি! আমাদের ছায়া-ঘেরা পল্লী, ঘুমে-ঘেরা রাত্রি, বেড়া-ঘেরা অন্তঃপুর, আর নিয়মে-ঘেরা জীবনযাত্রা, এর বাণীকে বহন করবার যোগ্যতা আছে পয়ারের। পয়ার হচ্ছে ছন্দের দলে পদাতিক; পদচারের দ্বারা পায়ে পায়ে পথ অতিক্রম করছে, অশ্বারোহীর উন্মাদনার ঝাঁপতালকে সে বহন করতে অক্ষম। আমার ছন্দ ভাল কি মন্দ, সে তর্কে লাভ নেই; আমার ছন্দ আমার যুগের মাপে তৈরী। জরিদার বাদশাহী নাগরায় কি লাভ, যদি তা আমার পায়ের মাপে না হয়?

বাংলা কাব্যের প্রথম উন্মেষের ক্ষণ থেকে এই ছন্দটিকে পূর্ণায়ত করবার 'চেষ্টা চলছে, কিন্তু কেউ পূর্ণায়ত করতে পারে নি। বৈষ্ণব কবিরা ছিলেন মহাজন, তাঁদের প্রতিভা ছিল গরুড়ের মত আকাশমুখী, কিন্তু তাঁদের যুগ পয়ারের যুগ ছিল না। গৌরাঙ্গের যে পদধ্বনি অনুক্ষণ তাঁরা হৃৎপিণ্ডের তালে তালে শুনতে পাচ্ছিলেন, তারই সঙ্গে পা মিলিয়ে তাঁরা নাচতে নাচতে চলেছিলেন। তাঁদের বিহ্বল পদচিহ্নের পদাবলীর ছন্দকে আমি বলি নৃত্যচারী বা লাচাড়ী। তারপরে আবার অনেক কাল গিয়েছে, গৌরাঙ্গের পদধ্বনি মিলিয়ে গিয়েছে, বাঙালী কবির আকাশমুখী প্রতিভা ক্লান্ত হয়ে পাখা গুটিয়ে মাটিতে এসে বসেছে; নিত্যকালের সুধার প্রার্থনায় আকাশের দিকে চাইতে ভুলে গিয়ে প্রত্যহের ক্ষুৎ-তণ্ডুলের আশায় মাটির দিকে তাকাতে আরম্ভ করেছে; সংসারের সুখদুঃখের মধ্যে আশা-উৎসাহের উঞ্ছকণা খুঁটে পায়ে পায়ে সে চলতে শিখেছে, বাঙালীর সেই মানসিক পদচারের পদাঙ্ক হচ্ছে পয়ার ছন্দ। একে অবহেলা করতে পার কিন্তু অবজ্ঞা ক'র না; পয়ার হচ্ছে একটা যুগের বাঙালীর মনের ছাঁচ। এ ছাঁচ তোমাদের প্রয়োজনে আর যদি না লাগে, একে রক্ষা কোর, উপেক্ষা করে' ভেঙে ফেল না।

মধুসূদন ॥ আমার অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঁধ-ভাঙা যুগের ছন্দ; এর ভাঙা বাঁধের যতিস্থাপনের স্বাধীনতার ফাঁক দিয়ে ইউরোপের প্রাণ-প্রবাহ

বাংলা সাহিত্যে এসে প্রবেশ করেছে, এবং ক্রমে তা বাস্তবে গিয়ে প্রবেশ করবে।

ভারতচন্দ্র ॥ ওই তোমাদের আর একটা মস্ত ভুল। বাস্তব আর সাহিত্যকে তোমরা মিশিয়ে ফেলে মিছামিছি একটা গোল পাকিয়ে তুলেছ।

মধুসূদন ॥ ইউরোপে এমন হ'য়ে থাকে।

ভারতচন্দ্র ॥ ইউরোপ অধঃপাতে যাক্।

মধুসূদন ॥ এত উষ্মা কেন?

ভারতচন্দ্র ॥ সাহিত্য আর বাস্তব সমান্তরাল নদী-তটের মত চলেছে—তার মাঝখানে নিরন্তর তরঙ্গিত হচ্ছে জীবনলীলা। এই জীবনলীলাকে রক্ষা করবার জন্যই সাহিত্যের, শিল্পের সার্থকতা। আর যেখানে সাহিত্য ও বাস্তবের দুই তটরেখা মিশে গিয়েছে, সেখানে নদী তো লুপ্ত। তোমাদের কাছে জীবনের চেয়ে সাহিত্য বড় হয়ে উঠেছে, সেইজন্যই সাহিত্যের সার্থকতাও আর নাই; সাহিত্য তোমাদের মুখের কথায় মাত্র পর্যবসিত।

আমরা জানতাম, সাহিত্য আর জীবন স্বতন্ত্র সত্তা—তাই সাহিত্যের গ্লানি জীবনকে স্পর্শ করতে পারে নি। আমার কাব্যে এমন অনেক অংশ আছে ইচ্ছা করলে যাকে অশ্লীল বলতে পার, কিন্তু তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হয় নি, তার কারণ আমাদের ধারণায় সাহিত্য হচ্ছে জীবনের ভৃত্য; ভৃত্যের কাঁধে মলিন গামছা হয়তো থাকে, কিন্তু তাকে উত্তরীয় বানাবার সখ মনিব কখনো করেনি।

মধুসূদন ॥ আমার মেঘনাদ বধ কাব্যে কি এই নিরপেক্ষতা দেখতে পাওনি?

ভারতচন্দ্র ॥ মেঘনাদ বধ কাব্যে নিরপেক্ষতার ভান আছে মাত্র;—নিরপেক্ষতা নাই। তোমার এই অমর কাব্যের ফ্রেমখানাকে পৌরাণিক যুগের স্বর্ণলঙ্কার সোনা দিয়ে বাঁধিয়েছ। কিন্তু যে ছবি এতে প্রতিবিম্বিত তা পৌরাণিক নয়—নিতান্ত আধুনিক।

মধুসূদন ॥ আধুনিক?

ভারতচন্দ্র ॥ আধুনিক বই কি! তোমার বিদ্রোহী, অনাচারী রাবণ ইংরাজি

শিক্ষার প্রথম আমলের বিদ্রোহী, অনাচারী বাঙালী যুবকের প্রতিবিম্ব! তোমরা সকলেই খুদে খুদে রাবণ হয়ে উঠেছিলে, আর সেই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূর্যরশ্মি তোমার প্রতিভার অতসী কাঁচের ভিতর দিয়ে সংহত হয়ে রাবণের অতিকায়িক দীপ্তি সৃষ্টি করেছে, স্বর্ণলঙ্কায় লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়েছে। আরও একটা সত্য কথা শুনবে? সমুদ্রের পরপারবর্তী অনাচারী রাক্ষসদের ঐশ্বর্যময় যে দ্বীপ তোমাদের মনোহরণ করেছিল, তা সিংহল দ্বীপ নয়—তা শ্বেতদ্বীপ—ইংলণ্ড।

মধুসূদন ॥ এ সব কথা কখনও ভাবিনি।

ভারতচন্দ্র ॥ তার কারণ এসব কথা তোমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। মধুসূদন, তোমাব অপরিমেয় প্রতিভা ছিল, তাই বঙ্গ-সাহিত্যের স্বর্ণকুম্ভের মুখ খুলে যে দৈত্যকে বের করে দিলে তার হাতে তোমাকে নিগৃহীত হতে হয় নি। কিন্তু তোমার পরে যারা আসবে, তাদের সবারই তোমার প্রতিভা না থাকতেও পারে। তোমার শক্তি পাবে না, ঠাট মাত্র পাবে, তাদের দুর্দশা স্মরণ করে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠছি।

মধুসূদন ॥ এই দৈত্যের হাতে তাদের প্রাণের আশঙ্কা আছে?

ভারতচন্দ্র ॥ তাদের প্রাণ যায—যাক্। বঙ্গসাহিত্যের স্বর্ণঘট না ভেঙে যায়।

মধুসূদন ॥ এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আরও আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে।

ভারতচন্দ্র ॥ চল—তা হলে আমার সঙ্গে।

মধুসূদন ॥ সঙ্গে কিছু আছে? ধার দিতে পার?

ভারতচন্দ্র ॥ মধুসূদন—তুমি ঠিক সেই রকমই আছ, কিছু পরিবর্তন হয়নি দেখছি।

মধুসূদন ॥ আচ্ছা ঋণ চাইলে লোকে উপহাস করে কেন বলতে পার?

ভারতচন্দ্র ॥ তোমার ফিরিয়ে দেবার অভ্যাস নেই বলে।

মধুসূদন ॥ তাতে ক্ষতি কি? আমার শেষ পয়সাটা পর্যন্ত আমি ঋণ দিতে প্রস্তুত; কতবার দিয়েওছি। কিন্তু তা নিয়ে তো বিদ্রূপ করিনি; ফিরেও চাইনি; ভুলেই গিয়েছি।

ভারতচন্দ্র ॥ তোমার কাছে ঋণ আর ধন একার্থক; যেমন একার্থক সাহিত্য

আর জীবন। কল্পনা আর বাস্তবে মিশিয়ে ফেলেছ বলেই তুমি ধনে ঋণে প্রভেদ করতে পার না।

মধুসূদন ॥ তাতে ক্ষতি কি ?

ভারতচন্দ্র ॥ তোমার কিছু ক্ষতি নেই। যে ঋণ দেয় তার ক্ষতি।

মধুসূদন ॥ ধন আর ঋণ বিষয়ে স্বর্গ দেখছি ঠিক পৃথিবীরই মত।

ভারতচন্দ্র ॥ এ কথা কে বললে ?

মধুসূদন ॥ তবে ?

ভারতচন্দ্র ॥ স্বর্গ হচ্ছে সেই স্থান যেখানে ঋণ চাইলে পাওয়া যায়—আর ফিরে দিতে হয় না।

মধুসূদন ॥ চমৎকার !

ভারতচন্দ্র ॥ পৃথিবী হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে ঋণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ফিরে দিতে হয়।

মধুসূদন ॥ আর নরক ?

ভারতচন্দ্র ॥ আর নরক হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে মোটেই ঋণ পাওয়া যায় না।

মধুসূদন ॥ সর্বনাশ !

ভারতচন্দ্র ॥ সর্বনাশ কিসের ? তুমি তো স্বর্গে এসেছ—চল।

মাইকেল মধুসূদন ও টেকচাঁদ ঠাকুর

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্র) মধ্যে গদ্যরীতি লইয়া যে বাদানুবাদ হইয়াছিল তাহার উল্লেখ মধুসূদনের জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যাইবে। সংলাপটির মূলে সেই বিতর্ক।

মাইকেল ॥ এ আবার কি করছেন? ঘরে বাইরে এক রকম পোশাক!

টেকচাঁদ ॥ কেন, ক্ষতিটা কি? ঘরে বাইরে ভিন্ন হওয়া কি ভালো?

মাইকেল ॥ কিছু ভিন্ন হ'তে হবে বই কি। নইলে ঘর আর বাহির আলাদা হয়েছে কেন?

টেকচাঁদ ॥ আলাদা হয়নি, ব্যবহারের দ্বারা তোমরা আলাদা ক'রে ফেলেছ।

মাইকেল ॥ তবে বুঝ্‌তে হবে কারণ আছে।

টেকচাঁদ ॥ অবশ্যই কারণ আছে, তবে সেটা লোকের নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত।

মাইকেল ॥ মানুষকে নির্বোধ বলে ধরে নিয়ে কাজ সুরু করলে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌছবেন?

টেকচাঁদ ॥ যেখানে পৌছেছি, তোমাদের দাঁতভাঙা সংস্কৃত ভাষা থেকে সরল প্রাকৃত ভাষায়।

মাইকেল ॥ প্রাকৃত ভাষা যে সাহিত্যের প্রকৃত ভাষা তা কি সত্যিই প্রমাণ হয়েছে। প্রাচীন সংস্কৃত নাটক টিকে আছে, প্রাকৃত ভাষার সাহিত্য কোথায়?

টেকচাঁদ ॥ কেন, ঐ সংস্কৃত নাটকের মধ্যেই আছে, যেখানে প্রাকৃত জনে কথা বলছে।

মাইকেল ॥ নাটকের কথা তুলবেন না, নাটক গ'ড়ে ওঠে মুখের ভাষার উপরে। নানা মুখ নানা ভাষায় কথা বলে।

টেকচাঁদ ॥ তাহলেই প্রমাণ হ'ল যে মুখের ভাষা সাহিত্যের ভাষা বলে' গণ্য হয়েছে।

মাইকেল ॥ কিন্তু মুখের ভাষা মুখ্য ভাষা ব'লে গণ্য হয়নি, হয়েছে সংস্কৃত ভাষা।

টেকচাঁদ ॥ দাঁতভাঙা সংস্কৃত—

মাইকেল ॥ ওতে যাদের দাঁত ভেঙে যায় তাদের দাঁত থাকলেই বা কি লাভ হত ?

টেকচাঁদ ॥ প্রাচীনকালের কথা ছেড়ে দাও, তখনকার সব খবর জানিনে, আধুনিক কালের কথা ধরো। সীতার বনবাস কয়জনে বুঝবে ? আলালের ঘরের দুলাল কয়জনে না বুঝবে ?

মাইকেল ॥ আপনার অভিজ্ঞতাকে দুর কালের মধ্যে ছড়িয়ে দিলে দেখতে পেতেন যে আপনার অনুমান ঠিক উল্টো।

টেকচাঁদ ॥ কেমন ?

মাইকেল ॥ ঠিক আজকের দিনের পক্ষে আপনার অনুমান সত্য, কিন্তু সাহিত্যের আশ্রয় তো কেবল বর্তমান কাল নয়, ভবিষ্যৎ কালও বটে।

টেকচাঁদ ॥ তাতে কি প্রমাণ হবে ?

মাইকেল ॥ প্রমাণ হবে এই যে আজ থেকে একশ' বছর পরে আলালী ভাষা দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়াবে।

টেকচাঁদ ॥ দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়াবে ?

মাইকেল ॥ আর সীতার বনবাসের ভাষাই হবে সর্বজনবোধ্য।

টেকচাঁদ ॥ কি বলছ !

মাইকেল ॥ সার কথা বলছি। আজ থেকে একশ' বছর পরেকার শিক্ষিত বাঙালীর সমুখে সীতার বনবাসের যে-কোন পৃষ্ঠা খুলে ধরলে সে অনায়াসে বুঝতে পারবে, একটি শব্দেও তার বাধবে না, আর আলালের যে-কোন পৃষ্ঠা খুলে ধরলে সে ছত্রে ছত্রে হুঁচোট খেতে থাকবে —

টেকচাঁদ ॥ আশ্চর্য !

মাইকেল ॥ মোটেই আশ্চর্য নয়। কালক্রমে সংস্কৃতভাষার প্রসার অনিবার্য, আর তেমনি অনিবার্য ফারসী ভাষার সঙ্কোচ। আপনি যাকে প্রাকৃত ভাষা বলছেন তা ফারসী ভাষার প্রাকৃত, তা পারস্যের লোকের মৌখিক ভাষা হ'তেও পারে, এ দেশের কখনো নয়।

টেকচাঁদ ॥ তবু তা লৌকিক ভাষা, যে দেশেরই লোকের হোক না কেন ; তুলনায় সংস্কৃত কৃত্রিম।

মাইকেল ॥ ক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্টি হলে যদি কৃত্রিম হয়, তবে সংস্কৃত ও ফারসী দুই-ই কৃত্রিম। আর তাছাড়া সাহিত্যই যে কৃত্রিম। সাহিত্য তো বনের ফুল বা ব্যাঙের ছাতা নয়।

টেকচাঁদ ॥ কিন্তু কৃত্রিম বস্তু কতদিন টিকে থাকবে?

মাইকেল ॥ কুতুব মিনার, তাজমহল, মিশরের পিরামিড তো দিব্য টিকে আছে।

টেকচাঁদ ॥ পাথরের কথা ছাড়ো, সাহিত্যের কথা বলো।

মাইকেল ॥ কেন, ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাসের কাব্য কি টিকে নেই?

টেকচাঁদ ॥ আমি বলছি ওসব কাব্য তৎকালীন লোকভাষায় লিখিত হয়েছিল!

মাইকেল ॥ এবার হাসিয়ে ছাড়লেন! মেঘদূতের ভাষা লোকভাষা।

টেকচাঁদ ॥ কিন্তু তুমি দেখো আলালী ভাষাই লোকে গ্রহণ করবে।

মাইকেল ॥ আপনি আমি অবশ্য দেখতে পাবো না, তবু জানবেন যে লোকে সীতার বনবাসের ভাষা, মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষাকেই গ্রহণ করবে।

টেকচাঁদ ॥ ওযে পণ্ডিতের গড়া ভাষা।

মাইকেল ॥ আর যাকে আলালী ভাষা বলছেন তা মূর্খের গড়া ভাষা।

টেকচাঁদ ॥ আমি মূর্খ নই।

মাইকেল ॥ আমিও পণ্ডিত নই।

টেকচাঁদ ॥ আলালে আমি সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছি, এর পরে চলিত ক্রিয়াপদ গ্রহণ করবো, সাধু ক্রিয়াপদ কৃত্রিম।

মাইকেল ॥ কেন?

টেকচাঁদ ॥ ওটা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের সৃষ্টি।

মাইকেল ॥ এটি মস্ত ভুল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হ'বার অনেক আগে লিখিত চিঠিপত্র আমি দেখেছি, তাতে সব ক্রিয়াপদই সাধু, আর সে-সব চিঠিপত্র যারা লিখেছিল তাদের কেউই পণ্ডিত নয়, কেউবা জমিদারের গোমস্তা, কেউ বা কুঠিয়ালের মুন্সী।

টেকচাঁদ ॥ তারা মুখের কথায় নিশ্চয়ই সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতো না।

মাইকেল ॥ নিশ্চয়ই নয়। সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষা নয়, বুকের ভাষা,

অর্থাৎ যে-ভাষায় লোকে কথা বলে তা নয়, যে-ভাষায় লোকের কথা বলা উচিত।

টেকচাঁদ ॥ এ আবার এক নূতন হাঙ্গামা সৃষ্টি করলে, বুকের ভাষা কি ?

মাইকেল ॥ মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ নিশ্চয়ই ছিদাম মুদির ভাষায় কথা বলবে না।

টেকচাঁদ ॥ বললে ক্ষতি কি ?

মাইকেল ॥ ক্ষতি এই যে, তখন রাবণ আর রাবণ থাকবে না। প্রাত্যহিক ব্যবহারে মুখের ভাষায় এক রকম কাজ চলে যায়, কারণ প্রাত্যহিক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র খুব ব্যাপক নয়। সাহিত্যে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত হয়ে যায়, তাই তখন স্বতন্ত্র ভাষার আবশ্যক হয়, তাকেই বলছি বুকের ভাষা, তাতে ছন্দের প্রয়োজন হয়, অলঙ্কার আসে, উপমা আসে, ব্যঞ্জনা আসে। আর এই সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সংস্কৃত ভাষার গোমুখী খুলে গিয়ে অপূর্ব শব্দসম্পদ বেরিয়ে পড়ে।

টেকচাঁদ ॥ আলাল কি সাহিত্যশিল্প হ'য়ে ওঠেনি।

মাইকেল ॥ অবশ্যই হ'য়েছে, কিন্তু ওর ক্ষেত্র প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র, তাই আলালী ভাষায় কাজ চলেছে, কিন্তু সীতার বনবাস, কি মেঘনাদবধ কাব্যের ক্ষেত্র যে অনেক ব্যাপক।

টেকচাঁদ ॥ আমার তো ধারণা সে সংস্কৃত-ঘেঁষা ভাষা আর সাধু ক্রিয়াপদ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের সৃষ্টি।

মাইকেল ॥ এই তো বল্‌লাম যে তার অনেক আগে লিখিত চিঠিপত্রে সাধু ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়।

টেকচাঁদ ॥ তারা পেলো কোথায় ?

মাইকেল ॥ প্রাচীন বাংলা সাহিত্য থেকে, তাতে দুই রকম ক্রিয়াপদই রয়েছে। কোন স্থানে আছে "করলুঁ", তা থেকে আমরা পাচ্ছি "করলুম, করলাম", আবার কোন স্থানে আছে "কৈল", তা থেকে আমরা পাচ্ছি "করিল"। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অনেক আগে এর মূল।

টেকচাঁদ ॥ তবে কি বলতে চাও যে প্রাচীন সাহিত্যে লেখকগণ দুই রকম ক্রিয়াপদই অবিচারে ব্যবহার ক'রে গিয়েছেন ?

মাইকেল ॥ প্রাচীন সাহিত্য মানেই কাব্যসাহিত্য, কাব্যে অভিধান ব্যাকরণ স্বভাবতই কিছু শিথিল, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই প্রাচীন কবিরা বুকের ভাষায় সাহিত্য রচনা ক'রে গিয়েছেন, মুখের ভাষায় নয়। নিছক লৌকিক ভাষা ব্যবহারের উৎকট থিওরি তাঁদের মাথায় চাপেনি বলেই লোকে অনায়াসে তাদের কাব্যের রসগ্রহণ করতে পেরেছে।

টেকচাঁদ ॥ ভাষা না বুঝতে পারলে রসগ্রহণ করবে কি ভাবে?

মাইকেল ॥ রসগ্রহণের প্রধান অন্তরায় ভাষা নয়, লোকচিত্তের সঙ্গে পরিচয়ের অভাব।

টেকচাঁদ ॥ তুমি কি মনে করো যে সীতার বনবাসে আর মেঘনাদবধ কাব্যে লোক-চিত্তের প্রবেশপথ আছে?

মাইকেল ॥ অবারিত প্রবেশপথ। সীতার দুঃখ যে-কোন নারীর দুঃখ, রাবণের দুঃখ যে কোন মানুষের দুঃখ। লোকচিত্তের সদর রাজপথের পাশেই ও দুই-গ্রন্থের বনিয়াদ স্থাপিত।

টেকচাঁদ ॥ আলালের কাহিনীর দুঃখ কি স্বতন্ত্র?

মাইকেল ॥ স্বতন্ত্র বৈ কি! আলাপের কাহিনীর ভিত্তি সামাজিক দুঃখ, সমাজের অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেই ও দুঃখেরও রূপ বদলে যাবে। আগের দুটি মানবিক কাহিনী, সেই জন্যেই মানুষে অনায়াসে তার সুখ-দুঃখের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে। সাধুভাষায় লিখিত বলে তা অগম্য হ'য়ে থাকবে না, যেমন অগম্য হ'য়ে নেই চন্দ্রনাথ তীর্থ দুর্গম গিরিশিখরে। হ্যাঁ, একটা ঘটনা বলে নিই, চীনা-বাজারের এক জুতোওয়ালাকে সেদিন স্বচক্ষে আমি মেঘনাদবধ কাব্য পড়তে দেখেছি। তারপরে কি ক'রে বলি যে লোকচিত্তের দরজা সে কাব্যে রুদ্ধ।

টেকচাদ ॥ আলাল সম্বন্ধে তেমন অভিজ্ঞতা অবশ্য আমার ঘটেনি।

মাইকেল ॥ যদি মাপ করেন তো বলবো যে ও বই শিক্ষিত সৌখীন বাবুদের পাঠ্য। ময়নার মুখে "রাধাকৃষ্ণ" বুলি শুনে লোকে যেমন বলে ওঠে 'বাঃ কেমন সুন্দর বোঝা যাচ্ছে, আলাল বা হুতোমপেঁচার নক্সা সম্বন্ধেও লোকের সেই রকম ভাব। এ ভাষায় আদৌ যে কিছু

লেখা যায় তাতেই তারা বিস্মিত। এ যেন মেয়েছেলের ঘোড়ায় চড়া, ভালো চড়তে পারে না তাতে কেউ দুঃখিত হয় না, আদৌ যে চড়তে পারছে তাতেই সবার আনন্দ!

টেকচাঁদ ॥ তা হ'লে দাঁড়ালো কি?

মাইকেল ॥ সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধুভাষা ও লোকভাষা দুই-ই কৃত্রিম, তবে দুটা দুই কারণে কৃত্রিম। এখন, এ রকম ক্ষেত্রে কোন একটিকে যদি গ্রহণ করতে হয়, সেটিকেই করা উচিত যার ভাবপ্রকাশ ক্ষমতা অধিক।

টেকচাঁদ ॥ সে ক্ষমতা যে সাধু ভাষার তা কি নিশ্চিত রূপে প্রমাণ হয়েছে?

মাইকেল ॥ নিশ্চিতরূপে প্রমাণ কবে হবে? আপাতত প্রমাণ হয়েছে যে সাধু গদ্যে, সাধু পদ্যে সীতার বনবাস, মেঘনাদবধ কাব্য রচনা সম্ভব। আর লোকভাষায় আলাল ও হুতোমের বেশি কিছু সম্ভব নয়। আরও দাঁড়ালো এই যে লোকচিত্তে প্রবেশের প্রধান অন্তরায় ভাষা নয়, লোকচিত্তের সঙ্গে পরিচয়ের অভাব। আর সবচেয়ে বেশি করে দাঁড়ালো এই যে সাহিত্যের যথার্থ বস্তু মানবিক কাহিনী, সামাজিক কাহিনী নয়। এবারে চিন্তা করলে দেখতে পাবেন যে সিদ্ধান্তগুলো পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, যথেচ্ছ মাত্র নয়।—নিন, অনেক হ'য়েছে, এবার আমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের জোগাড় ক'রে দিন।

টেকচাঁদ ॥ অবাক্ করলে, তোমার আবার সন্ধ্যা-আহ্নিক কি?

মাইকেল ॥ কেন, টাম্বলার-রূপ কোশাতে, পেগ-রূপ কুশি দিয়ে সুরা-রূপ গঙ্গাজল দ্বারা।

টেকচাঁদ ॥ তাই বলো, কারণ!

মাইকেল ॥ অকারণ নিশ্চয়ই নয়।

টেকচাঁদ ॥ মধু, সার্থক তোমার নাম, মধুর তোমার স্বভাব।

মাইকেল ॥ নামটা সার্থক ক'রে রাখবার আশাতেই তো সুরা ছাড়িনে।

টেকচাঁদ ॥ কি রকম?

মাইকেল ॥ মধু মানেই তো সুরা।

বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র

দুইজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের মধ্যে রোহিণী সম্পর্কিত এই সংলাপ কাল্পনিক হইলেও রোহিণীর মৃত্যুটা আজও একটা নৈতিক সমস্যারূপে সাহিত্য সমাজে রহিয়া গিয়াছে। সংলাপটি সেই সমস্যায় আলোকনিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ রোহিণী, রোহিণী, আঃ বিরক্ত করে মারলে। কে বাপু! ও তুমি শরৎচন্দ্র? তুমি শরৎচন্দ্র, আমি বঙ্কিমচন্দ্র—আর রোহিণীর প্রতি চন্দ্রের আকর্ষণ তো স্বাভাবিক।······কিন্তু ব্যাপার কি শরৎচন্দ্র?

শরৎচন্দ্র ॥ আমি বলছি, তুমি রোহিণীর প্রতি অবিচার করেছ।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ ওঃ এই কথা! আমি যে রোহিণীকে বিচার করতে বসেছিলাম, এ কথা তোমাকে কে বললে?

শরৎচন্দ্র ॥ তুমি কি···

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ হাঁ, আমি ডেপুটি ছিলাম বটে—

শরৎচন্দ্র ॥ সে কথা বলছি না, তুমি কি ঔপন্যাসিক ছিলে না?

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ গল্প লিখতাম বটে—কিন্তু তাতে বিচারের কথা তো ওঠে না!

শরৎচন্দ্র ॥ বল কি! ঔপন্যাসিকরা হচ্ছে সামাজিক মনের বিচারক।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ কথাটা মনে রাখবো। আচ্ছা, রোহিণীর প্রতি আমি কি অবিচার করেছি—বলতো।

শরৎচন্দ্র ॥ তুমি তাকে মেরে ফেল্‌লে কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ আমি তো মারি নি; গোবিন্দলাল বলে একটা গোঁয়ার ছোকরা মেরেছিল।

শরৎচন্দ্র ॥ ওই একই কথা হ'ল।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ কি রকম?

শরৎচন্দ্র ॥ গোবিন্দলালকে দিয়ে তুমিই মারিয়েছ।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ বটে! কৃষ্ণকান্তের উইলের বাইরে যে-সব গোবিন্দলাল বিচরণ করছে, তারা কি রোহিণীদের মারছে না? সে সবও কি আমার কীর্তি!

শরৎচন্দ্র ॥ মারছে, কিন্তু অন্যায় ক'রে মারছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ তাহলে আমার দোষটা কোথায়? আমি সংসারের ধারাকে মাত্র অনুসরণ করেছি। আর গোবিন্দলাল যদি রোহিণীকে না মারতো, তাহলে গোবিন্দলালের স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটানোতে তার প্রতি অবিচার করা কি হ'ত না?

শরৎচন্দ্র ॥ নাঃ তোমার দরদের একান্ত অভাব।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ দরদ! সেটা আবার কি?

শরৎচন্দ্র ॥ দরদ জানো না?

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ না, আমাদের সময়ে ও কথাটা চলতি ছিল না। ওটার বাংলা কি?

শরৎচন্দ্র ॥ দরদ, সিম্‌প্যাথি, করুণা। তোমাদের মধ্যবিত্ত সংস্কার যাদের অন্ত্যজ করে রেখেছিল তাদের আমি উপন্যাসের অন্তঃপুরে আদর করে এনে বসিয়েছি।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ মধ্যবিত্ত সংস্কার! এ কথাটাও নূতন। আচ্ছা, সেই সৌভাগ্যবানেরা কে?

শরৎচন্দ্র ॥ সৌভাগ্যবান্ নয়, সৌভাগ্যবতী; তবে ইচ্ছা করলে সৌভাগ্যবান্‌ও বলতে পারো, আমরা ব্যাকরণকে অত খাতির করিনে।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ দু'চার জন সৌভাগ্যবতীর নাম শুনতে পারি?

শরৎচন্দ্র ॥ সাবিত্রী, চন্দ্রমুখী, রাজলক্ষ্মী।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ এদের কি তুমি রোহিণীর দলের মনে কর?

শরৎচন্দ্র ॥ কেন নয়?

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ এই জন্যে নয় যে তারা একদলের হলেও এক জাতের নয়; রোহিণী সাধারণ পতিতা, আর ও-তিন-জনের অসাধারণত্ব আছে।

শরৎচন্দ্র ॥ তা আছে বটে!

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ তা হলেই দেখ, তোমার দরদ পতিতাদের প্রতি নয়, তাদের মধ্যে যারা বিশিষ্ট তাদের প্রতি।

শরৎচন্দ্র ॥ কি রকম?

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ অর্থাৎ ওরা সমাজের যে-স্তরেই থাক সকলের উপরে ওদের মাথা

দেখা যেতো। একটা দলের মধ্যে যারা কোন বিশেষ কারণে বিশিষ্ট তাদের প্রতি বিচার সে দলের প্রতি বিচার নয়; ওরা নিয়ম নয়, নিয়মের ব্যতিক্রম।

শরৎচন্দ্র ॥ ঘটনাচক্রের আবর্তনে ওরা পতিতাদের মধ্যে গিয়ে পড়েছে বলেই আমার মধ্যবিত্ত-সংস্কারমুক্ত মন ওদের পতিতাদের সামিল করে ফেলে নি।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ তোমার মন সংস্কারমুক্তই হোক আর সংস্কৃতিগ্রস্তই হোক—ওদের এক করে ফেলতে পারতো না। বিধাতা পুরুষ ওদের বড় মাপে গড়েছিলেন—এই বড় মাপের পক্ষে খিড়কি দরজা ছোট হলেও সিংহদ্বার অবারিত; আর সিংহদ্বার যদি খাটো বলে ধরা পড়ে, তারা সে দরজা ভেঙে ফেলে দিয়ে প্রবেশ করে। সব দেশের সব সমাজেই এদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। Mary Magdalene-এর কাহিনী মনে আছে তো? তোমার দরদ আছে কি না, এবং কতখানি আছে, তার বিচার হবে তুমি সাধারণ মাপের পতিতাদের দিয়ে কি করিয়েছ। তোমার মোক্ষদাকে মনে পড়ে? মুখি ঝি, যে আগে নোটখানি আঁচলে বেঁধে তবে কথা বলে! তাকে আঁকবার সময়ে তোমার দোয়াতের সব কালি উল্টে তার উপরে পড়ে গিয়েছিল—মনে হচ্ছে?

শরৎচন্দ্র ॥ আমি যা দেখেছি তাই এঁকেছি, বাড়িয়ে কমিয়ে বলিনি, আমি যে রিয়ালিষ্ট্।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ বটে! বিচিত্র তোমার রিয়ালিজম্। তোমার পতিতারা সতী-সাধ্বী, আর ঘরের বউরা পতনশীলা!

শরৎচন্দ্র ॥ কে বল্‌ল?

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, চন্দ্রমুখী অত্যন্ত সাধ্বী, বহুনিষ্ঠাকে অতিক্রম করে তারা একনিষ্ঠায় এসে পৌছেছে। আর তোমার অচলা—চঞ্চলা, পতনশীলা; তোমার কিরণময়ী, অভয়া—সদ্যঃপাতী। এমন অবাস্তব বাস্তবতা পেলে কোথায়?

শরৎচন্দ্র ॥ কিন্তু আমার দরদ তো শুধু পতিতাদের মধ্যে আবদ্ধ নয়, এমন কি মেয়েদের মধ্যেও আবদ্ধ নয়; সমাজের যে কেউ যেখানে দুঃখ-কষ্ট-

অনাচার-অত্যাচারের দ্বারা উৎপীড়িত, সকলের জন্য সমান ভাবে আমার করুণা।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ কথাটা শোনাচ্ছে ভাল—একটু বিচার করা যাক। তুমি যাকে বলছ দরদ, যার অপর নাম হচ্ছে করুণা, সে বস্তু বৃষ্টিধারার মতো নিরপেক্ষ ; দুর্যোধনের কুমড়োর ক্ষেত আর যুধিষ্ঠিরের বেগুনের ভুঁয়ে সমানভাবে তার আশীর্বাদের বর্ষণ, তার কাছে কুরু-পাণ্ডবের ভেদ নেই।

শরৎচন্দ্র ॥ বাঃ ঠিক বলেছ ; বোধ করি এমন ভাবে বলতে আমিও পারতাম না।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ কিন্তু তোমার করুণা কি ভগবানের বৃষ্টিধারার মত নিরপেক্ষ !

শরৎচন্দ্র ॥ লোকের তো সেই রকম-ই ধারণা।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ লোকের কথা ছেড়ে দাও—তোমার একখানা উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করা যাক ; ধর তোমার 'পল্লী-সমাজ', বইখানা আমায় খুব ভাল লাগে, অনেকবার পড়েছি ; প্রথম দিকটা চমৎকার, কিন্তু শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী-সমাজের থিওরিকে কাজে খাটাতে গিয়ে সব মাটি করে ফেলেছে। সে যাক গে—প্রথম দিকটাই যথেষ্ট। রমার উপরে তোমার দরদ আছে, কারণ রমার দুঃখের মূলে সামাজিক বিধান ; রমেশকে বিবাহ করতে পারলে সে হয়তো সুখী হ'ত। রমেশের প্রতিও তোমার দরদের অন্ত নাই—শহরের মানুষ হয়ে সে গ্রামে এসে পড়াতে বড় বড় শুভ ইচ্ছার পালোয়ারি নৌকা গ্রাম্য সংস্কারের আওড়ে পড়ে বানচাল হয়ে যাচ্ছে, তাকেও তোমার করুণা। আকবর লাঠিয়াল, যে একজনের হুকুমে আর এক জনের মাথা গিয়ে ফাটিয়ে আসে, তার মধ্যেও তুমি মানবমহত্ত্ব আবিষ্কার করেছ, আমরা দেখে বিশ্বাস করেছি। কিন্তু এ থেকে প্রমাণ হয় না যে, সকলের প্রতি তোমার করুণা !

শরৎচন্দ্র ॥ বাদ পড়ল কে ?

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ বেণী ঘোষাল।

শরৎচন্দ্র ॥ সেটা তো বদ্‌মাইস ! বিশেষ তো উৎপীড়িত নয়—সেই তো উৎপীড়ক।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ কিন্তু পেয়াদার উপরেও পেয়াদা আছে।

শরৎচন্দ্র ॥ অর্থাৎ—

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ উৎপীড়কেরও উৎপীড়ক আছে।

শরৎচন্দ্র ॥ কে সে ?

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ কোন লোক নয়—একটা ব্যবস্থা, কথনো সামাজিক, কথনো রাষ্ট্রিক।

শরৎচন্দ্র ॥ বুঝিয়ে বল।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ বেণী ঘোষাল খারাপ লোক, কিন্তু খারাপ হ'ল কি করে! রমেশ যে পল্লী-সমাজ থেকে ঘটনাচক্রে দূরে গিয়ে পড়েছিল বেণীর ভাগ্যে তা হয়ে ওঠে নি। রমেশ পল্লী-সমাজে থেকে গেলে খুব সম্ভবতঃ, আর একটা দুর্দান্ততর বেণী ঘোষালের সৃষ্টি হ'ত। বর্তমানে বেণী ঘোষাল যে পল্লী-সমাজের অংশবিশেষ, চিরকাল তা ছিল না। এখন দেখছ বেণী ঘোষাল একজন exploiter, কিন্তু আদ্যন্ত ইতিহাস স্মরণ করে দেখ—এক হিসাবে সেও exploited। এই কথা দুটো আজকাল খুব চলছে, না ? তোমার দৃষ্টির যথেষ্ট উদারতা থাকলে দেখতে পেতে, অত্যাচারটার সৃষ্টি বেণী ঘোষাল থেকে নয়- তার পিছনেও বহুদূর অবধি অত্যাচারের শৃঙ্খল চলে গিয়েছে ; বেণী সেই শৃঙ্খলের মধ্যে একটা গিঁটমাত্র। যেমন ভিড়ের ব্যাপার আর কি ? তুমি দুষছো আমি তোমাকে ধাক্কা দিলাম—কিন্তু আমি যে পিছন থেকে ঠেলা খাচ্ছি। বেণী ঘোষাল অত্যাচার করছে, কিন্তু কত ক্ষুদ্র অত্যাচার, কত নীরব সংস্কার, কত অকথিত ঘৃণার চাপে স্বাভাবিক মনুষ্য-প্রকৃতি বিকৃত হলে তবে বেণী ঘোষালের সৃষ্টি সম্ভব তা কি তুমি জানো ? আর যদি জানতে তবে তোমার করুণার বৃষ্টি রমেশের কৃষিক্ষেত্রে নিঃশেষে পতিত হয়ে বেণী ঘোষালের ভুঁইকে শুষ্ক করে রাখ্‌তো না।

শরৎচন্দ্র ॥ একথা মেনে নিলে তো জগতে খারাপ লোক থাকে না।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ মেনে নিলেও থাকবে, না নিলেও থাকবে। খারাপ লোককে ভাল করবার জন্যে তোমাকে মুক্তি-ফৌজ খুলতে বলিনি, আর

জগতে যখন খারাপ লোক আছে, আর রিয়ালিষ্ট্ লেখক আছে, তারা যথাযথ ভাবে চিত্রিত হবেই। আসল কথা হচ্ছে, খারাপ লোক কি অবস্থাচক্রে পড়ে' কোন্ সুদূর-প্রসারী কার্যকারণ শৃঙ্খলার ফলে খারাপ হ'ল—সেটা দেখিয়ে দিতে হবে।

শরৎচন্দ্র ॥ তা হলে কি হবে ?

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ তা হলে তার প্রতি সুবিচার করা হবে, আর সুবিচার করা মানেই তাকে করুণা করা। শেক্সপীয়র এই রহস্য অবগত ছিলেন—ম্যাকবেথের অপরাধের দণ্ড দিতে তিনি দুর্ব্বলতা করেননি, ধনে-জনে-মানে-প্রাণে তাকে নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছেন—কিন্তু যে কার্যকারণ শৃঙ্খলায় ম্যাকবেথের প্রাথমিক মহত্ত্ব লঘুতর হ'তে হ'তে, কলঙ্কিততর হ'তে হ'তে নৈতিক ও চারিত্রিক অন্তিমে এসে পৌছিল, সেই সূত্রটা তিনি পাঠকদের দেখিয়ে দিয়েছেন, যার ফলে নরঘাতক, শিশুঘাতক, রাজঘাতক, বিশ্বাসঘাতক রাক্ষসটার প্রতিও আমরা করুণা অনুভব করি—তার মৃত্যুতে খুশী হই, তবু করুণার অভাব হয় না।

শরৎচন্দ্র ॥ তুমি করুণার যে সংজ্ঞা দিচ্ছ, সে বস্তু তোমার গল্পেও নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ কে বলেছে আছে ? কিন্তু কৃষ্ণকান্তের উইলের গোবিন্দলালকে অপরাধী জেনেও কি তার প্রতি করুণা অনুভূত হয় না? নগেন্দ্রনাথের চারিত্রিক দুর্বলতা জেনেও তার প্রতি মমত্ব-বোধ হয় না ? শেষ পর্যন্ত হীরা দাসীর পতনে কি তাকে অধিকতর করুণার যোগ্য বলে মনে হয় না ? আর সেই যে সম্রাট্‌কন্যা জেব-উন্নিসা পুষ্পশয্যায় বসে যে দাবানলের দাহে পলে-পলে দগ্ধ হয়ে মরেছে, তার প্রতি পাঠকের অযাচিত করুণা কি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে না ?

শরৎচন্দ্র ॥ তোমার করুণা এত নিরপেক্ষ যে তার মত কঠিন অল্প বস্তুই আছে। এই করুণার স্পর্শে মানুষ অমানুষ হয়ে পড়ে! চন্দ্রশেখরের প্রতাপকে ধরা যাক! সে কি শৈবলিনীকে ভালবাসতো ? আমার বিশ্বাস বাসতো—কিন্তু সে যত সহজে তাকে পরিত্যাগ করলে, তাতে মনে হয় না, প্রতাপের পাঁজরার তলে স্বাভাবিক মানবহৃদয় ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ না মনে হবার কারণ কি ?

শরৎচন্দ্র ॥ তা হলে এক আধবার এক আধটা অস্ফুট বাক্যেও তার মর্মগ্রন্থিছেদের আর্তনাদ শোনা যেতো।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ বইখানি অনেক দিন আগে পড়েছিলে মনে হচ্ছে। নতুবা শেষ দিকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত প্রতাপের আক্ষেপ ভুলতে পারতে না। শৈবলিনীকে ভাল না বাসলে সে কি ওসব কথা অমন করে বলতো!

শরৎচন্দ্র ॥ এই কটি কথাই কি যথেষ্ট ?

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ যথেষ্ট নয়, তা জানি। তোমার নায়করা এত অল্পে সন্তুষ্ট হয় না—কি করে কেঁদে আত্মপ্রকাশ করতে হয় তারা জানে। তোমার ধারণা প্রেমের নিবাস চক্ষুতে, কখনো তার প্রকাশ কটাক্ষে, কখনো অশ্রুতে! তোমার নরেন, একটা বিলাত-ফেরত জগদ্দল ডাক্তার, তুমি যাকে বলো 'জিনিয়স্'—সে লোকটা অনাত্মীয় যুবতীর কাছে যে ভাবে তার দুরবস্থা প্রকাশ করেছে, স্বীকার করছি, তা লিখবার 'মরাল কারেজ' আমার ছিল না।

তোমার নায়করা আসলে কাপুরুষ, কাপুরুষের সব লক্ষণ তাদের মধ্যে আছে; তারা কাপুরুষ বলেই বাস্তবকে স্বীকার করে নেবার সাহস তাদের নেই, তারা শেষ মুহূর্তে বিবাহ করতে পারে না, আবার কাপুরুষ বলেই পরিত্যক্ত নায়িকাকে—হয়তো এখন সে পরস্ত্রী কিম্বা বিধবা—অন্ধকারে সুযোগমত পেলে দুটো প্রেমের কথা বলে নেবার লোভ ছাড়তে পারে না! তুমি একে বল মানব-হৃদয়ের প্রকাশ!

শরৎচন্দ্র ॥ যা স্বভাব, তাকে অস্বীকার করে লাভ কি ?

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ কিন্তু স্বভাবটা এমন অস্বাভাবিক হ'ল কেন, তারও তো সন্ধান নেওয়া দরকার। বাঙালী এই ক'বছরের মধ্যেই এমনি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে যে, মনের দুর্বলতাকে চেপে রাখবার মত সবলতাও তার নাই।

শরৎচন্দ্র ॥ কিন্তু তোমার আমলে হৃদয়াবেগ অল্প ছিল বলে তা প্রকাশ পেতো না—এমনও তো হতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ বিপরীতটাই বা সত্য নয় কেন? আমার সময়ে হৃদয়াবেগও যেমন প্রবল ছিল তাকে আয়ত্ত করে রাখ্‌তে পারে এমন ষ্টীম বয়লারেরও অভাব ছিল না। এখন হৃদয়াবেগ যে প্রবলতর তা নয়, ষ্টীম বয়লার দুর্বলতর হয়ে পড়েছে।

শরৎচন্দ্র ॥ এই ক'বছরে এমন কি পরিবর্তন ঘটেছে যাতে বয়লার দুর্বলতর হয়ে পড়্‌ল?

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ ইতিমধ্যে বাংলা দেশের মস্ত একটা পরিবর্তন ঘটেছে।

শরৎচন্দ্র ॥ কি রকম?

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ বাঙালীর চরিত্র থেকে ধৃতি বলে একটা পদার্থ চলে গিয়েছে। ধৃতি না বলে ধর্ম্ম কথাটাই মুখে আসছিল, কিন্তু তা'তে বুঝতে ভুল হ'ত।

শরৎচন্দ্র ॥ তোমার ধৃতিই যে বুঝেছি এমন কথা ভাবলে কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ ধর্ম আর ধৃতি একই বস্তু—তবে ধর্মকে আমরা religion এর বাংলা বলে ব্যবহার করে থাকি তাই ওতে অন্য অর্থের আভাস এসে পড়েছে। ধৃতি হচ্ছে মানুষের অস্তিত্বের মেরুদণ্ড—যা থাক্‌লে একটা মানুষ সংসারের ভিড়ের চাপে নিজের পথে চলতে পারে—আর যার অভাব হলে বাঙালীর মত চলে।

শরৎচন্দ্র ॥ বাঙালীর চালটা কি শুনি?

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ দায়িত্ববিমুখ, ঘর-পালানো লোকের চাল! দেখ্‌ছ না বাঙালী আজ অত্যন্ত অকারণেই রিয়ালিষ্ট হয়ে উঠেছে—তার কারণ কি জানো? সে আজ বাস্তবের সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়াতে ভয় পায়। বাস্তবের সম্মুখে দাঁড়াবে—এটা তার ইচ্ছা—কিন্তু সে শক্তি তার নেই—কাজেই ইচ্ছাটাকে সে তথ্য বলে ধ'রে নিয়ে একটা অবাস্তব বাস্তবতার সৃষ্টি করেছে। তুমি সেই অবাস্তব-বাস্তবতার মুখপাত্র।

শরৎচন্দ্র ॥ বাঙালীকে এত বড় অপবাদ দিলে, কিন্তু কোন প্রমাণ তো দিলে না।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ প্রমাণ প্রতিদিন সংবাদপত্রে বের হচ্ছে। বাংলাদেশের যে কোন দৈনিক খুললে এক সার বিজ্ঞাপন দেখবে—যাতে ঘর-

পালানো ছেলেকে ফিরে আসবার জন্য তাদের স্নেহাসক্ত আত্মীয়-স্বজনেরা অনুরোধ করছে। এমন ঘর-পালানো দশা আমাদের সময়ে বাঙালীর ছিল না। যে তথ্যবিমুখতা ব্যাধির কথা আমি বললাম—এটা তারই একটা মারাত্মক লক্ষণ। এটা আর কিছুই নয়—ধৃতিহীনতার চিহ্ন; আধুনিক বাঙালী লক্ষ্যহীন ভাবে খড়-কুটোর মত সংসারের স্রোতে ভেসে চলেছে; মেরুদণ্ডের দৃঢ়তা থাকলে এমন হয় না।

শরৎচন্দ্র ॥ কিন্তু তার সঙ্গে আমার যোগ কোথায়?

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ তুমি এই লক্ষ্যহীন, ঘর-পালানো, তথ্যবিমুখ বাঙালী চরিত্রকে অঙ্কন করেছ; বাঙালী পাঠক তোমার উপন্যাসের দর্পণে তার প্রতিবিম্ব দেখবামাত্র নিজেকে চিনতে পেরেছে—আর তোমাকে তার আত্মীয় বলে গ্রহণ করেছে; আত্মীয় না হলে কেউ কি আত্মীয়কে এমন ভাবে প্রকাশ করতে পারে? তোমার জন-প্রিয়তার মূল ওইখানে।

শরৎচন্দ্র ॥ আমি নিজে ঘর-পালানো ছিলাম বটে—তুমি কি সেই কথা বলছ?

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ তোমার ব্যক্তিগত কথা তুমিই জানো। কিন্তু তোমার সৃষ্ট মানুষগুলো দেখ না। সব লক্ষ্যহীন, ভেসে-যাওয়া খড়কুটো! কোন কিছুকে তারা আঁকড়ে ধরতে পারছে না। তোমার দেবদাস, সতীশ, শ্রীকান্ত, জীবানন্দ; এরা সব ঘর-পালানোর দল। এদের প্রত্যেকের জন্য সংবাদপত্রে ফিরে আস্‌বার বিজ্ঞাপন দেওয়া যেতো! তোমার শ্রীকান্ত চারটা পর্বের মধ্যে দিয়ে কোথায় যে ভেসে চলেছে তার ঠিক নেই। এরা হচ্ছে আধুনিক বাঙালী—আর আধুনিক বাঙালী হচ্চে এরাই! আধুনিক অভাজন বাঙালীর এমন চিত্র আর কেউ আঁকতে পারেনি—সে আমি স্বীকার করবো।

শরৎচন্দ্র ॥ বাঙালীর এমন লক্ষ্মীছাড়া দশা কেন হ'ল বলতে পার?

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ পারি বই কি! আশাভঙ্গ হলে এমন হয়—ভবিষ্যতে বিশ্বাস না করলে এমন হয়।

শরৎচন্দ্র ॥ আশাভঙ্গটা কোথায়?

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ ইংরিজি শিক্ষার প্রথম আমল থেকে বাঙালী একটা হাওয়ার কেল্লা গড়ে তুলছিল, ভেবেছিল এই কেল্লার গম্বুজ একদিন শেষে তার কামনার স্বর্গে গিয়ে ঠেকবে—কিন্তু বিংশ শতকের প্রথমেই দেখ্‌তে পেল, হায় হায়! তার কেল্লা নিজের ভারেই নিজে ধ্বসে পড়ল--সমস্ত দেশটাকে তার ভগ্নস্তূপের তলে চাপা দিয়ে। আর সেই আশা-ভঙ্গের নীচ থেকে চাপা-পড়া জাতির আর্তনাদ উঠছে।

উনবিংশ শতকের বাঙালী দেখেছিল—দু' পাতা ইংরিজি পড়লেই চাকুরী পাওয়া যায়; দেখেছিল, দু'কলম ইংরিজি লিখতে পারলেই বর্ক, মেকলে হওয়া যায়; খানিকটা ইংরিজি বক্তৃতা করতে পারলেই লোকে ডিমস্‌থিনিস্ বলে! তারা দেখেছিল, সদাগরী অফিসে ঢুকলে অঢেল টাকা! ভবিষ্যতের উপরে তাদের অগাধ বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—ভেবেছিল, এই পথই গিয়েছে চরিতার্থতার দিকে।

শরৎচন্দ্র ॥ তুমি কি বলতে চাও—ইংরিজি শিক্ষা ভ্রান্ত?

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ আমি বলতে চাই, বাঙালী ভ্রান্ত। পথ যত দীর্ঘই হোক তারও শেষ আছে। বাঙালী ভেবেছিল, ইংরিজি শিক্ষার কোন শেষ নেই। কিন্তু সে পথে চলতে চলতে সে দেখল—সম্মুখে পথ রুদ্ধ; যাকে এত দিন সে রাজপথ বলে মনে করেছিল—হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ল, তা কাণা গলি মাত্র!

শরৎচন্দ্র ॥ অতএব—

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ অতএব হয় নিষ্করুণ দেয়ালে মাথা ঠুকে মর—নয় ফিরে এস। আমি আমার সামান্য শক্তি অনুযায়ী সেই ফিরে আসবার কথা বলেছিলাম—হয়তো কেউ কেউ শুনেছিল। সংক্ষেপে এই হচ্ছে বাঙালীর আশাভঙ্গের ইতিহাস। তার পর থেকে এ পর্যন্ত চলছে তার নৈরাশ্যের যুগ—যে-নৈরাশ্যে তথ্যভীত বাঙালী ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। তুমি লিখেছ সেই বাঙালীর কথা!

শরৎচন্দ্র ॥ ওই ঘর-ছাড়ার দল কি নূতন পথের অনুসন্ধানে বের হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ হয়তো কেউ কেউ হয়েছে; কিন্তু তুমি তাদের সন্ধান পাওনি।

তারা আজও সংখ্যায় মুষ্টিমেয় ;—লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে অলক্ষ্যে তারা কাজ করে চলেছে। তুমি যাদের কথা জানো—তারাও ছুটেছে—নূতন পথের সন্ধানে নয় ; পুরাতন পথ পরিত্যাগ করে। তাদের এ গতি প্রগতি নয়—পলায়ন, তারা টোলখাওয়া বাঙালীর দল, বাংলার ওয়াটার্লু থেকে পলায়নপর, ভালমন্দজ্ঞান-হীন, হতাশ হতভাগ্যের দল। তোমার উপন্যাস বাঙালীর সেই পরাজয়ের ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী ব্যারিস্টারি পাশ করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৮৮ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া ১৮৯১ সনের ১২ই জুন লণ্ডন পরিত্যাগ করেন। এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একবার ঠিক এক মাস কাল লণ্ডনে অতিবাহিত করেন। তাঁহার লণ্ডন পৌঁছিবার তারিখ ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৯০, আর লণ্ডন পরিত্যাগের তারিখ উক্ত সনের ৯ই অক্টোবর। ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত এই দুই ভাবী মহাপুরুষ লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে কোন একটা সামাজিক উৎসব উপলক্ষ্যে ভারতীয়দের বৈঠকে তাঁহারা মিলিত ও পরিচিত হইতে পারিতেন। লেখক সেইরূপ কল্পনা করিয়া লইয়াছে। বলা বাহুল্য বর্তমান সংলাপটি সংসারের হইলে-হইতে-পারিত অধ্যায়ের অন্তর্গত, আগাগোড়াই কাল্পনিক। তখন গান্ধীজীর বয়স একুশ, রবীন্দ্রনাথের উনত্রিশ বছর।

গান্ধী ॥ মিস্টার টেগোর, আপনি তা হ'লে আগামীকাল দেশে রওনা হচ্ছেন ?

রবীন্দ্রনাথ ॥ হাঁ, আর সামান্য ক' ঘণ্টা পরেই।

গান্ধী ॥ আপনাকে আমার ঈর্ষা হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ॥ আমাকে ঈর্ষা ? এমন কথা প্রথম শুনলাম।

গান্ধী ॥ কেন ?

রবীন্দ্রনাথ ॥ এই ধরুন না কেন, আমি এক সময় ব্যারিস্টারি পড়তে এসেছিলাম, আইনের সরস্বতীর কাছে তাড়া খেয়ে ফিরে গিয়েছি।

গান্ধী ॥ কিন্তু কাব্যলক্ষ্মী আপনাকে আশীর্বাদ করেছেন। আমার একজন বাঙালী মিত্রের কাছে শুনেছি আপনি একজন প্রতিভাবান কবি।

রবীন্দ্রনাথ ॥ আমি বরঞ্চ আপনাকে ঈর্ষা করতে পারি, আপনার পড়া তো প্রায় শেষ হ'য়ে এলো।

গান্ধী ॥ হাঁ, আমি আশা করছি আগামী বছরের জুন মাসে দেশে রওনা হ'তে পারবো। দেশে ফিরবার জন্য আমার মন চঞ্চল হ'য়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ॥ সেই চঞ্চলতাতেই আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে এক মাস না যেতেই।

গান্ধী ॥ আপনার সঙ্গে আলাপ হ'বার পর থেকেই অনেকবার ভেবেছি আপনি এক মাসের জন্য কেন এলেন ?

রবীন্দ্রনাথ ॥ কেন এলাম ? সেও একরকম চঞ্চলতা।

গান্ধী ॥ কিসের ?

রবীন্দ্রনাথ ॥ দেশকে ভালো ক'রে দেখবার, বুঝবার।

গান্ধী ॥ তার জন্যে বিদেশে—

রবীন্দ্রনাথ ॥ দূরে আসা দরকার। সেই দূরে এসে আবার দেশে ফিরবার জন্য চঞ্চলতা। আমার ঐ একরকম। সমুদ্রের এপারে ওপারে মনটা দোলকের মতো দুলছে।

গান্ধী ॥ বাল্যকাল থেকে আমিও দেশকে বুঝবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বোধ করি সে জন্য আমার দেশে ফেরা আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথ ॥ আমার ঠিক উল্টো, দূরে না দাঁড়ালে পরিচিতকে আমার ঝাপসা লাগে, বিশ্বের দিগন্তে দাঁড়িয়ে আমি দেশকে দেখি।

গান্ধী ॥ দেশের আঙিনায় দাঁড়িয়ে হয়তো একদিন আমি বিশ্বকে বুঝতে পারবো।

রবীন্দ্রনাথ ॥ হয়তো প্রকৃতি-ভেদে দুরকম দৃষ্টিরই প্রয়োজন আছে। কিন্তু একথা সত্য যে দেশকে বুঝতে হবেই—

গান্ধী ॥ নইলে দেশের সেবা করবো কিভাবে ?

রবীন্দ্রনাথ ॥ সেবার আগে চাই সাধনা।

গান্ধী ॥ সেবাই কি সাধনা নয় ?

রবীন্দ্রনাথ ॥ হয়তো তাই, কেবল বুঝবার সুবিধার জন্তই দুটোকে আলাদা ক'রে নিয়ে থাকি। আমার বিশ্বাস কি জানেন মিস্টার গান্ধী, আমাদের মধ্যে গুরুর আবির্ভাব আসন্ন হ'য়ে উঠেছে।

গান্ধী ॥ স্বভাবতই একথায় বিশ্বাস করতে আমার মন চায়, দেশের অন্ধকার আজ অত্যন্ত গাঢ়।

রবীন্দ্রনাথ ॥ তাতেই তো বুঝতে পারা যায় সূর্যোদয়ের আর বিলম্ব হ'তে পারে না। নিজের কথা বলা যদি অশোভন মনে না করেন, তবে বলি যে কিছুদিন আগে শিখগুরু গোবিন্দের উপরে একটা কবিতা লিখেছি। *

গান্ধী ॥ শিখগুরু গোবিন্দের কথা আমি পড়েছি।

রবীন্দ্রনাথ ॥ তাতে বলেছি যে, দেশের মুক্তিপণ নিয়ে গুরু গোবিন্দ তপস্তায় ব'সেছেন। অকালে তাঁকে আসনচ্যুত না করবার জন্য শিষ্যদের অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধির একটি চিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন।

গান্ধী ॥ শুধু মর্মার্থ না বলে আপনি কবিতাটিই আবৃত্তি করুন।

রবীন্দ্রনাথ ॥ বাংলা কি আপনি বুঝবেন ?

গান্ধী ॥ শুনেছি বাংলা ভাষার সঙ্গে গুজরাটি ভাষার ঘনিষ্ঠ মিল আছে। আর অর্থ না বুঝি কবিতার সঙ্গীত ত বুঝতে পারবো। দেশের ভাষাগুলো শেখা দেশসেবারই অঙ্গ। বিভিন্ন ভাষা শিখতে সর্বদাই মনে আগ্রহ আছে, কোন দিন হয়তো বাংলা শিখতে চেষ্টা করবো, তখন আপনার কবিতার পুরো রস পাবো ; অবশ্য আজ সঙ্গীতের অধিক পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আপনি বলুন।

রবীন্দ্রনাথ ॥ গুরু গোবিন্দ শিষ্যদের বলছেন, যখন তিনি তপস্তায় সিদ্ধিলাভ ক'রে আহ্বান করবেন তখন সমস্ত দেশের চিত্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠবে—

---

* 'গুরুগোবিন্দ'—রচনাকাল ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮ সাল।

আয়, আয়, আয়,—ডাকিতেছি সবে
আসিতেছে সবে ছুটে।
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙে বাহিরায় সব পরিবার,
সুখসম্পদ মায়া মমতার
বন্ধন যায় টুটে॥

কি রকম ভাবে দেশের চিত্ত তাঁর দিকে ধাবিত হবে, না,

সিন্ধু মাঝারে মিশিছে যেমন
পঞ্চনদীর জল,—
আহ্বান শুনে কে কারে থামায়,
ভক্ত-হৃদয় মিলিছে আমায়,
পাঞ্জাব জুড়ি, উঠেছে জাগিয়া
উন্মাদ কোলাহল॥

তারপরে তিনি যত অগ্রসর হচ্ছেন বাধা বিভেদ সমস্ত ভেঙেচুরে সব এককার হয়ে যাচ্ছে—

যত আগে চলি, বেড়ে যায় লোক
ভ'রে যায় ঘাটবাট।
ভুলে' যায় সবে জাতি-অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে যায় মান অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাঠ॥

গান্ধী ॥ এই তো আমাদের গুরুর চিত্র। তিনিই হবেন আমাদের যথার্থ গুরু যিনি সার্থকভাবে দাবি করতে পারবেন, আমি যখন যাত্রা শুরু করবো সমস্ত হিন্দুস্থান উদ্বেলিত হয়ে উঠবে। কতবার যা অস্পষ্টভাবে চোখে পড়েছে এই তো সেই চিত্র।

রবীন্দ্রনাথ ॥ আমাদের যিনি যথার্থ গুরু তিনি একাধারে হবেন সাধক এবং শাসক—

গান্ধী ॥ এবং কবি।

রবীন্দ্রনাথ ॥ ঠিক বলেছেন, এই তিনে মিলে হচ্ছে না বলেই বারংবার ইতিহাসে ছন্দপতন ঘটছে।

গান্ধী ॥ সেই ছন্দপতনেরই আর একটি নাম হিংসা।

রবীন্দ্রনাথ ॥ তারপরে গুরু গোবিন্দ বলছেন, এখনো সময় হয়নি, এখনো নীরব সাধনার জন্য নির্জনতার আবশ্যক। তিনি বলছেন—

এখনো বিহার কল্প-জগতে,
অরণ্য রাজধানী।
এখনো কেবল নীরব ভাবনা,
কর্মবিহীন বিজন সাধনা,
দিব্যনিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্মবাণী ॥

এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ,
আরো কতদিন হবে,
চারিদিক হতে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি' আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে ॥

গান্ধী ॥ কবিবর আপনার এই কথাটি আমি বুঝতে পারলাম না। গুরু গোবিন্দ অবশ্য আপনারই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন, জন-সংযোগের সাধনা তো নির্জনে হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ॥ কেন পারে না? সমস্ত সাধকই কি সাধনার পর্ব নির্জনতায় অতিবাহিত করেননি?

গান্ধী ॥ আমরা তো এইমাত্র বললাম, এবারে আমাদের যিনি গুরু হবেন একাধারে তিনি হবেন সাধক, শাসক ও কবি। এহেন মহা-পুরুষের সাধনক্ষেত্র জনসমাজ থেকে দূরে নয়, একেবারে জনসঙ্ঘের কেন্দ্রে, তাঁর সাধনার নাম যে সেবা।

রবীন্দ্রনাথ ॥ কিন্তু সেবা শিক্ষারও যে প্রয়োজন আছে।

গান্ধী ॥ সেবার শিক্ষা সেবা করা, তার জন্যে মানুষের সংসর্গের প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ ॥ একথা আপনার মানি। কিন্তু সাধক পূর্ণতা লাভ করবেন কি উপায়ে? সেবা মানেই তো পূর্ণতা সাধন।

গান্ধী ॥ অতি সত্য। কিন্তু সাধকের পূর্ণতার উপায় তো আপনি নির্দেশ ক'রে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ॥ কিন্তু সেজন্যও কি নির্জনতা আবশ্যক নয়?

গান্ধী ॥ না, সাধকের অন্তরে থাকবে নির্জনতা বাহিরে জনসংযোগ, সাধকের বিচিত্র অবস্থান।

রবীন্দ্রনাথ ॥ আপনি বলতে চান এইভাবে অন্তর ও বাহির পরস্পরের পরি-পূরকভাবে সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।

গান্ধী ॥ আপনি ঠিক বুঝেছেন। এবারে যিনি আমাদের গুরু হবেন তিনি শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণের মতো অতিমানব নন, তাঁর জন্মমুহূর্তে অযোধ্যায় বা মথুরায় দুন্দুভিনিনাদ হবে না, তাঁর অলৌকিক বিভূতি পৃথিবীর চক্ষুকে চকিত ক'রে দেবে না, কেউ জানতেও পাবে না কখন তিনি এলেন, কোথা থেকে তিনি এলেন।

রবীন্দ্রনাথ ॥ তিনি কি নরনারায়ণ নন?

গান্ধী ॥ নারায়ণ এবার নরজন্ম গ্রহণ করবেন না, নরই সাধনার বলে নারায়ণত্ব অর্জন করবে। সেই নর যত সাধারণ হবে, যত নীচ-কুলোদ্ভব হবে তার মহিমা যে তত উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে। তাই তো আমি মাটির দিকে চেয়ে আছি। আমাদের গুরু এমন সাধারণ মানুষ হবেন, এমন সর্ববিভূতিতে নিরলঙ্কার হবেন যে, হিন্দুস্থানের দীনতম চাষীর বা ভাঙ্গীর সঙ্গে তাঁর প্রভেদ বুঝতে পারা যাবে না। তবে তো তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণ আর জাঠ এক হ'য়ে মিলিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ ॥ সেকথা অবশ্য আমিও বলেছি—

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ॥

গান্ধী ॥ সুন্দর। যিনি সকলকে ডাক দেবেন তাঁকে সকলের চেয়ে নিচু

হ'য়ে আরম্ভ করতে হবে। আমি অনেক সময়ে ভাবি আমাদের ভাবী গুরু ঠিক এই মুহূর্তে কোন দীন ভাঙ্গী পল্লীতে আবর্জনা পরিষ্কার করছেন।

রবীন্দ্রনাথ॥ আবর্জনা পরিষ্কার করাই যে গুরুর কাজ। কিন্তু বিধাতার বিধান অনেক সময়ে অভাবিত পথে আসে। হয়তো ভারতের ভাবী গুরু বিদেশী কেতায় শিক্ষিত হ'য়ে উঠছে, বিদেশী কায়দায় অভ্যস্ত হ'য়ে উঠে জীবনের প্রথম পর্ব যাপন করছে।

গান্ধী ॥ কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু তাঁকে একে একে ছাড়তে হবে সেই শিক্ষা, সেই আচরণ, তবে তো তাঁর সত্যমূর্তি উদ্ঘাটিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ॥ যেমন একে একে পাঁপড়িগুলো খসিয়ে দিয়ে পদ্মের মধুকোষটি অনাবৃত হয়।

গান্ধী ॥ হাঁ ঠিক তেমনি। কবিবর, আমি সেই গুরুর জন্ম অপেক্ষা ক'রে আছি যিনি হিমালয়ের নিরঞ্জন তুষারতূপ নন, অপার মহাম্বুধি নন, যিনি গ্রামপ্রান্তের সামান্য স্রোতস্বিনী, জনপদের আবর্জনাকে যেমন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তেমনি আবার জনপদের তৃষ্ণাকেও নিবারিত করছে সেই নদী; যে নদী মহাম্বুধির মত ভয়াল নয়, তুষার কিরীটের মতো বিস্ময়ক নয়; যে নদী জল দান ক'রে, সঙ্গ দান করে, ক্লান্তি হরণ করে, অন্তহীন কলগানের দ্বারা আমাদের নিদ্রা ও জাগরণকে মধুময় ক'রে তোলে, আমি সেই গুরুর অপেক্ষায় আছি।

রবীন্দ্রনাথ॥ আর আমি আছি সেই গুরুর অপেক্ষায় মহাপ্রাবৃটের মেঘমালার মতো যার উত্তরীয়চ্ছায়ায় দেখতে দেখতে বিশ্বের আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যাবে; যাঁর ধ্যানগম্ভীর মন্ত্রোচ্চার আমাদের শিরায় মজ্জায় আমাদের সহস্র যুগের আত্মবিস্মরণকে মুহুর্মুহু ধিক্কৃত করতে থাকবে; যাঁর বাণীর বিদ্যুৎ দগ্ধ করবে সব জড়তা, যাঁর আশীর্বাদ বজ্রের মতো বিদ্ধ করবে আমাদের পাপের মূল, তারপরে তৃষ্ণার মরুতে নামবে বিশ্বব্যাপী শান্তিবারির অমিত বর্ষণ, আমি আছি সেই গুরুর অপেক্ষায়।

গান্ধী ॥ আপনার কথাও সত্য। ঐ বর্ষণ না পেলে আমার নদী ভরবে কোন্ জলে ?

রবীন্দ্রনাথ ॥ আমি চাই গুরু যিনি বিশ্বের, নদী তো তৎস্থানিক মাত্র।

গান্ধী ॥ তৎস্থানকে বাদ দিয়ে বিশ্ব থাকে কি ?

রবীন্দ্রনাথ ॥ তৎস্থান তো তথ্য, তাতে সত্য কোথায় ?

গান্ধী ॥ তথ্যের গুচ্ছের নামই যে সত্য।

রবীন্দ্রনাথ ॥ সত্য কি নির্বিশেষ নয় ?

গান্ধী ॥ নির্বিশেষ সত্য যদি বা থাকে তা মানুষের অধিগম্য নয়। মানুষের মধ্যেই সত্যকে আবিষ্কার করতে হবে, এই তো এ যুগের আহ্বান।

রবীন্দ্রনাথ ॥ একথা আপনার মানি। যিনি নির্বিশেষ তিনি তৎস্থান ও তৎকালের বাউলের আলখাল্লা পরে আসরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ঐ সাজের দ্বারা তিনি বিশেষ, আবার নেপথ্যে গিয়ে যখন তিনি আলখাল্লা খুলে ফেলেছেন তখন তিনি নির্বিশেষ।

গান্ধী ॥ কবি না হলে এমন সুন্দর করে বলতে পারে কে ? কিন্তু নেপথ্য যে মানুষের অধিগম্যতার বাইরে।

রবীন্দ্রনাথ ॥ তাই বলেই যে নেই এমন নয়।

গান্ধী ॥ অবশ্যই আছে, যেমন আছে হিমালয়ের তুষার-স্তূপ, আর তা আছে বলেই গ্রামপ্রান্তের নদীটি সম্ভব। জ্ঞানস্বরূপ আছেন বলেই কর্ম সম্ভব। কর্মপ্রবাহে মানবসমাজ ভাসছে, তাই কর্মের দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করলেই সমগ্রভাবে মানবের কল্যাণ সম্ভব। কর্মই তো সেবা, আমার গুরু সেবক।

রবীন্দ্রনাথ ॥ আমার গুরু ভাবুক। হয়তো কবির পন্থা স্বতন্ত্র।

গান্ধী ॥ নইলে যে সংসার শুকিয়ে উঠতো। জীবন যখন শুকিয়ে যায়, তখন কবিরা গীতসুধারস সিঞ্চন করেন, ভগবানের করুণা তো কবিদের বীণাকে অবলম্বন করেই অবতীর্ণ হয়।

রবীন্দ্রনাথ ॥ মিস্টার গান্ধী, আপনার ব্যারিস্টারি পাশের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মাচ্ছে। কবির এত প্রশংসা—

গান্ধী ॥ পরীক্ষার ফলাফল যেমনি হোক, ব্যবসায় আমার দ্বারা হবে কিনা সন্দেহ !

রবীন্দ্রনাথ ॥ কেন ?

গান্ধী ॥ আমি খুব লাজুক আর মুখচোরা, আপনাকে একা পেয়ে এত কথা বললাম, দশজনের সম্মুখে কথা বলতে গেলে মাথা ঘুরে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ॥ তবে আইন পড়তে এলেন কেন ?

গান্ধী ॥ জলে নেমে বুঝলাম যে সাঁতার জানিনে।

রবীন্দ্রনাথ ॥ কিন্তু জলে নামা ছাড়া সাঁতার শিখিবার তো উপায় নেই।

গান্ধী ॥ কিন্তু সাঁতার শিখতেই হবে তার কোন্ মানে আছে ?

রবীন্দ্রনাথ ॥ আইনের ব্যবসায়ে জনসেবা কি সম্ভব নয় ?

গান্ধী ॥ যদি সম্ভব হয়, তবেই আমার দ্বারা আইন ব্যবসায় সম্ভব হবে।

রবীন্দ্রনাথ ॥ অসম্ভব কেন ? প্রাচীনকালে গুরুরা তো দক্ষিণা নিতেন। তাঁরা তো সমাজের সেবক বই আর কিছু ছিলেন না।

গান্ধী ॥ সে কথা সত্য। ব্যবসায়কে এবং চাকুরিকে সেবারূপে দেখা সম্ভব যদি সে ভাব মনে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ॥ আপনার মন তো আপনার হাতে।

গান্ধী ॥ সত্যি কি তাই ? এখনো সম্পূর্ণরূপে নয়। তাছাড়া শুধু মন অনুকূল হ'লে তো চলবে না, সমাজও অনুকূল হওয়া আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথ ॥ সাধনা থাকলে কালক্রমে হবে। ঐ যে-দেয়ালের ঘড়ির কাঁটা দুটো ছাড়াছাড়ি রয়েছে, এক সময়ে ওরা মিলবে। তখনি তো বাজবে শুভক্ষণের ঘণ্টা।

গান্ধী ॥ ঘড়ির উপমা দিয়ে আপনি আমাকে সচেতন ক'রে দিয়েছেন। অনেক রাত করে দিলাম, কালকে আপনার যাত্রা করবার দিন, আমাকে মাপ করবেন।

রবীন্দ্রনাথ ॥ সে কি কথা আমার মনে যে-সব ভাব ছিল আপনার মনে তার সমর্থন পেলাম—এ কি আমার অল্প সৌভাগ্য। আশা করছি আবার কখনো সাক্ষাৎ হবে।

গান্ধী ॥ হ'তেই হবে, পাঁচ বছর পরেই হোক বা পঁচিশ বছর পরেই হোক। দু'জনেই আমরা একই বিধাতার হাতে রয়েছি।

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ

মহাকবি কালিদাস ও মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিম্নোক্ত সংলাপ হইয়াছিল কল্পনা করা হইয়াছে।

কালিদাস॥ কবি, তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই।

রবীন্দ্রনাথ॥ আমাকে লজ্জা দিয়ো না মহাকবি। আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা! কবিমাত্রেই মানুষের কৃতজ্ঞতার পাত্র। তোমার মতো মহাকবি মহৎ কৃতজ্ঞতার পাত্র।

কালিদাস॥ সেই তো দুঃখ কবি। মানুষে আমাকে মহাকবি বলে স্বীকার করলো কই?

রবীন্দ্রনাথ॥ স্বীকার করলো না! ভারতের মহাকবি বলতে তিনজন, বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস।

কালিদাস॥ মহাকবি কালিদাস! মহাকবিই বটে নইলে আর কার নামে জীবন কথা বলে কতকগুলো উদ্ভট অশিষ্ট অলীক কাহিনী প্রচার সম্ভব। শোননি?

রবীন্দ্রনাথ॥ শুনেছি বই কি। আদি কবি বাল্মীকির নামেও তো রত্নাকর দস্যু অপবাদ চাপিয়েছে লোকে।

কালিদাস॥ তিনি ঋষি তাঁর প্রাণে অনেক সহ্য হয়। কিন্তু আমি যে লৌকিক কবি মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ॥ ও গল্পগুলো লৌকিক কবির প্রতি লোক সম্মান।

কালিদাস॥ সম্মান। ঐ অপমানকর কাহিনীগুলো।

রবীন্দ্রনাথ॥ তোমার কাছে সেই রকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু আবার বলছি ওগুলোর সৃষ্টি তোমাকে অসম্মান করবার উদ্দেশ্যে নয়।

কালিদাস॥ তবে?

রবীন্দ্রনাথ। তোমাকে সম্মানিত করবার আশাতেই।

কালিদাস॥ ঐ স্থলে রূঢ় গ্রাম্য গুজবগুলো?

রবীন্দ্রনাথ॥ গুপ্ত সম্রাট্‌গণ যখন রাজ্য পরিদর্শনে বের হতেন তখন জনপদের শিল্পিগণ তাঁকে যে গ্রাম্য বসন উপঢৌকন দিতো তা কি রাজ অঙ্গে স্পর্শকটু লাগতো না?

কালিদাস ॥ অবশ্যই লাগতো।

রবীন্দ্রনাথ ॥ তবু তো সম্রাট্‌গণ সাদরে তা গ্রহণ করতেন।

কালিদাস ॥ অবশ্যই করতেন।

রবীন্দ্রনাথ ॥ সামান্য প্রজার অকিঞ্চিৎকর উপহারের মধ্যে তাঁরা দেখতে পেতেন তার সরল হৃদয়ের সম্মান প্রদর্শনের ইচ্ছা।

কালিদাস ॥ নিশ্চয়। কতবার বিশ্রম্ভালাপের সময়ে মহারাজকুমারও ঠিক এই কথাই আমাদের বলেছেন। কিন্তু তার সঙ্গে কাহিনী-গুলোর কি সম্বন্ধ ?

রবীন্দ্রনাথ ॥ তুমি নিতান্ত বিচলিত হ'য়ে পড়েছ বলেই বুঝতে পারছ না নইলে তোমার মতো হৃদয়বেত্তার না বোঝবার কথা নয়।

কালিদাস ॥ ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দাও।

রবীন্দ্রনাথ ॥ লোকে জানে কবিত্ব এমন একটা দুর্লভ দৈবগুণ যা চেষ্টার দ্বারা আয়ত্ত করবার নয়—ও বস্তু হঠাৎ নামে আকাশ থেকে বজ্রাগ্নি শিখায়।

কালিদাস ॥ সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ?

রবীন্দ্রনাথ ॥ তোমার কবিত্ব আকাশসম্ভব বৈদ্যুৎ, বাণীর কিরীট-স্খলিত শতদলের পরাগ, ও বস্তু নয় দিঙনাগের প্রভূত শ্রম জলপুষ্ট জ্ঞান-বিটপী ওর প্রকৃতিই স্বতন্ত্র এই কথাটিই বোঝাতে চেয়েছে লোকে ঐ গল্পগুলো তৈরি করে।

কালিদাস ॥ তাই ব'লে মূর্খ বানাবে ?

রবীন্দ্রনাথ ॥ পাত্র পূর্ণ করবার আগে যে শূন্য ক'রে নিতে হয়।

কালিদাস ॥ যে শাখায় বসেছি সেটাকেই করছি ছেদন।

রবীন্দ্রনাথ ॥ কবি যে সাধক! সাধক কি সংসার শাখা ছেদন করেন না ?

কালিদাস ॥ মূর্খের হ'ল পত্নীর কাছে লাঞ্ছনা!

রবীন্দ্রনাথ ॥ পাত্নীব্রত্যকে জীবনের চরণ নির্ভর ব'লে যিনি দেখিয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে এ অপবাদের সার্থকতা কি বুঝতে পারলে না ?

কালিদাস ॥ বুঝিয়ে দাও।

রবীন্দ্রনাথ ॥ এ-ও সেই পাত্র শূন্য ক'রে ফেলে পূর্ণ করবার চেষ্টা। তোমার কাব্যে পত্নীকে টেনে নিয়ে গিয়েছে আদর্শের চরমে—তাই ঐ

গল্পটিতে পত্নীকে টেনে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে বাস্তবের চরমে। শূন্য পাত্র যে কত শূন্য তাই হ'য়েছে দেখানো। পূর্ণ পাত্র যে কত পূর্ণ হতে পারে দেখেছে তারা তোমার কাব্যে। খেদ ক'রো না কবি এই জন্যেই ক্রৌঞ্চবিরহী কবিকে বানিয়েছে লোকে পাষাণ হৃদয় দস্যু। করুণার উৎস যদি পাষাণভেদ করতে না পারে তবে তাঁর মাহাত্ম্য কোথায়? রত্নাকর দস্যুর চালচিত্রের পটে উজ্জ্বলতর হ'য়ে ফুটে উঠেছেন করুণার বাণী মূর্তি, যেমন অজ্ঞানের কালো পটখানার উপরে অধিকতর দীপ্যমান হ'য়েছে তোমার শুক্রতারা রূপিনী প্রতিভা।

কালিদাস॥ হয় তো তোমার কথাই সত্য। তোমার নামেও কিছু বানিয়েছে নাকি?

রবীন্দ্রনাথ॥ এখনও না বানিয়ে থাকলে কালে বানাবে, হয়তো ইতিমধ্যে লোক রসনা সরস হ'য়ে উঠেছে।

কালিদাস॥ ভালই হবে, অপবাদের ঘাটে সতীর্থরূপে পাবো ভারতের চতুর্থ মহাকবিকে।

রবীন্দ্রনাথ॥ কিন্তু তোমার দুঃখের কারণ তো এখনো শুনতে পেলাম না।

কালিদাস॥ তুমি আমার সেই দুঃখ দূর ক'রে দিয়েছ।

রবীন্দ্রনাথ॥ কিসের দুঃখ?

কালিদাস॥ আত্মগ্লানির দুঃখ।

রবীন্দ্রনাথ॥ আত্মগ্লানি! তোমার?

কালিদাস॥ আত্মগ্লানি এবং আমার—

রবীন্দ্রনাথ॥ আর একটু খুলে বলো।

কালিদাস॥ সেই ভালো। এ পর্যন্ত লোকে আমাকে সম্ভোগের কবি, মিলন মাধুর্যের কবি, শৃঙ্গাররসের কবিমাত্র বলে স্বীকার করেছে, তার বেশি আমার কোন দাবী স্বীকার করেনি। একি মহাকবির লক্ষণ?

রবীন্দ্রনাথ॥ নিশ্চয়ই নয়।

কালিদাস॥ মহাকবির দৃষ্টি জীবনের ক্ষেত্রবিশেষে মাত্র আবদ্ধ নয়। মহাকবির মহদ্দৃষ্টি—সে দৃষ্টি আর জীবন সমব্যাপক।

রবীন্দ্রনাথ ॥ আমি তো ব্যাখ্যা করেছি তোমার সেই জীবনদৃষ্টির, বোঝাতে চেষ্টা করেছি তোমার জীবনতত্ত্বকে।

কালিদাস ॥ সেই জন্যই তো কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই তোমার কাছে। সহৃদয় মল্লিনাথ অবশ্য সরস টীকা করেছেন কিন্তু তিনি তো কবি নন, আলঙ্কারিকমাত্র। তিনি আমার কাব্যের নৈসর্গিক সৌন্দর্য বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার বেশী দাবী কি আমার নেই? তুমি পাঠকের চোখ টেনে নিয়েছ আমার কাব্যের অন্তর্লোকে।

রবীন্দ্রনাথ ॥ সে চেষ্টা করেছি বটে!

কালিদাস ॥ চেষ্টা! সহৃদয় ব্যাখ্যার এমন সাফল্য কদাচিৎ দেখা যায়। দেড় হাজার বছর অপেক্ষা করেছিলাম তোমার মতো প্রতিভাবান্ সুহৃদের আশায়।

রবীন্দ্রনাথ ॥ মহৎ সৃষ্টির অপেক্ষা।

কালিদাস ॥ তা বটে। বনস্পতির তাড়া নেই, যত ত্বরা ওষধির।

রবীন্দ্রনাথ ॥ মহাকবি, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার কারণ কত গুরুতর তা কেবল আমি জানি। আমি ভারতবর্ষকে বুঝেছি তোমার কাব্য প'ড়ে।

কালিদাস ॥ এ যে নূতন কথা।

রবীন্দ্রনাথ ॥ নূতন হ'তে পারে কিন্তু অলীক নয়।

কালিদাস ॥ কেমন?

রবীন্দ্রনাথ ॥ ভারতবর্ষকে বুঝবার আশায় কত মহাজনের দ্বারস্থ না হ'য়েছি। পড়েছি ইতিহাস, ইতিহাস কেবল তথ্য পরিবেষণ করে, সত্যে পারে না পৌঁছতে। গিয়েছি বাস্তবের দরজায়, সেখানে শুধু অদ্যতনের স্তূপ, নেই চিরন্তনের সংবাদ। উপনিষদের অরণ্য-ছায়ায় পেলাম বটে আভাস, কিন্তু সে তো কেবল তত্ত্ব, জীবনের সত্য আছে বটে কিন্তু জীবনের সমগ্রতা কোথায়, কোথায় রক্ত-মাংসে সঞ্জীবিত মানুষ! এমন সময়ে দেখলাম তোমার কাব্যকে নূতন দৃষ্টিতে, যা খুঁজে মরছিলাম পেলাম।

কালিদাস ॥ কি পেলে শুনি, নিজের সত্য পরের মুখে অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ॥ প্রথমেই ঋতুসংহারের কথাই ধরা যাক।

কালিদাস ॥ ও কাব্যখানা নিতান্ত কৈশোরের রচনা, তখন কেবল কাব্যের নিজস্ব রীতিটাকে পেয়েছি, তখনো পাইনি জীবনের নীতিকে, ওতে সৌন্দর্য আছে সত্য নেই। সত্যে সৌন্দর্যে মিলে ঘটেনি ওর দ্বিজত্ব লাভ।

রবীন্দ্রনাথ ॥ হাঁ অনেকটা আমার সন্ধ্যা সঙ্গীতের মতো। কিন্তু তোমার ঐ অপরিণত কাব্যে দেখলাম প্রকৃতিকে জড়পদার্থ মাত্র মনে করা হয়নি, রঙ্গমঞ্চের মনোরম যবনিকামাত্র মনে করা হয়নি, তাকে প্রাণবন্ত ক'রে মানুষের দোসর ক'রে তোলা হ'য়েছে। মানুষের জীবনে যে ঋতুচক্র নিত্য আবর্তিত হচ্ছে তারই বহিঃপ্রকাশ দেখেছ তুমি নিসর্গের ঋতু মেখলায়, নিসর্গের সত্য মানবজীবনের সত্য হ'য়ে উঠেছে।

কালিদাস ॥ কবি ছাড়া এমন সহৃদয় দ্রষ্টা আর কোথায় পাবো ?

রবীন্দ্রনাথ ॥ তারপরে নূতন দৃষ্টিতে পড়লাম। তোমার মালবিকা, বিক্রম, কুমার, শকুন্তলা, মেঘদূত, রঘু। দেখলাম সমস্ত কাব্যের তলায় বইছে একই স্রোতের রেখা, বুঝলাম তোমার জীবনতত্ত্ব।

কালিদাস ॥ কিভাবে প্রতিভাত হ'য়েছে তোমার জীবনে শুনি ?

রবীন্দ্রনাথ ॥ সমস্ত কাব্যে তুমি একটি সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছ— মানুষের ঘরে মানবশিশুর আবির্ভাব।

কালিদাস ॥ যখন লিখছিলাম বুঝিনি পরে বুঝেছি।

রবীন্দ্রনাথ ॥ চলার সময়ে পায়ের দিকে দৃষ্টি থাকে, চলার অবসানেই কেবল পথের সাকুল্য বোধ জন্মায়।

কালিদাস ॥ মালবিকাতে তত্ত্ব ফোটাবার সুযোগ পাইনি। ওটা লিখতে হয়েছিল মহারাজার অনুরোধে একটা উৎসব উপলক্ষ্যে। তখনো রাজসভায় আসন হয়নি সুপ্রতিষ্ঠিত, চমৎকার সৃষ্টির দিকেই ছিল মনোযোগ। ও কাব্যখানা অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে লেখা।

রবীন্দ্রনাথ ॥ কিন্তু তাই বলে সৌন্দর্যের প্লাবন কিছু কম নয়।

কালিদাস ॥ প্লাবন বলেই তো ফোটেনি ওতে শতদল। কুমার আর শকুন্তলা

হচ্ছে সৌন্দর্যের মানস সরোবর, ফুটেছে তাতে সত্যের শ্বেতপদ্ম। কিন্তু তোমার কথাও ভুল নয়, মালবিকা, বিক্রম, কুমার ও শকুন্তলা একই সূত্রের বিন্যাস। ধাপে ধাপে পরীক্ষা ক'রে চলতে হ'য়েছে, পথের নিশানা ব'লে ছিল না কিছু।

রবীন্দ্রনাথ ॥ সে কথা সত্য। কাব্যের পরিণাম হয় বিবাহে নয় মৃত্যুতে। তোমার কাব্য অনুসরণ করেনি সে চিরচিহ্নিত পথ—তোমার কাব্যের পরিণাম শিশুর জন্মগ্রহণে।

কালিদাস ॥ ঠিক তাই। মালবিকাতে বললাম মানবকন্যার কথা কিন্তু এলো না শিশু। বিক্রমে বল্‌লাম শাপভ্রষ্ট অপ্সরীর কথা, স্বর্গের অধিবাসিনী অথচ দেবতা নয়। এলো শিশু। কিন্তু মন বল্‌ল—না, না, এ ঠিক হ'ল না। আমি চাই মানুষের ঘরে মানবপুত্র। আবার পরীক্ষা শুরু হ'ল কুমারে। এবারে নিসর্গে আর দেবতায় গাঁটছড়া বাঁধা হ'ল, মহাদেবের সঙ্গে হিমালয়কন্যা উমার বিবাহ। কুমার চেয়েছিলাম পেলাম কিন্তু পেলাম না মানবকুমার। পরীক্ষার সাফল্য ঘটলো শকুন্তলায় এবারে মানুষের ঘরে পূর্ণ মানবের ঘটলো অভ্যুদয়, এক সঙ্গে বাঁধা পড়লো স্বর্গ-মর্ত্য-অন্তরীক্ষ, তপোবন আর জনপদ, বিশ্বামিত্রের শান্ত তপস্যার সমুদ্রে সঙ্গতা অপ্সরী মেনকার উদ্দাম যৌবন-তরঙ্গিণী মুখে দেখা দিল কোমল অকলঙ্ক শকুন্তলারূপী কন্যাভূমি। এতদিন যা সন্ধান করছিলাম পেলাম।

রবীন্দ্রনাথ ॥ মহাকবির যোগ্য ব্যাখ্যা।

কালিদাস ॥ তারপর নূতন আর কিছু বলবার ছিল না, রঘুতে নিজের পুনরাবর্তন করেছি। রঘু হচ্ছে আমার কাব্যজীবনের যোগফল —অঙ্কপাত আগেই হ'য়ে গিয়েছিল ওতে কেবল তার সমষ্টিকরণ।

রবীন্দ্রনাথ ॥ কিন্তু মেঘদূত ?

কালিদাস ॥ হাঁ মেঘদূত ! ওতে একবার নিজের কল্পনাকে দিয়েছিলাম ছুটি, পাঠশালাপলাতকার আনন্দে ফিরেছে সে যেথানে সেখানে নূতন নূতন পতঙ্গের পাখার ইঙ্গিত অনুসরণ ক'রে।

রবীন্দ্রনাথ ॥ কিন্তু সে-সব ইঙ্গিতও তো আকস্মিক নয়। রামগিরি আর অলকা, যা হ'য়েছে আর যা হওয়া উচিত, মর্ত্যের ক্ষণস্থায়ী সুখদুঃখ আর চিরানন্দ, এ সমস্ত কি বাঁধা পড়েনি মেঘদূতের বিদ্যুতের রাখীতে।

কালিদাস ॥ এখন বুঝতে পারছি বাঁধা পড়েছে কিন্তু কখনো বিচার করতে মন সরেনি। জলের পরিমাণ চলে কিন্তু ফেনার? মেঘদূত আমার কাব্যপ্রবাহের ফেনপুঞ্জ।

রবীন্দ্রনাথ ॥ ফেনপুঞ্জের মূল্য নির্ধারণ হয়তো মুদ্রায় সম্ভব নয় কিন্তু তাই বলে একেবারে বিচারের বহির্ভূত নয়। উত্তরমেঘ আর সূর্যবংশের আদর্শ নৃপতিগণের রামরাজত্ব কি এক সুরে বাঁধা নয়? দুটি স্থানেই তুমি অঙ্কিত করেছ utopia বা আদর্শ লোকের চিত্র। যক্ষের অলকা আর সূর্যবংশের অযোধ্যা একই চিত্রের এপিঠ-ওপিঠ। তাই নয় কি?

কালিদাস ॥ এমন ক'রে ভাবিনি বিশেষ মেঘদূতের বেলায়। আগেই বলেছি মেঘদূতে আমার ছুটি-পাওয়া কল্পনা যথেচ্ছ বিহার করেছে। পতঙ্গের পাখা অনুসরণ ক'রে সে যদি ফুলের বনে গিয়ে থাকে তবে অন্যায় হয়নি। তবে রঘুবংশের বেলায় যা বলেছ ভুল নয়। রঘুবংশের স্বর্ণপাত্রে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত। আদর্শ নৃপতি, আদর্শ রাজত্ব অঙ্কন করবার ইচ্ছা নিয়ে নেমেছিলাম ঐ কাব্য রচনায়। দেখাতে চেষ্টা করেছি কোন্ কোন্ গুণে একটা রাজবংশ সার্থকতার শিখরে ওঠে, কোন্ কোন্ গুণে ক্রমে সেই রাজবংশের পতন হয়। কাজটা যে খুব কঠিন ছিল এমন নয়—স্বচক্ষে দেখেছি শ্রেষ্ঠ গুপ্ত সম্রাট্‌গণকে আবার স্বচক্ষে দেখতে হ'য়েছে তাদের অপদার্থ উত্তরপুরুষগণকে যখন উন্নতিশিখর থেকে গুপ্তবংশের রথ দ্রুত নেমে যাচ্ছিল অধঃপাতের দিকে। রঘুবংশ কাব্য গুপ্তবংশের কাহিনী।

রবীন্দ্রনাথ ॥ আমিও সেই দৃষ্টিতেই দেখেছি তোমার কাব্যখানা।

কালিদাস ॥ তাইতো তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানালাম, বল্‌লাম যে তুমি আমাকে সম্ভোগের কবি অপবাদ থেকে উন্নীত করেছ তত্ত্বদর্শী মহাকবি পদবীতে।

রবীন্দ্রনাথ ॥ কিন্তু শুধু রঘুতে নয় সমস্ত কাব্যে আছে আদর্শ রাজ চরিত্র চিত্রন চেষ্টা।

কালিদাস ॥ আছে বই কি! অগ্নিমিত্র চরিত্র পরের মুখ চেয়ে অঙ্কিত। পুরুরবা মহৎ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রেমের কৈবল্যে আদর্শ নৃপচরিত্রের কোঠায় পৌছতে পারলো না। তারপরে অঙ্কিত করলাম মহাদেব চরিত্র। তিনি আদর্শ পুরুষ হতে পারেন কিন্তু আদর্শ মানুষ নন, তিনি যে দেবতা। তারপরে এল দুষ্মন্ত! হাঁ দোষে-গুণে প্রেমে ত্যাগে বীর্যে করুণায় আমার আদর্শের কাছাকাছি পৌছেছেন। তারপরে এঁকে গিয়েছি দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ, রামচন্দ্র প্রভৃতি। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি রঘুবংশের শেষ দিকে কাব্যের প্রতি আমার আর তেমন মনোযোগ ছিল না, অনেকস্থলেই লেখনী চলেছে প্রতিভা চলেনি, আবার অনেকস্থলে মনুসংহিতাখানা সম্মুখে খুলে ধরে লিখে গিয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ ॥ এমন শিথিলতার হেতু?

কালিদাস ॥ বার্ধক্য আর গুপ্তবংশের দুরবস্থা মনকে পীড়িত করছিল। তা ছাড়া রামচন্দ্রের ও সীতাব অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনেই প্রকৃতপক্ষে কাব্যের সমাপ্তি ঘটে গিয়েছিল। বাকিটুকু কেবল নিয়মরক্ষা মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ ॥ কিন্তু পরিত্যক্ত অযোধ্যাপুরীর বর্ণনায় প্রতিভার চরম বিকাশ কি হয়নি।

কালিদাস ॥ অবশ্য হ'য়েছে। কিন্তু ও যে আমার চোখে-দেখা! পরিত্যক্ত অযোধ্যা যে হৃতগৌরব উজ্জয়িনী।

রবীন্দ্রনাথ ॥ তা বটে।

কালিদাস ॥ কিন্তু গোড়াকার প্রসঙ্গের বিশদ উত্তর এখনো পাইনি। ভারতবর্ষবোধে আমার কাব্য তোমাকে কিভাবে সাহায্য করেছে বুঝিয়ে বলো।

রবীন্দ্রনাথ ॥ আমাদের দেশে সমাজের যে গুরুত্ব এমন অন্য দেশে নয়। অন্য দেশে সে গুরুত্ব রাষ্ট্রের, তাই সেখানে স্বভাবতই রাজার স্থান

সকলের উপরে। এ দেশ সমাজকেন্দ্রিক, এখানে সেই প্রাধান্য নারীর। তোমার অঙ্কিত ঔশীনরী, ধারিণী, উমা, শকুন্তলা, সীতার কাছে রাজন্যগণ নিতান্ত ম্লান।

কালিদাস ॥ এ বিচার ভুল নয়।

রবীন্দ্রনাথ ॥ কিন্তু আরো আছে। আমাদের দেশ যেমন সমাজকেন্দ্রিক, আমাদের সমাজ তেমনি নারীকেন্দ্রিক। এখন সে নারীকে তো বিলাসিনী হ'লে চলে না, প্রণয়িনী হ'লে চলে না, এমন কি গৃহিণীমাত্র হ'লেও চলে না—তার পক্ষে অত্যাবশ্যক জননীপদ। এই জন্যেই তোমার কাব্যে শিশুর আবির্ভাব অপরিহার্য হ'য়ে উঠেছে। এই জন্যেই তোমার সমস্ত কাব্য নামত না হ'লেও বস্তুত কুমারসম্ভব।

কালিদাস ॥ চমৎকার! ভারতবর্ষের এই সত্যটিকে তোমার মতো কবি ব্যতীত ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে পারতো আর কে?

রবীন্দ্রনাথ ॥ আর ভারতবর্ষের এই মর্মটিকে তোমার মতো মহাকবি ব্যতীত উদ্‌ঘাটিত করতে পারতো কে?

কালিদাস ॥ এই উদ্‌ঘাটনের গুরুত্ব স্বীকৃত হওয়ার জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতে হ'য়েছে দেড় হাজার বছর। আমি স্রষ্টা তুমি আবিষ্কর্তা। সময় বিশেষে সৃষ্টির চেয়ে আবিষ্কারের মূল্য অধিক।

রবীন্দ্রনাথ ॥ তোমার এই প্রশংসা অগ্রজ কবির আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করলাম।

কালিদাস ॥ কবিস্বর্গে অগ্রজ অনুজ নেই, সকলেই এখানে সমজ—সকলেরই এখানে সমান আসন, সমান আদর, সমান স্থান এবং সমান বয়স।